:: সূচীপত্র ::

ঃঃ ভূমিকা ঃঃ

বহুদিন যাবৎ সংস্কৃত ভাষার প্রতি আমার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ার সময় সংস্কৃত শ্রব্য এবং দৃশ্যকাব্যের প্রতি আমার এক অদম্য আকর্ষণ জন্মায়। বিশেষতঃ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য পড়ার সময় আমি বিমুগ্ধ হ'য়েছিলাম সংস্কৃত নাট্যজগতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য দেখে। তখন থেকেই আমার মনে সংস্কৃত নাটকের গঠনরীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানার এক গভীর কৌতূহল সৃষ্টি হয়। ছাত্রাবস্থার সেই সময়েই আমার মনের গহন কক্ষে যে স্বপ্ন-বিহঙ্গটি বাসা বেঁধেছিল সেটি হ'ল — যদি কোনদিন গবেষণা করার সুযোগ পাই তাহলে আমি এই বিষয়টি নিয়েই পড়াশুনা করব। দীর্ঘকাল পরে আমার গবেষণা করার সুযোগ আসায় আমি এই বিষয়টিকেই গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন ক'রেছি এবং বহু গ্রন্থ্ পাঠ ক'রে ও বহু অধ্যাপক-অধ্যাপিকার সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে বিষয়টিকে জানবার ও গবেষণাপত্রে লিপিবদ্ধ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছি।

নাটক হ'ল মানুষের জীবনের এক প্রতিচ্ছবি। সমাজরূপ আধারে বর্তমান মানুষের জীবন-যাপন প্রণালীকে নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেন এবং সেই নাটক দর্শন ক'রে লৌকিক দর্শকও এমনভাবে আনন্দে মুখরিত হন যে নাটক দর্শন করতে করতে তাঁরা যেন নিজেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবকিছুই অনুভব করতে পারেন। তাই নাটক যে যুগেই লেখা হোক না কেন তা সবসময়ই দর্শকদের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই নাটকের মধ্যে তৎকালীন সমাজের প্রাসঙ্গিকতা পরিলক্ষিত হয়।

"ত্রিবর্গসাধনং নাট্যম্" অর্থাৎ নাটক থেকেই ধর্ম, অর্থ ও কাম – এই ত্রিবর্গ লাভ করা যায়। একমাত্র নাটকই বিভিন্ন রুচির মানুষের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটিতে সংস্কৃত নাটকের গঠনরীতি, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনা করাই বিশেষ লক্ষ্য।

গবেষণামূলক রচনাটিকে সুষ্ঠুভাবে আলোচনার স্বার্থে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। উপযুক্ত ভূমিকা ও উপসংহারের দ্বারা বেষ্টিত এই গবেষণা নিবন্ধের অধ্যায়গুলি হল নিম্নরূপ —

প্রথম অধ্যায় — সংস্কৃত নাটকের সূচনা ও বৈশিষ্ট্য —

এই অধ্যায়ে আলোচিত হ'য়েছে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মত, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে

উল্লিখিত কাহিনীর প্রসংগ এবং রূপকের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পূর্বরঙ্গের ভূমিকা ও প্রয়োগ।

দ্বিতীয় অধ্যায় — সংস্কৃত নাটকের ঘটনাবিন্যাস পদ্ধতি —
এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তুর (plot) শ্রেণীবিভাজন, পতাকাস্থান, অর্থোপক্ষেপক, অর্থপ্রকৃতি, কার্যাবস্থা ও সন্ধি সম্পর্কিত আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায় — সংস্কৃত নাটকে নায়ক, নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রচিত্রণ —
আলোচ্য অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হ'য়েছে নায়কের প্রকারভেদ, প্রতিনায়ক ও অন্যান্য সহ অভিনেতা, নায়িকার শ্রেণীবিভাগ, নায়িকার সহকারিবৃন্দের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায় — সংস্কৃত নাটকের গঠনরীতি, নাম, সম্বোধন ও ভাষার ব্যবহার —
এই অধ্যায়ে কথিত হ'য়েছে রূপকের বিভিন্ন বিভাগ ও নাট্যচরিত্রের নামকরণ, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র কর্তৃক তাদের সম্বোধন, নট-নটী কর্তৃক প্রযুক্ত ভাষার ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনা।

পঞ্চম অধ্যায় — সংস্কৃত নাটকে রসচিত্রণ —
আলোচ্য অধ্যায়ে উক্ত হ'য়েছে নাটকের রসপুষ্টিতে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের ভূমিকা, বিভাবাদির শ্রেণীবিন্যাস, রসপুষ্টিতে সাত্ত্বিক ভাব ও স্থায়িভাবের ভূমিকা, স্থায়িভাবের ভেদ ও রসের শ্রেণীবিভাজন, শান্তরসের প্রসংগ ও রসনিষ্পত্তি নিয়ে চারটি মতবাদের কথা।

উপসংহারে আমরা বলতে চেয়েছি যে সাহিত্যের ধারা সবযুগে একই গতিতে প্রবাহিত হয় না। চিন্তাধারা, ভাষা, গঠনবিন্যাস — সবকিছুই যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ সংস্কৃত নাট্যকারের চিন্তাধারা অনেকাংশেই একপ্রকার। তথাপি ভাষা ও রীতি সকলের এক নয়। আবার অবক্ষয়িত যুগে অর্থাৎ ভট্টনারায়ণের যুগ বা শূদ্রকের যুগে সংস্কৃত রচনার ধারা এবং বিষয়বস্তুর ধারা অনেকাংশেই পরিবর্তিত হ'য়েছে। মুরারী, রাজশেখর, কৃষ্ণমিশ্র প্রভৃতি কালিদাসের উত্তরসুরিগণের নাট্যরচনার ধারাতেও বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আরও বলা যায় যে রূপক রচনায় মোটামুটি বিধিনিষেধের একটি বহিরঙ্গ নির্ধারিত হ'লেও ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে রসানুসারে প্রয়োগ বা রূপায়ণেরই বিধান বলবৎ। আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে যে বিধান দিয়েছিলেন — "ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে" — সেই কথারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পেলাম চতুর্দশ

শতাব্দীর আলংকারিক বিশ্বনাথের মুখে। ভিন্নযুগের ভিন্নধর্মী নাটক-নাটিকার উত্থান-পতন পর্যালোচনা ক'রে তিনি উদার বিধান দিলেন — "রসস্যৈব হি মুখ্যতা"। রসানুকূল্যে প্রয়োজন হ'লে রসপুষ্টির সহায়তায় দেশ-কাল ও পাত্রানুসারে নব-নব বিধি-নিষেধ রচনার অধিকার ও স্বাধীনতা দিতেও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রকারগণ দ্বিধাবোধ করেননি।

আমার এই কঠিন ও দুরূহ ভাবনাকে যে কোনদিন কাজে পরিণত করতে পারব তা ভাবিনি। ভগবানের কৃপা ও বাবা-মায়ের আশীর্বাদই আমাকে একাজে প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছে। তাছাড়া অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা দিক দিয়ে আমাকে কাজটি করতে সাহায্য করেছে। প্রথমেই আমি যাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ও চিরঋণী তিনি হ'লেন আমার পরম পূজনীয় আচার্য ডঃ অনন্তলাল গঙ্গোপাধ্যায়, আমার মহাবিদ্যালয়-জীবনের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। এযুগে এমন নিঃস্বার্থ ছাত্রবৎসল শিক্ষক বড়ই বিরল। এই মহান শিক্ষাদরদী মানুষটি যদি আমাকে সাহস ও উৎসাহ না দিতেন তাহলে আমি কখনই একাজে ব্রতী হ'তে পারতাম না। এরপর আমি যাঁর কাছে অসীম ঋণজালে ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ তিনি আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক পরমপূজ্য ডঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিরলস সহযোগিতা ও সুমধুর ব্যবহার আমাকে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে কূলের দিশা দেখিয়েছে। বিভিন্ন পাঠাগারের দ্বারাও আমি ভীষণভাবে উপকৃত হ'য়েছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি ও সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদ। ব্যক্তিগতভাবে একাজে আমাকে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ গোপাল মিশ্র এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পার্থপ্রতিম দাস মহোদয়বৃন্দ। মানসিকভাবে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা দিয়ে যারা আমাকে সাহস যুগিয়েছে তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য আমার সহধর্মিনী সুজাতা ঘোষ, পুত্র অরিজিৎ ঘোষ, সহকর্মী বন্ধু রামচন্দ্র রায়, জনাব মনিরুল আলম ও পাণ্ডুয়া শশিভূষণ সাহা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও আমার শ্বশুরমহাশয় শ্রী হারাধন ঘোষ। এছাড়াও মুদ্রণের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছে শ্রীমান কৌশিক কুণ্ডু। সকলের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

অশোককুমার ঘোষ
গবেষক ২৯-০৭-২০০৭

ঃঃ প্রথম অধ্যায় ঃঃ

সংস্কৃত নাটকের সূচনা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টিতে বিচার ক'রে কাব্যকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। যথা - ১) দৃশ্যকাব্য এবং ২) শ্রব্যকাব্য।[১] যে কাব্যের রসাস্বাদন করতে গেলে চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য থাকে এবং অন্য ইন্দ্রিয়গুলি তার সহকারী হিসাবে কাজ করে তাকে বলে দৃশ্যকাব্য। আর যে কাব্যগুলির রসাস্বাদন শ্রবণ বা কর্ণগ্রাহ্য সেগুলি হ'ল শ্রব্যকাব্য। আচার্য বিশ্বনাথ বলেন — যে কাব্য অভিনয়যোগ্য তারই নাম দৃশ্যকাব্য।[২]

দৃশ্যকাব্যের আর এক নাম রূপক। কারণ এখানে নটের উপর রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ইত্যাদির রূপ একত্রে আরোপ করা হয়। নট রামচন্দ্র বা লক্ষ্মণ নয়, নটীও সীতা নয়। কিন্তু তাঁরা দর্শকের কাছে রাম বা সীতারূপে উপস্থিত হন। দর্শকও তখন ঐ অজ্ঞাতপরিচয় নট-নটীকেই রাম বা সীতা ব'লে ভাবতে থাকে। সেজন্য আচার্য বিশ্বনাথ মন্তব্য করলেন – রূপের আরোপ করা হয় ব'লে তাকে বলে রূপক।[৩] দশরূপকেও বলা হ'ল – নাট্য হ'ল অবস্থার অনুকৃতি। দৃশ্যময়তার জন্য একে রূপক নামে অভিহিত করা হয়। রূপ আরোপিত হয় ব'লে তার (নাট্যের) নাম রূপক।[৪]

নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত — এই শব্দ তিনটি মূলতঃ সমার্থক। 'নট্' ধাতু থেকে 'নাট্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হ'য়েছে। আর 'নৃৎ' ধাতু থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে 'নৃত্য ও 'নৃত্ত' শব্দ দুটি। নট্ এবং নৃৎ – এই উভয় ধাতুর অর্থই গাত্রবিক্ষেপ। অঙ্গবিক্ষেপের প্রাধান্য আছে ব'লেই অভিনেতাকে বলা হয় নট, আর নৃত্য ও নৃত্তবিদ্‌কে বলা হয় নর্তক। কিন্তু উক্ত তিনটি শব্দের তাৎপর্য পৃথক্। 'নৃত্ত' শব্দে নাচ (dance) কে বোঝায়। এটি তাল ও লয়নির্ভর।[৫] অপরপক্ষে 'নৃত্য' বলতে বোঝায় অনুকরণাত্মক অঙ্গভঙ্গী (mime)। অর্থাৎ নৃত্য ভাবাশ্রিত।[৬] কিন্তু গীত ও সংলাপের সঙ্গে নৃত্ত ও নৃত্য যুক্ত হ'য়ে নাট্যের সৃষ্টি করে। তাই নাট্য হ'ল রসাশ্রিত। দশরূপককারের মতে নাট্য হল অবস্থার অনুকরণ।[৭] তাই নাট্যে অভিনয়েরই প্রাধান্য। নৃত্ত ও নৃত্যে বাচিক অভিনয় থাকে না; এখানে অঙ্গবিক্ষেপই মুখ্য। কিন্তু নাট্য হ'ল রসনির্ভর। রসই এখানে প্রধান। নাট্যে সংলাপের মাধ্যমে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক — এই চারপ্রকার অভিনয়ের দ্বারা রসের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। সংক্ষেপে বিষয়টিকে নিম্নরূপভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

নৃত্ত = নাচ (dance) – তাললয়াশ্রিত

নৃত্য = অনুকরণাত্মক অঙ্গভঙ্গী (mime) – ভাবাশ্রিত

নাট্য = নৃত্ত + নৃত্য + গীত ও সংলাপ – রসাশ্রিত।

সংস্কৃত নাটকের উৎস —

জীবন ও জগতের প্রতি মানুষের একটি প্রগাঢ় আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণ সহজ ও স্বাভাবিক। তাই জীবন ও জগতের কাহিনী শোনবার ও সে কাহিনী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার জন্য মানুষের কৌতূহল অসীম ও অদম্য। এই কাহিনী দেখে ও শুনে সে অত্যন্ত প্রীত ও প্রভাবিত হয়। নাটকের মধ্যে থাকে মানবমনের আনন্দলাভের এক চাবিকাঠি। এখানে সত্যের সঙ্গে সুন্দরের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জীবন-চর্চাই হল নাট্যচর্চা। তাই নাটক শুধু জীবনের কাহিনী নয়; জীবন্ত কাহিনী। সংসারে যারা শোক-দুঃখাভিহত, অতিশ্রমকাতর, শোকার্ত এবং তপস্বী তাদের কাছে নাটক হবে বিশ্রামজনক এবং এই নাট্য ধর্মসম্মত, যশপ্রাপক, আয়ুবর্ধক, শুভবুদ্ধিবর্ধক এবং লোকের উপদেশজনক হবে।[৮]

কিন্তু প্রশ্ন জাগে নাটকের উদ্ভব কবে, কিভাবে হ'য়েছিল? প্রথম নাটক কে লিখেছিলেন? কারাই বা তাতে অভিনয় ক'রেছিলেন ইত্যাদি? প্রথম প্রশ্নের উত্তর নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। তাই উক্ত প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নাটকের উৎসের সন্ধান করেছেন।

অনেকে মনে করেন যে ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তগুলির মধ্যে নাট্যসাহিত্যের উৎস নিহিত আছে।এই সূক্তগুলি কথোপকথনের আকারে রচিত এবং এগুলিকে সংস্কৃত নাটকের পথিকৃৎ বলা যায়। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার সাহেব এবং ফরাসী পণ্ডিত সিল্ভ্যাঁ লেভি মনে করেন যে ঋগ্বেদের এই সংবাদসূক্তগুলির মধ্যে নাটকের লক্ষণ রয়েছে। পুরূরবা উর্বশী সংবাদ (ঋগ্বেদ ১০, ৯৫) যম-যমীর কথোপকথন (১০,১০) বরুণ-ইন্দ্রের কথোপকথন (৪,৪২) প্রভৃতি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে পণি ও সরমার কথায় (১০-১০৮ সূক্ত) নাটকের আভাস পাওয়া যায়। অধ্যাপক ভিন্তারনিৎস ঋগ্বেদের এই জাতীয় রচনাগুলিকে মহাকাব্য ও নাটক রচনার উৎস বলে মনে করেন।[৯]

বৈদিকযুগে নৃত্য, গীত, অঙ্গভঙ্গী, কথোপকথন — এগুলি দেখতে পাওয়া যায়। তাই বলা যায় যে এগুলি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হ'য়ে নাটকাভিনয়ে পরিণত হ'য়েছে। আর নাচ গান যখন অভিনয়ের একটা অঙ্গ তখন এরূপ মনে করা যেতেই পারে যে বৈদিক যুগেই নাটকের উপাদানের সূত্র ছিল।

ডঃ পিশেল (PISCHEL) পুতুল নাচের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের উৎস খুঁজে পান। তিনি মনে করেন যে সংস্কৃত নাটকের 'সূত্রধার' (Stage manager) এবং 'স্থাপক' শব্দ দুটি সম্ভবতঃ পুতুল নাচের' থেকেই এসেছে। কারণ পুতুলনাচ ভারতবর্ষের এক প্রাচীন প্রথা। মহাভারতেও এই প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ডঃ পিশেল (PISCHEL) বলেন যে যিনি সূত্রের সাহায্যে পুতুলকে নাচান তিনি সূত্রধার; আর যিনি পুতুলকে যথাস্থানে স্থাপন করেন তিনিই স্থাপক। সূত্রধার সূত্রের সাহায্যেই অভিনয়কার্য্য সম্পন্ন করতেন। পরবর্তীকালে জীবন্ত মানুষের দ্বারাই অভিনয়ের কাজ সম্পন্ন হতে লাগল। তাই আমরা বলতে পারি যে নাটকীয় অভিনয়ের উৎপত্তি পুতুলনাচ থেকে না হ'লেও পুতুলনাচের রীতি নাটকের উৎপত্তিতে কিছুটা সহায়তা ক'রেছে।

তবে পিশেল সাহেবের এই মতকে আমরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে করি না। কারণ সংকৃত নাটকের সূত্রধারের কাজ হ'ল নাটকের কথাবস্তু, নায়ক, রস প্রভৃতির সূত্র দর্শক সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা।[১০] তাই পুতুলনাচ থেকে রস ও ভাবসমৃদ্ধ নাটকের উৎপত্তি হ'য়েছে একথা আমরা মানতে পারি না।

স্টেন কনো এবং অধ্যাপক লুডার্স ছায়া রূপকের মধ্যে নাটকের উৎসের সন্ধান পান। এঁদের মত হ'ল যে, রঙ্গমঞ্চের পর্দার পিছনে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যে অভিনয় করেন সেই ঘটনার ছায়ারূপ দর্শকেরা প্রত্যক্ষ করেন। পর্দার উপর এই ছায়াদৃশ্য প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতে এরূপ কিছু ছায়ানাটক আছে যার মধ্যে সুভট্ট রচিত "দূতাঙ্গদ" বিশেষ প্রসিদ্ধ। তবে ছায়ারূপক থেকে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব হ'য়েছে এ যুক্তি মানা কষ্টকর। কারণ ছায়ারূপকের প্রাচীনতার কোনো প্রমাণ নেই।[১১]

বৈদিক যুগের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেও নাটকীয় আচরণ দেখা যায় ব'লে অনেকে মনে করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেউ কেউ এগুলিকে ritual drama ব'লে অভিহিত করেন। সোমযাগে সোমবিক্রয়কারীর কাছ থেকে সোম ক্রয় ক'রে তাকে মূল্য না দিয়ে ক্রেতা চ'লে আসতেন এবং সোমবিক্রেতাকে প্রহার করতেন। সোমযাগে এরকম আচরণ করার কথা বলা হ'য়েছে। কিন্তু এরূপ আচরণ করার জন্য সোম ক্রেতা ও সোমবিক্রেতা উভয়কেই অনুরূপ অভিনয় করতে হ'ত। তাই বলা যায় যে বৈদিকযুগের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সংস্কৃত নাটকের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত ক'রেছিল এবং এই প্রভাব মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

কৃষ্ণ অবতারে কৃষ্ণ এবং ইন্দ্রের মধ্যে যে শত্রুতা গ'ড়ে উঠেছিল তাতে দেখা যায় যে ইন্দ্রধ্বজের পূজা করা হ'চ্ছে। এই ঘটনার মধ্যেও সংস্কৃত নাটকের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।

ওয়েবার সর্বপ্রথম ভারতের নাট্যসাহিত্যে গ্রীক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। সংস্কৃত নাটকে 'যবনী' ও 'যবনিকা' — এই দুটি শব্দের ব্যবহারকেই তিনি গ্রীক প্রভাবের প্রধান প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। এছাড়া সংস্কৃত নাটকে অভিজ্ঞান বা স্মারক চিহ্নের যে ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তাকেও তিনি গ্রীকের কাছ থেকে ভারতের ঋণ ব'লে মনে করেন। ভিণ্ডিশ ওয়েবারের মতকে সমর্থন করেছেন। অভিনয়মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে, প্রসাধন কক্ষ ও মঞ্চের মধ্যস্থলে প্রলম্বিত পর্দাই 'যবনিকা'। কিন্তু কীথ মনে করেন যে 'যবনিকা' শব্দ যে গ্রীক-সম্বন্ধীয় কোন বস্তুকেই বুঝিয়েছে এরূপ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ইজিপ্ট, সিরিয়া, ব্যাকট্রিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন দ্রব্যকেই তা বোঝাতে পারে।[১২] তাছাড়া গ্রীক নাটকের অভিনয়ে মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে এরূপ কোন পর্দা ব্যবহার করার রীতি ছিল ব'লেও জানা যায় না।

সংস্কৃত নাটকে যেসব জায়গায় রাজাকে যবনী পরিবৃত অবস্থায় চিত্রিত করা হ'য়েছে তা থেকে অনেকে মনে করেন যে এটাও গ্রীক প্রভাবেরই স্মারক এবং 'যবনী' শব্দ গ্রীক রমণীদেরকেই বুঝিয়েছে। গ্রীক নাটকে কিন্তু কোন রাজাকে যুবতীজনপরিবেষ্টিত করা হয়নি। কীথ এর মতে সংস্কৃত নাটকের এরূপ ব্যবহার থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে ভারতের রাজন্যবর্গ গ্রীক সুন্দরীদের পক্ষপাতী ছিলেন এবং গ্রীক বণিকরাও উচ্চ লাভের আশায় বাণিজ্যের অন্যতম পণ্য হিসাবে অনেক গ্রীক যুবতীকে ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছে উপঢৌকন দিতেও প্রস্তুত থাকতেন।

কতিপয় গ্রীক নাটক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে মঞ্চস্থ হ'য়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে সংস্কৃত নাটকগুলি গ্রীক নাটকের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। মূলগতভাবে সংস্কৃত নাটক পাশ্চাত্য নাটক থেকে পৃথক্। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রীক নাটকগুলি থেকেও এর পৃথকত্ব আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত হয়। সংস্কৃত নাটকের মূল লক্ষ্য হ'ল প্রত্যক্ষভাবে চরিত্রচিত্রণ। চরিত্রচিত্রণের মধ্যে দিয়ে নাট্যকারগণ নাটকের একঘেয়েমি নিরসনের জন্য বিভিন্ন কর্মের সন্নিবেশ ঘটাতেন। এছাড়া গ্রীক নাটকের chorus সংস্কৃত নাটকে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তাছাড়া সংস্কৃত নাটক প্রকৃতিগতভাবে romantic, অপরপক্ষে গ্রীক নাটক ধ্রুপদী (classical)। তাই বলা যায় যে সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে গ্রীক নাটকের নয়, তুলনায় Elezabethan নাটকের কিছু সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে বহু আগে থেকেই সংস্কৃত নাটকের ধারা প্রচলিত ছিল। কুশীলব, শৈলূষ, নট প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার, নটসূত্র এবং বলিবন্ধাদি নাটকের উল্লেখ তারই প্রমাণ দেয়। সুতরাং বলা যায় যে ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তে সংস্কৃত নাটকের যে বীজ অঙ্কুরিত হ'য়েছিল তা পরবর্তীকালে বহু নাট্যকারের প্রতিভাবারিসিঞ্চনে ভারতবর্ষের অনুকূল পরিবেশে কালক্রমে পল্লবিত হ'য়ে বিশাল মহীরূহে পরিণত হ'য়েছে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কাহিনীর উল্লেখ করা হ'য়েছে। প্রথমে কাহিনীর পটভূমি এবং পরে কাহিনীর উপর আলোকপাত করা যাক্।

একদা জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ এর অন্তর্গত) নানা কারণে কলুষিত হ'য়ে পড়েছিল। জম্বুদ্বীপের মানুষ যখন নষ্ট ও ভ্রষ্ট তখনই মহেন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ পিতামহ ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হ'লেন। তাঁরা পিতামহকে নিবেদন করলেন যে তাঁরা এমন একটি আনন্দদায়ক বস্তু চান যা যুগপৎ শ্রব্য এবং দৃশ্য।

এছাড়াও তদানীন্তনকালে শূদ্রদের বেদপাঠে কোনো অধিকার ছিল না। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই বেদের উপর অধিকার ও আধিপত্য ছিল। ব্রাহ্মণবিদ্বেষীগণ এটা সহ্য করতে পারল না। ফলে বেদ ও ব্রাহ্মণ এই উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্বেষ ও বিরোধ বাড়তে লাগল। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তা উপলব্ধি ক'রে চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়লেন।

সকলেই বেদ জানতে চায়, বেদ বুঝতে চায়। অথচ ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণকে বেদের অধিকার দিতে চায় না। এরকমই একটা অসহায় পরিস্থিতিতে ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত হ'ল একটি পঞ্চম বেদ। এক একটি বেদ থেকে এক একটি বস্তু নিয়ে সৃষ্টি হ'ল এই পঞ্চম বেদ। ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া হ'ল পাঠ, সামবেদ থেকে নেওয়া হ'ল গান, যজুর্বেদ থেকে গৃহীত হ'ল অভিনয়; আর অথর্ববেদ থেকে নেওয়া হ'ল রস।[১৩]

এই পঞ্চমবেদই হ'ল নাটক। এই পঞ্চম বেদ বা নাটককে বলা হ'ল দেবলোক কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং অপৌরুষেয়। নাটক তো রচিত হ'ল। কিন্তু অভিনয় করবে কারা? কিভাবেই বা হবে সেই অভিনয়? ব্রহ্মা দেবতাদের ডাকলেন। কিন্তু দেবতারা অভিনয় করতে সম্মত হ'লেন না। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন যে দেবতারা নাট্যকর্মে অযোগ্য। বেদজ্ঞ মুনিরাই নাট্যপ্রয়োগে সক্ষম। তাই অভিনয়ের জন্য ডাক পড়ল মুনি ভরতের এবং তাঁর শতপুত্রের। এখানে উল্লেখ্য যে 'পুত্র' শব্দটি নিশ্চয়ই শিষ্য অর্থে প্রযোজ্য। নতুবা অতি

সসীম আয়ুষ্কালের মধ্যে মানুষ কিরূপে শতপুত্রের জনক হ'তে পারে? মুনিশ্রেষ্ঠ ভরত অভিনয়ের ভার গ্রহণ করলেন।

ব্রহ্মা রচনা করলেন প্রথম নাটক "দেবাসুরসংগ্রাম"। ভরত সম্প্রদায়ের দ্বারা এই নাটক মঞ্চস্থ হ'ল। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে দেবতাদের শৌর্য্য-মহিমা এবং অসুরদের পরাজয় প্রচারিত হ'ল। অসুরগণ এটা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা অভিনয়ে বাধা সৃষ্টি করলেন। বাধকদলের মধ্যে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর নাম বিরূপাক্ষ। অসুরগণ বললেন যে তাঁরা এধরণের নাটক দেখতে ইচ্ছা করেন না। তাই তাঁরা চ'লে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা শুধুমাত্র স্থানত্যাগ ক'রেই ক্ষান্ত হ'লেন না; তাঁরা আক্রমণ করলেন রঙ্গমঞ্চ। অভিনয় থেমে গেল।

এই ঘটনা দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'লেন। তিনি সর্বরত্নোজ্জ্বল ধ্বজদণ্ড গ্রহণ ক'রে তা দিয়ে অসুরদের প্রহার করতে শুরু করলেন। ফলে অসুরগণ জর্জরিত হ'লেন। সেই দিন থেকেই বিঘ্ননাশক এই ধ্বজদণ্ডের নাম হ'ল 'জর্জর'। তারপর থেকে বহুকাল অবধি বিঘ্ননাশের জন্য রঙ্গমঞ্চে 'জর্জরপূজা' প্রচলিত ছিল।

সুতরাং পঞ্চমবেদের প্রথম প্রয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। মহামুনি ভরত শুনলেন যে অসুরগণ তাঁর উপর এতটাই ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন যে অসুরেরা তাঁকে বধ করতে চাইছেন। তখন ভরত মনে মনে ভাবলেন যে নির্বিঘ্নে অভিনয় করতে গেলে একটি সুরক্ষিত নাট্যমঞ্চের প্রয়োজন। তাই তিনি ব্রহ্মার কাছে একটি নাট্যগৃহ নির্মাণের জন্য প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা (দেব-ইঞ্জিনীয়ার) একটি রঙ্গালয় নির্মাণ করলেন। দেবতারা এই নাট্যগৃহ রক্ষার কাজে নিযুক্ত রইলেন। রঙ্গপীঠের মধ্যে 'ব্রহ্মা', পাশে 'মহেন্দ্র', দেহলীতে 'যমদণ্ড', উপরে 'শূল', দ্বারে 'নিয়তি' ও 'মৃত্যু' এবং দরজার দুই পাশে 'নাগরাজ'কে স্থাপন করা হ'ল। চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, বরুণ, যম, অগ্নি প্রভৃতি সকলেই এই গৃহের কোনো না কোনো স্থান রক্ষা করতে লাগলেন।

এইভাবে সুরক্ষিত রঙ্গালয়ে অভিনয়ের সব ব্যবস্থাই যখন সম্পূর্ণ, তখন দেবতারা ব্রহ্মাকে বললেন — "নাট্যাভিনয়ের সব বিঘ্ন আপনার সামবচনে দূরীভূত হোক্।"[১৪] কারণ দেবতারা ভেবেছিলেন যে শুধু দণ্ডনীতিতে অসুরগণকে বিপর্যস্ত করা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা ব্রহ্মার সামনীতি প্রার্থনা করলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা দৈত্যগণকে ডাকলেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন – হে নিষ্পাপ দৈত্যগণ, আপনারা

রাগ করবেন না। বিষাদ ত্যাগ করুন। আপনাদের এবং দেবতাদের শুভাশুভযুক্ত কর্ম; ভাব ও বংশপরিচয় প্রকাশের জন্য আমি নাট্যবেদ রচনা ক'রেছি। এতে শুধু আপনাদের বা দেবগণের রূপারোপ নেই। ত্রিভুবনের ভাবানুকীর্তনই নাট্যসাহিত্যের লক্ষ্য। এতে কখনও (অভিনেয়) ধর্ম, কখনও খেলাধূলা, কখনও অর্থ, কখনও শান্তি কখনও হাসি, কখনও যুদ্ধ, কখনও কাম এবং কখনও হত্যা। অর্থাৎ জীবনে যা কিছু ঘটে, সংসারে যা কিছু শ্রব্য এবং দৃশ্য তাই নাট্যসাহিত্যের বিষয়। এটি দেবতা, অসুর, রাজা, গৃহস্থ প্রভৃতি সকলেরই দোষ, গুণ, সুখ ও দুঃখের অনুকৃতি এবং এটি নাট্য নামে অভিহিত।[১৫]

এভাবেই প্রজাপতি ব্রহ্মার সামবাক্যে দৈত্যগণের উত্তেজনা প্রশমিত হ'ল। পিতামহ ব্রহ্মা নাটকের সূচনা লগ্নে রঙ্গপূজার আদেশ দিলেন। তখন থেকে বিনা রঙ্গপূজায় নাট্যপ্রয়োগ নিষিদ্ধ হ'ল।[১৬]

এরপর নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নূতন আঙ্গিকে সমুদ্রমন্থনের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা হ'ল দ্বিতীয় রূপক – যার নাম "অমৃতমন্থন"। এই রূপকের মধ্যে দেবতা ও দানবের শৌর্য ও বীর্য্যের কথা ব্যক্ত হ'ল। দেবতা ও দানবের কর্ম ও মর্ম গ্রথিত হ'ল একই সূত্রে। তাই এই রূপকের অভিনয় দেখে দেবতা ও দৈত্য উভয়েই ভীষণ আনন্দ পেলেন। স্বর্গলোকে অভিনয় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ল।

এবার ব্রহ্মা স্থির করলেন যে শিবের সমক্ষে হিমালয় কন্দরে অভিনয় করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করলেন তৃতীয় রূপক "ত্রিপুরদাহ"। রচনার বিষয়বস্তু হ'ল মহাদেব কর্তৃক দৈত্যপুরীবিনাশ। দৈত্যদেবতা শিব নিজে উৎপীড়ক দৈত্যগণকে নিধন করলেন। রূপকের বিষয়বস্তু দৈত্যদলন হ'লেও তাই অভিনয়কে কেন্দ্র ক'রে দৈত্যদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ জন্মাল না। ফলে মহাদেব হৃষ্ট হ'লেন এবং তাঁর অনুচরগণও সন্তুষ্ট হ'ল।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে দেবলোক থেকে মর্তলোকে এই দৃশ্যকাব্যের আগমন ঘটল কিভাবে? এ প্রসঙ্গেও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে একটি উপাখ্যান আছে। উপাখ্যানটি এরকম — যে পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে একদা নাটকের উদ্ভব হ'য়েছিল তা ক্রমশঃ নট-নটী ও নাট্যকারদের ব্যবহারদোষে দুষ্ট হ'ল। ভরত সম্প্রদায় যত্রতত্র বিদ্রুপাত্মক অভিনয় শুরু করলেন। তা দেখে জ্ঞানী-গুণী-মুনি-ঋষিদের মধ্যে ঘোরতর অসন্তোষ জন্মাল। অসংযত অভিনয়দোষে তাঁরা সকলের অপ্রিয় হ'লেন। ফলস্বরূপ সমগ্র মুনিসমাজ অতীব রুষ্ট হ'য়ে ভরতপুত্রদের অভিশাপ দিলেন। অভিশাপে বলা হ'ল যে ভরতের পুত্রগণ ব্রাহ্মণত্ব বিস্মৃত হ'য়ে সপরিবারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হবে এবং অভিনয় হবে তাদের বংশবৃত্তি।

এই দুঃসংবাদ পেয়ে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ নাট্যবেদের পরিণতি চিন্তা ক'রে দুঃখিত হলেন। তাঁরা মুনিগণকে অভিশাপ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হ'ল না।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে দৈত্যরাজ নহুষ স্বর্গরাজ্য অধিকার ক'রে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হ'লেন। তিনি দেবলোকে অভিনয় দেখে মর্তে নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করলেন এবং মহর্ষি ভরতকে অভিনয়ের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলেন।

ইতিমধ্যে দেবী সরস্বতী বিরচিত 'লক্ষ্মী-স্বয়ংবর' নাটক অভিনয়ের আয়োজন হ'ল। লক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লেন ভরতের প্রিয় শিষ্যা এবং স্বর্গের শ্রেষ্ঠ নর্তকী উর্বশী। ঘটনাচক্রে উর্বশী পুরূরবাকে ভালোবেসে ফেলেন। মহারাজ পুরূরবার সঙ্গে মিলনের জন্য তিনি উন্মাদিনী। পুরূরবাই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, কামনা-বাসনা। এমত অবস্থায় অভিনয় করতে গিয়ে উর্বশী 'পুরুষোত্তমে'র পরিবর্তে পুরূরবার নাম উচ্চারণ করলেন। ফলে মহর্ষি ভরত রুষ্ট হ'লেন এবং উর্বশীকে অভিশাপ দিলেন। উর্বশী স্বর্গ থেকে বিদায় নিলেন।

মুনিঋষিগণ কর্তৃক ভরতপুত্রদের উপর অভিশাপ এবং মহর্ষি ভরত কর্তৃক উর্বশীর উপর অভিশাপ পরপর এই দুটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার ফলে দেবলোকে নাট্যাভিনয়ের আলো নির্বাপিত হ'ল।

পরবর্তীকালে নহুষের অনুরোধে মহর্ষি ভরত তাঁর পুত্রদের আহ্বান ক'রে বললেন যে তারা যেন নাট্যাভিনয়ের জন্য পৃথিবীতে যায়। কারণ নাট্যশাস্ত্রের সুষ্ঠু প্রয়োগ হ'লে তাদের শাপাবসান ঘটবে। কিন্তু তারা যেন ব্রাহ্মণ ও নৃপতিদের অপ্রিয় কোনো কিছুর অভিনয় না করে। তারপর কোহল, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ভরতের শিষ্যগণ কিছুকাল মর্তে অবস্থান ক'রে ও মর্তের ধর্ম আয়ত্ত ক'রে মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির উপযোগী ক'রে এই নাট্যশাস্ত্রের প্রবর্তন করলেন। নতুন নট-নটী গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটল এবং মর্তে নব-নাট্যসমাজ প্রবর্তিত হ'ল।

নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত পৌরাণিক উপাখ্যান পর্যালোচনা ক'রে আমরা বলতে পারি যে ভরত বাস্তবিকপক্ষে ছিলেন মর্তের ঋষি। তিনি মর্তেই নাট্য সম্প্রদায় গঠন ক'রেছিলেন। তবে ভরতের নেতৃত্বে ভরতসম্প্রদায় যখন প্রথম অভিনয় শুরু করেন তখন নাট্যরচনার ও নাট্যপ্রয়োগের উন্নত আদর্শ ছিল। সেজন্য একে স্বর্গীয় ব্যাপার ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে। কিন্তু যখন নট-নটীগণের দুর্ব্যবহারে অভিনয়

আদর্শচ্যুত হ'ল তখন অধঃপতিত নাট্যাভিনয়কে উন্নীত করার জন্য আবার নূতন ক'রে আন্দোলন শুরু হয়। তখন ভরতশিষ্য কোহলের উপর নব নাট্যসমাজ রচনার ভার পড়ে। তাই মর্তের আসরে নব নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা ও প্রয়োগকর্তা হ'লেন ভরতের যোগ্য শিষ্য কোহল।

রূপকের শ্রেণীবিভাগ

সংস্কৃতে রূপক শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যকে দশভাগে বিভক্ত করা হয়।[১৭] যথা – নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন। সুতরাং নাটক রূপকশ্রেণীর দৃশ্যকাব্যের দশপ্রকার ভেদের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভেদ।

ঋগ্বেদে সংবাদসূক্তগুলিতে একসময় যে নাট্যবীজ উপ্ত হ'য়েছিল তা নানারূপে অংকুরিত ও প্রকাশিত হ'য়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অবশেষে মহাপাদপে পরিণত হয়। পুষ্পিত ও ফলিত এই পাদপেরই শ্রেষ্ঠ ফল হ'ল নাটক।

রূপকের বিভিন্ন ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে প্রথমে নাটক সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ নাটক-ই আমাদের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

নাটক —

আধুনিক পরিভাষা হিসাবে নাটক শব্দটি যে কোন জাতীয় দৃশ্যকাব্য বোঝালেও প্রাচীনরা নাটক বলতে একটি বিশেষ জাতীয় রূপক বুঝতেন। সম্ভবতঃ রূপক বা উপরূপক আলোচনায় পূর্ণাঙ্গ model হিসাবে নাটককে গণ্য করার অভ্যাস থেকে ক্রমে নাটক শব্দটির অর্থব্যাপ্তি ঘটেছে। মহর্ষি ভরত নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন — 'যাতে রাজগণের সুখ ও দুঃখ থেকে উদ্ভূত কার্যকলাপ নানা রস, ভাব ও ক্রিয়া দ্বারা বহুপ্রকারে বর্ণিত হয় তার নাম নাটক'।[১৮]

নাটকের বিষয়বস্তু হবে 'প্রসিদ্ধ', কবিকল্পিত নয়।[১৯] নাটকের বিষয়বস্তু (plot) ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, পুরাণপ্রসিদ্ধ বা লোকপ্রসিদ্ধ হ'তে পারে।[২০] যা ইতিহাস অথবা পুরাণ থেকে গৃহীত হয় তা যথাক্রমে ইতিহাস ও পুরাণপ্রসিদ্ধ। কিন্তু যা ইতিহাসের ঘটনা বা পুরাণের আখ্যান নয় তা লোকপ্রসিদ্ধ। এই লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা ইতিহাস বা পুরাণ ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ্ থেকে গৃহীত হ'তে পারে অথবা জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী থেকেও এটি গৃহীত হ'তে পারে।

বিশাখদত্তের লেখা ''মুদ্রারাক্ষস'' ইতিহাসের পটভূমিকায় লিখিত নাটকের উদাহরণ। আবার

কালিদাসরচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'', ভাসের লেখা ''বালচরিত'', ভবভূতির লেখা ''উত্তররামচরিত'' পুরাণের পটভূমিকায় রচিত নাটকের উদাহরণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীগুলি পৌরাণিক ব'লে গণ্য হয়। আবার ভাসের লেখা ''স্বপ্নবাসবদত্তা'', কৃষ্ণমিশ্রের লেখা ''প্রবোধচন্দ্রোদয়'' লোকপ্রসিদ্ধ নাটকের উদাহরণ।

নাটকের নায়ক হবেন 'দিব্য' অর্থাৎ দেবতা, 'দিব্যাদিব্য' অর্থাৎ নরাভিমানী নরলীলাকারী দেবতা অথবা 'অদিব্য' অর্থাৎ মানুষ। পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত — ''লক্ষ্মীস্বয়ংবর'' নাটকের নায়ক নারায়ণ এবং রূপগোস্বামীর ''ললিতমাধব'' এর নায়ক কৃষ্ণ দিব্যনায়কের উদাহরণ। কৃষ্ণ নরলীলা করলেও তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ব'লেই মনে করা হয়। ''কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্''।

ভাসের লেখা ''প্রতিমা নাটক'' ও ভবভূতির লেখা ''উত্তররামচরিত'' নাটকের নায়ক রামচন্দ্র দিব্যাদিব্য নায়কের উদাহরণ। রামকে কৃষ্ণের মত ভগবান বলে মনে করা হয় না। তাই অবতার রামচন্দ্র দিব্যাদিব্য নায়ক। আর শকুন্তলা, স্বপ্নবাসবদত্তা, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটকের নায়ক অদিব্য নায়কের উদাহরণ। অদিব্য নায়ক রাজা অথবা রাজর্ষি হবেন।

এখানে রাজা শব্দের দ্বারা নায়ক সর্বদাই যে রাজা হবে এমন কথা বোঝানো হয়নি। এক্ষেত্রে রাজা শব্দের অর্থ রাজপুরুষ না করলে 'মুদ্রারাক্ষস'কে নাটক বলা যাবে না। কারণ –'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের নায়ক চন্দ্রগুপ্ত শূদ্রনরপতি। অবশ্য মতান্তরে চন্দ্রগুপ্ত ইতিহাসে ক্ষত্রিয়পিতৃত্বহেতু ক্ষত্রিয় বলেই প্রসিদ্ধ।

রাজর্ষি শব্দটিকে ব্যাখ্যাকারেরা উপমিত কর্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন বলে মনে করেন। সুতরাং রাজর্ষি শব্দের অর্থ দাঁড়াবে 'রাজা ঋষিরিব'। অর্থাৎ ঋষিদের মধ্যে করুণত্ব, ধৈর্য্যশীলতা, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি গুণের প্রকাশ যেভাবে লক্ষ্য করা যায় রাজাও সেই প্রকার গুণভূষিত হবেন।[২১] রাজার ঐশ্বর্য্য ও ঋষির ঔদার্য্য যেখানে মিলিত, সেখানেই রাজর্ষিত্ব।

এছাড়াও বলা হয় যে নায়ক হবে ধীরোদাত্ত। নাটকে ধীরোদ্ধত, ধীরললিত বা ধীরপ্রশান্ত শ্রেণীর নায়ক হলে চলবে না। ধীরোদাত্ত নায়ক সম্পর্কে বলা হ'য়েছে যে স্থৈর্য্যগুণযুক্ত, তেজস্বী, আত্মগর্বহীন, বিনয়ের দ্বারা গর্বকে যিনি ঢেকে রাখেন এমন ব্যক্তিই হ'লেন ধীরোদাত্ত নায়ক।[২২]

এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকে রাজাকে নায়ক করা হ'য়েছে কেন? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে রাজা না থাকলে রাজ্যের শৃংখলা ও সংযম রক্ষিত হয় না। অরাজক দেশে 'মাৎস্যন্যায়' প্রকাশপায়। এই ন্যায় প্রবল হ'লে গো-ব্রাহ্মণ, সত্য ও শান্তির অবলুপ্তি ঘটে। সেজন্য এগুলিকে রক্ষা করতে গেলে রাজশাসন অবশ্যই কাম্য।[২৩] তাছাড়া তখন ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। সেযুগে প্রধানত রাজার জীবন নিয়েই নাটক লেখা হ'ত। কিন্তু ধীরোদাত্ত এই নায়কচরিত্রই হ'ত আদর্শ রাজর্ষি চরিত্র। এই রাজর্ষি চরিত্রের অভিনয় দেখে কারও কোনো ক্ষোভ বা বিক্ষোভ জাগত না। কারও মনে কখনও অশ্রদ্ধারও অবকাশ থাকত না। জনসেবা ও প্রজাকল্যাণই ছিল রাজশক্তির লক্ষ্য। সেজন্য বহু নাটকের 'ভরতবাক্যে' এই প্রজারঞ্জক রাজধর্মের আদর্শের প্রার্থনা দেখতে পাই। যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের ভরতবাক্যে বলা হ'য়েছে প্রজার কল্যাণে রাজা প্রবৃত্ত হউন।[২৪] অথবা 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে রাজা দেবী ধরণীকে বলছেন – হে দেবি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্নমুখী থাক। তোমার যেন অপ্রসাদ উপস্থিত না হয়, এটাই সর্বদা আমি প্রার্থনা করি। রাজ্যলাভ করা অবধি যতদিন এই অগ্নিমিত্র প্রজাপালক হ'য়েছেন, ততদিন প্রজাপুঞ্জের বাঞ্ছনীয় কাজ যে সম্পাদিত হয়নি, তা নয়।[২৫]

তবে একথা সত্য যে আজ রাজা নেই; রাজার সাম্রাজ্যও নেই। বর্তমানে রাজতন্ত্রের স্থান গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অধিকার করেছে। তাই এই পরিবর্তিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কৃত নাটকের রাজশক্তি ও রাজচরিত্র বেমানান মনে হ'তে পারে; কিন্তু অতীতের মত বর্তমানেও যদি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও প্রচলন থাকত তবে নিশ্চয়ই বাস্তব অনুসারী নাটকের বস্তু ও নায়ক নির্বাচন হ'ত। কারণ নাট্যরচনা ও নাট্যপ্রয়োগ এই উভয় ব্যাপারই লোকানুসারী।

নায়কের সামান্য গুণের দ্বারা নায়িকাও যুক্ত হবেন। অর্থাৎ নায়িকার মধ্যে নায়কের গুণের কিছু কিছু থাকবে।[২৬] সেই গুণ অনুসারে নায়িকাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা স্বীয়া অর্থাৎ নিজের স্ত্রী, অন্যা বা পরস্ত্রী এবং সাধারণী স্ত্রী।[২৭] নাটকের নায়িকা হবে কুলস্ত্রী, কুলটা নয়। ললিতমাধব, প্রতিমানাটক, উত্তররামচরিত, শকুন্তলা, স্বপ্নবাসবদত্তা – প্রভৃতি সব নাটকের নায়িকাই কুলীনা কুলললনা।

নাটকে প্রধান রস একটি হ'লেও অন্যান্য রস অবশ্যই থাকবে।[২৮] কারণ নাটকে শুধু একটি রস থাকলে নাটকের আকর্ষণ থাকে না; নাটকত্বে ভাটা পড়ে। অবশ্য নাটকের প্রধান রস হবে শৃংগার, বীর ও শান্ত। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ মনে করেন যে নাটকের নির্বহণ সন্ধিতে 'অদ্ভুত' রস থাকতেই হবে। অর্থাৎ আকস্মিক কোনো বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে দিয়ে নাটক শেষ হবে। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে

পারি যে শকুন্তলা, স্বপ্নবাসবদত্তা ইত্যাদি শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটক। মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার প্রভৃতি বীররসাত্মক নাটক। প্রবোধচন্দ্রোদয় শান্তরসাত্মক নাটক। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের সপ্তম অংকে দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার নাটকীয়ভাবে সাক্ষাৎকার ও পুনর্মিলনের ঘটনাকে আমরা অদ্ভুতরসের দৃশ্য ব'লে অভিহিত করতে পারি।

নাটকের কয়টি অংক থাকবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো মত নেই। এই রূপকে পাঁচ থেকে দশের মধ্যে যে কোনো অংক থাকতে পারে।[২৯] যেমন কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' পঞ্চাঙ্ক নাটকের উদাহরণ। ষড়ংক ও সপ্তাংকবিশিষ্ট নাটকের উদাহরণ যথাক্রমে ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' ও কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'।

নাটকে সন্ধিসংখ্যা থাকে পাঁচ।[৩০] নাটকের কথাবস্তু বা প্লটের পাঁচটি পর্ব থাকে। এদেরই বলা হয় পঞ্চসন্ধি। অর্থাৎ পাঁচটি স্তর বা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নাটকীয় ঘটনার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে। দৃশ্যকাব্য হীনসন্ধি হ'লে অর্থাৎ পাঁচের কম সন্ধি থাকলে ঘটনার যথাযথ বিন্যাস ও বিকাশ হয় না।

নাটকের বৃত্তি হবে কৈশিকী, সাত্ত্বতী অথবা ভারতী। শৃংগার রসে কৈশিকী, বীররসে সাত্ত্বতী এবং শান্তরসে সাত্ত্বতী ও ভারতীবৃত্তি প্রযুক্ত হয়।[৩১]

মহানাটক —

নাটক যখন সন্ধ্যঙ্গ, লাস্যাঙ্গ প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার লক্ষণযুক্ত, চারপ্রকার পতাকাস্থানযুক্ত এবং দশ অঙ্কযুক্ত হয় তখন সেই নাটককে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন মহানাটক।[৩২] আসলে মহানাটক কোনো বিশিষ্ট রূপক নয়। বৃহত্তম নাটকই হ'ল 'মহানাটক'। এই নামটি ''নাট্যশাস্ত্র'' অথবা দশরূপক কোথাও দেখা যায় না।

রাজশেখর রচিত ''বালরামায়ণ'' মহানাটকের উদাহরণ। সংস্কৃত সাহিত্যে ''মহানাটকম্'' নামে যে রচনাটি প্রচলিত আছে, তাকে কেউই মহানাটকের উদাহরণ হিসাবে মেনে নিতে পারেননি। লোকশ্রুতি যে হনুমান প্রথম এই মহানাটক রচনা করেন। পরে দামোদরমিশ্র এটিকে সুন্দরভাবে সাজান। এই মহানাটকে নাটকীয়তা অত্যন্ত কম। তাছাড়া সেখানে ১৪টি অঙ্ক আছে। সুতরাং কোনো দিক থেকেই

একে মহানাটক বলে মানা যায় না।

প্রকরণ —

প্রকরণও নাটকের মত একটি পূর্ণাংগ দৃশ্যকাব্য। তাই প্রকরণ বহুলাংশে নাটকধর্মী ও নাটক গুণান্বিত। প্রকরণের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয় সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রকরণের বিষয়বস্তু নাটকের মত প্রসিদ্ধ নয়, কবিকল্পিত।[৩৩] অর্থাৎ প্রকরণের আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ মৌলিক। মর্ত্যলোকে পরিচিত কোনো ঘটনার উপর কবি কল্পনার রঙ্ চড়িয়ে তাঁর ইতিবৃত্ত রচনা করেন।[৩৪] ভবভূতির লেখা "মালতীমাধবম্", শূদ্রকের লেখা 'মৃচ্ছকটিকম্' প্রভৃতি প্রকরণের উদাহরণ।

প্রকরণের নায়ক হবেন বিপ্র, বণিক্, অমাত্য অথবা অমাত্যপুত্র, পুরোহিত প্রভৃতির অন্যতম।[৩৫] অন্যভাবে বলা যায় যে প্রকরণের নায়ক নাটকের মত দেবতা, রাজা বা রাজর্ষি হন না।[৩৬] প্রকরণের নায়ক নাটকের মত ধীরোদাও হবে না। সে হবে ধীরপ্রশান্ত। সে বিনাশশীল ধনসম্পদ্ অর্জনে ব্যাপৃত হবে অথবা ভোগ্যবস্তুতে আসক্ত হবে। অর্থাৎ প্রকরণের নায়ক হবে ভোগী এবং বিঘ্নসংকুল।[৩৭] প্রকরণের নায়ক ব্রাহ্মণ, অমাত্য বা বণিক জাতীয় চরিত্র হ'তে পারে। 'মৃচ্ছকটিকম্' নামক প্রকরণের নায়ক বিপ্র, 'মালতীমাধব'-এর নায়ক অমাত্য এবং 'পুষ্পভূষিত' নামক প্রকরণের নায়ক বণিক্।

অবশ্য এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, 'মালতীমাধব' নামক প্রকরণের নায়ক মাধব চরিত্রটি অমাত্য নয়; সে অমাত্যপুত্র। তাই এক্ষেত্রে সংশয় জাগতে পারে যে অমাত্য নায়কের উদাহরণ হিসাবে 'মালতীমাধব'-এর দৃষ্টান্ত সঠিক নয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এক্ষেত্রে অমাত্য পদের দ্বারা অমাত্যপুত্রকেই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। কারণ প্রকরণের অঙ্গীরস হ'ল শৃঙ্গার। নায়ক অল্পবয়স্ক হ'লে তবেই শৃঙ্গাররসের পরিপুষ্টি ঘটে। রাজার অমাত্য হ'তে গেলে পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিতে হয়। সেজন্য অল্পবয়স্কের পক্ষে অমাত্য হওয়া অসম্ভব। আবার অমাত্য যদি অধিক বয়স্ক হয় তাহলে তার পক্ষে শৃঙ্গার রসের পরিপূর্ণতা দেখানোও সম্ভব নয়। তাই অমাত্যপদের দ্বারা অমাত্যপুত্র বা ভাবী অমাত্য ধরাটাই সমীচীন।

প্রকরণের কোনো কোনো ক্ষেত্রে নায়িকা হবে কুলস্ত্রী; কোথাও বেশ্যা; আবার কোথাও বা উভয়ই।[৩৮] অর্থাৎ প্রকরণের নায়িকা কুলস্ত্রী, কুলটা অথবা দুইই হ'তে পারে।[৩৯] কুলস্ত্রী নায়িকার উদাহরণ 'পুষ্পভূষিত'

ও 'মালতীমাধব' নামক প্রকরণ। কুলটা বা বেশ্যা নায়িকার উদাহরণ 'তরঙ্গবৃত্ত' নামক প্রকরণ এবং কুলজা ও বেশ্যা উভয়প্রকার নায়িকার উদাহরণ 'মৃচ্ছকটিক'। নায়িকার বিভাগ অনুসারে প্রকরণকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যে প্রকরণের নায়িকা কুলস্ত্রী সেই প্রকরণের নাম শুদ্ধপ্রকরণ; বেশ্যা বা গণিকা যেখানে নায়িকা তার নাম ধূর্তপ্রকরণ; আর বেশ্যা ও কুলস্ত্রী উভয়েই যে প্রকরণের নায়িকা সেই প্রকরণের নাম মিশ্র বা সংকীর্ণ প্রকরণ। সংকীর্ণ প্রকরণে কিতব বা ধূর্ত, দ্যূতকার, বিট, চেটক, শকার প্রভৃতি শ্রেণীর চরিত্রও থাকে।

প্রকরণের প্রধান রস একমাত্র শৃংগার। অপরপক্ষে আমরা দেখি যে নাটকে শৃঙ্গার বা বীররসের মধ্যে যে কোনো একটি রস অঙ্গী বা প্রধান রস হ'তে পারে। নাটকের সঙ্গে প্রকরণের এটিও একটি মূলগত পার্থক্য।[৪০] অবশ্য নাটকের মত প্রকরণের শেষেও অদ্ভুত রসের অবতারণা করা হয়।

প্রকরণের অংকসংখ্যা নাটকের মতই। অর্থাৎ প্রকরণের অংকসংখ্যা পাঁচ এর কম অথবা দশ এর বেশী হবে না।[৪১] তবে এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। যেমন ভাসের "প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ" একটি প্রকরণ। অথচ এর অঙ্কসংখ্যা চার।

প্রকরণের সন্ধিসংখ্যাও নাটকের মত। অর্থাৎ প্রকরণ পঞ্চসন্ধিযুক্ত। এছাড়া প্রকরণের বৃত্তি হবে কৌশিকী। কারণ প্রকরণের একমাত্র অঙ্গীরস হ'ল শৃঙ্গার। উপরন্তু নাটকের মত প্রকরণেও প্রয়োজন হ'লে 'অর্থোপক্ষেপক' থাকে।

নাটক ও প্রকরণের মৌলিক প্রভেদটি প্রতীয়মান হয় "দশরূপক" গ্রন্থে।[৪২] নাটক ও প্রকরণ এই দুটি প্রধান রূপকের মধ্যে যে পার্থক্য তা হ'ল মূলতঃ 'বস্তু' ও 'নায়ক-নায়িকা'গত। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের জন্যই নাটকের চেয়ে প্রকরণের পরবর্তিতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। যদিও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সংখ্যাধিক্যে ও জনপ্রিয়তায় নাটকেরই স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তবুও সংস্কৃতে যে কটি প্রকরণ আছে তা ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের এক নতুন যুগ, এক বিস্ময়কর বিবর্তনেরই পরিচয় দেয়।

নাটকের নায়ক দেবতা বা রাজর্ষি। তাই তিনি অসাধারণ শক্তির অধিকারী এবং অতি ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। সেজন্য তাঁর পক্ষে অক্ষয় ধর্মকামার্থ এমনকি মোক্ষের সাধনাও সম্ভবপর। নাটকে মনুষ্যত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হ'লেও সে মনুষ্যত্ব নরত্ব নয়; নরপতিত্ব। এই দেবসদৃশ মনুষ্যত্বের জন্যই নাটকীয়

জীবন-দ্বন্দ্বে উত্থান-পতনের যে গতি তা সাধারণ গতি নয়। অপরপক্ষে প্রকরণের নায়ক হন ধীরপ্রশান্ত, অপায়যুক্ত (ক্ষয়িষ্ণু), ধর্ম-কামার্থের উপাসক বা সাধক। তাই প্রকরণেই মনুষ্যমনের সুকুমারবৃত্তি ও ললিতকলার সর্বাধিক বিকাশ ঘটে। 'নাটক' মুখ্যত ভাববাদী (Idealistic) কিন্তু 'প্রকরণ' বস্তুবাদী (Realistic)।

নায়ক-নায়িকা, বিষয়বস্তু প্রভৃতি সকল দিক বিচার করলে দেখা যায় যে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য কতকগুলি বিশিষ্ট theory বা মতবাদ চিরকালের জন্য আঁকড়ে ধ'রে স্থিতিশীল হয়ে থাকেনি। মানুষের মনোরঞ্জন, লোকশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নের জন্য যুগে যুগে দৃশ্যকাব্যের রূপ ও রস নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ'য়েছে। সেজন্যই দৃশ্যকাব্যের এত ভেদ, এত রূপ। সব রূপগুলি শ্রেয় নয় ঠিকই; তবু নাট্যকারদের চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়নি। সে কারণেই একদিন দৃশ্যকাব্যের বিবর্তনে 'প্রকৃষ্ট-করণ' বা প্রকরণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির উদ্ভব হ'য়েছিল।

সাধারণ নাট্যামোদীদের কাছে নাটক ও রূপক শব্দ সমার্থক। তাই রূপকে যারা অভিনয় করে তাদের বলা হয় নট এবং নটী। নাটক এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের এরূপ নামকরণ করা হয়। রূপক যেখানে মঞ্চস্থ হয় তাকে বলে নাট্যমঞ্চ বা নাট্যশালা। বাংলা সাহিত্যেও যা অভিনয়যোগ্য তা প্রায় সবই নাটক বা নাটিকা। ইংরাজীর theatre, drama এবং play শব্দগুলি বলতে সাধারণ মানুষ নাটককেই বোঝে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক দৃশ্যকাব্যের একটি অন্যতম বিভাগমাত্র। দৃশ্যকাব্যের দশরকম বিভাগের মধ্যে কার সঙ্গে কার কোন্ দিক্ থেকে কতখানি পার্থক্য তা বোঝার জন্য এবং বোঝানোর জন্য রূপকের অন্যান্য অঙ্গ সম্পর্কে কতিপয় আলোচনা দরকার ব'লে আমরা মনে করি। তাহলে অন্যান্য দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে নাটকের মূলগত পার্থক্য খুব সহজেই প্রতীয়মান হবে। ইতিমধ্যে প্রকরণের সঙ্গে নাটকের তফাৎ কোথায় তা আলোচিত হ'য়েছে। এবার ভাণ, প্রহসন, বীথী, অঙ্ক, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ এবং ব্যায়োগ নামক দৃশ্যকাব্যের অন্যান্য ভেদ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

ভাণ —

"বিটেন ভণ্যতে ইতি ভাণঃ" — বিটের দ্বারা যা ভণিত হয় তাই ভাণ। বিট হ'ল পণ্ডিত ও রসজ্ঞ ধূর্ত ব্যক্তি।[৪৩] ভাণ হ'ল একটিমাত্র পাত্র বা চরিত্রের দ্বারা অভিনীত একাংকবিশিষ্ট রূপক। এই ভাণ দুইপ্রকার।

একটিতে ধূর্ত আপন জীবনেরই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। আর অন্যটিতে সে অন্য ধূর্তের চরিত্র অভিনয় করে। সুতরাং নিজের হোক্ বা অন্যের হোক্ ধূর্ত চরিত্র ধূর্তের দ্বারা অভিনীত হ'লেই 'ভাণ' হয়।[৪৪]

এর চরিত্র একটি হ'লেও এতে উক্তি প্রত্যুক্তি থাকে। যাদের সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তি হয় তারা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয় না। অদৃশ্য বক্তার উক্তি 'আকাশ ভাষণের' সাহায্যে অভিনেতার প্রত্যুক্তি থেকেই বোঝা যায়। ইংরাজীতে যা dramatic monologue বা একোক্তি, "ভাণ" বস্তুত তাই।

ভাণের বিষয়বস্তু নাটকের মত 'প্রসিদ্ধ' নয়, কবিকল্পিত ঘটনা। দশরূপকের ভাষায় "বস্তু কল্পিতম্"। নাটকের মত এই দৃশ্যকাব্যের সন্ধিও পাঁচটি নয়। এখানে কেবলমাত্র মুখ ও নির্বহন নামক দুটি নাট্যসন্ধি বর্তমান থাকে। ভাণ শ্রেণীর রূপকের উদাহরণ হ'ল "লীলামধুকর"।

কিন্তু বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা বলতে পারি যে 'ভাণ' যেহেতু একজন অভিনেতার দ্বারা অভিনীত রূপক, সেহেতু একক অভিনেতার নৈপুণ্য ও ক্ষমতার উপরেই এই রূপকের সাফল্য নির্ভরশীল। কিন্তু একজনের ক্ষমতায় একটি রঙ্গমঞ্চের সর্বাঙ্গীণ সফলতা সম্পাদন অসম্ভব। অতএব এই রূপক যে যুগের সৃষ্টি, নাট্যপ্রতিভার দিক থেকে সেই যুগ নিশ্চয়ই অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল। তাই এই যুগ ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের একটি অন্ধকার যুগ। প্রেক্ষকের রুচি ও নাট্যচর্চা, নট ও নাট্যকারের আদর্শ ও প্রতিভা – এসব কিছুই মন্দ বা নষ্ট না হ'লে এই জাতীয় সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। এ যেন প্রহসন সৃষ্টির এক পূর্ব সংকেত।

প্রহসন — প্রহসন হ'ল হাস্যরসাত্মক দৃশ্যকাব্যবিশেষ। ভাণ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে এর বেশ কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন ভাণের মত এই শ্রেণীর রূপকে একটি অঙ্ক থাকে, মুখ ও নির্বহণ নামক দুটি সন্ধি থাকে, দশটি লাস্যাঙ্গ থাকে এবং এর ইতিবৃত্ত (plot) হয় কবিকল্পিত। প্রহসনের ইতিবৃত্ত কোনো নিন্দিত ব্যক্তির ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে ওঠে। এখানে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক থাকে না; আরভটী বৃত্তিও থাকে না। এই রূপকের অঙ্গীরস হ'ল হাস্যরস।[৪৫] তাই ভাণের সঙ্গে প্রহসনের অনেকাংশে মিল থাকলেও নাটকের সঙ্গে এর বহুলাংশেই পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত শুদ্ধ ও সংকীর্ণভেদে প্রহসনকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন।[৪৬] আচার্য্য বিশ্বনাথ

ও ধনঞ্জয় প্রহসনকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা শুদ্ধ, সংকীর্ণ ও বিকৃত।[৪৭] শুদ্ধ প্রহসনে তপস্বী, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মধ্যে একজন নায়ক হবেন এবং তিনি হবেন 'ধৃষ্ট'। সাহিত্যদর্পণকার ধৃষ্ট নায়কের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন – যিনি অপরাধী হ'য়েও নিঃশঙ্ক, তিরস্কৃত হ'য়েও যাঁর লজ্জা নেই, ধরা প'ড়েও যিনি মিথ্যা বলেন তিনিই ধৃষ্ট নায়ক।[৪৮]

দর্পণকারের মতে যে প্রহসনের নায়ক ধৃষ্ট নয়, সেই প্রহসনের নাম সংকীর্ণ প্রহসন। মতান্তরে প্রহসনে 'ধৃষ্ট' নায়কের সংখ্যা এক হ'লে তা 'শুদ্ধ'; আর ধৃষ্ট নায়কের সংখ্যা একাধিক হ'লে তা সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণ প্রহসন দ্বিঅংকবিশিষ্টও হ'তে পারে।

প্রহসন প্রসঙ্গের পরিশেষে বলা যায় যে আদর্শ ও আচরণে অসংগতির প্রতি ব্যঙ্গ কটাক্ষই এর স্বরূপ। এটি হাস্যরসপ্রধান দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত সংকীর্ণ প্রহসন কৌতুকনাট্য বা farce এরই সগোত্র। আর শুদ্ধ প্রহসনগুলিতে কৌতুকরস (fun)ই বেশী। তবে তাতে ব্যংগরস (satire) ও আছে। কিন্তু বাগ্‌বৈদগ্ধ্য (wit) নেই বললেই চলে। করুণ হাস্যরস (Humour) এর সম্পূর্ণ অভাব এতে পরিলক্ষিত হয়। আর সেজন্যই হয়তো প্রহসন উত্তম প্রেক্ষকের জন্য নয়; মূর্খ, স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য এধরণের রূপক রচিত। পূর্ণাংগ রূপকের পূর্ণ মর্যাদা এতে নেই। এতে ভারতীবৃত্তিই প্রধান অর্থাৎ বাচনিক অভিনয়েরই বিশেষ প্রাধান্য এই রূপকে। আসলে সব দেশে এবং সব সমাজেই প্রহসন বা ব্যঙ্গনাট্য তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষের নীচতায় মনুষ্যসমাজ নষ্ট, ভ্রষ্ট ও ব্যভিচারদুষ্ট হয়। বস্তুতঃ এই সময় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের আচার-আচরণের অধঃপতন ঘটে। তাই বলা যেতে পারে যে 'ভাণ' চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমাজের অধোগতির যে রূপ, যে দৃশ্য সূচিত হয়, প্রহসনে তারই পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়।

বীথী — বীথী নামক রূপকে একটি মাত্র অঙ্ক থাকে এবং এর নায়কও একজন। এতে আকাশভাষণের সাহায্যে বিচিত্র উক্তি-প্রত্যুক্তি রচনা ক'রে প্রচুর শৃংগার রসের এবং অল্প অল্প অন্য রসের সূচনা থাকবে। এতে মুখ ও নির্বহণ নামক দুটি সন্ধি এবং সমস্ত প্রকার অর্থপ্রকৃতির প্রয়োগ দেখানো হয়।[৪৯] নাট্যশাস্ত্রে বীথী প্রসংগে বলা হ'য়েছে যে একাংকবিশিষ্ট বীথী দুই পাত্র বা একপাত্র দ্বারা অভিনেয়। অধম, মধ্যম ও উত্তম – তিনপ্রকার চরিত্রই এতে থাকবে। এটি হবে সর্বরসলক্ষণযুক্ত (সকল রসের লক্ষণযুক্ত/সকল রস ও লক্ষণযুক্ত)[৫০]

বীথীর তেরোটি অঙ্গ। যথা - ১) উদ্ঘাত্যক, ২) অবলগিত, ৩) প্রপঞ্চ, ৪) ত্রিগত, ৫) ছল, ৬)

বাক্‌কেলি, ৭) অধিবল, ৮) গণ্ড, ৯) অবস্যন্দিত, ১০) নালিকা, ১১) অসৎ প্রলাপ, ১২) ব্যাহার এবং ১৩) মৃদব।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে উপরিউক্ত বীথ্যঙ্গগুলি নাটক প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যের সাধারণ লক্ষণ, তাই ঐগুলি নাটকাদি রূপকেও প্রযোজ্য হয়, অতএব নাটকের আলোচনাবসরে এই অংগগুলির বর্ণনা না ক'রে 'বীথী'র নিরূপণপ্রকরণে এদের লক্ষণ বর্ণনা করা হ'ল কেন? এর উত্তরে দর্পণকার বলেন যে এই অঙ্গগুলি নাটক প্রভৃতিতে অবশ্যকর্তব্য নয়, সম্ভব হ'লে প্রযোজ্য।[৫১] কিন্তু বীথীতে এরা অবশ্যবিধেয়।

ভারতীবৃত্তির চারটি অঙ্গের অন্যতম এই রূপক। প্ররোচনা, বীথী, প্রহসন ও আমুখ – এই চারটি ভারতী বৃত্তির অঙ্গ। কিন্তু 'বীথী' ভারতীবৃত্তির অঙ্গ হ'লেও এতে কৌশিকী বৃত্তির স্থান গৌণ নয়। এই রূপকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল – এটি দ্বিসন্ধিবিশিষ্ট হ'লেও এতে বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য – এই পঞ্চ অর্থপ্রকৃতিও থাকে।

বীথী শব্দের অর্থ দুপাশে বৃক্ষছায়াযুক্ত পথ। পথের দুপাশে যেমন সারিবদ্ধভাবে বৃক্ষগুলি সাজানো থাকে তেমনি এই শ্রেণীর রূপকে বিভিন্ন প্রকার রস মালার মত যেন সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে। রসের এই সারবদ্ধ বৈশিষ্ট্য বৃক্ষশ্রেণীর মতই। তাই বীথী নামকরণের পিছনে একটি চিত্রকল্প আছে একথা আমরা বলতে পারি। সুতরাং বলা যায় যে নাট্যাভিনয়ে 'সুকুমার' প্রয়োগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের পূর্বে 'বস্তু', 'বৃত্তি' ও 'প্রকৃতি'র দিক থেকে বীথীই পূর্ণাংগ নাটকীয়তার পথে প্রকৃতপক্ষে প্রথম পদক্ষেপ।

অংক — অংক নামক দৃশ্যকাব্যটি একটি একাংকবিশিষ্ট রূপক। এই রূপকের অপর একটি নাম উৎসৃষ্টিকাংক। সাধারণভাবে নাটকের এক একটি পরিচ্ছেদকে 'অঙ্ক' বলা হয়। পরিচ্ছেদার্থক অঙ্কের সঙ্গে 'অঙ্ক' নামক রূপকের পার্থক্য করার জন্যই এই রূপকের নাম উৎসৃষ্টিকাংক দেওয়া হ'য়েছে। কোনো খ্যাত চরিত্র এর নায়ক হ'তে পারে না। তাই এই রূপকের নায়ক হন কোনো সাধারণ ব্যক্তি। করুণ রসই এর মুখ্য রস। এতে বহু স্ত্রীলোকের বিলাপ থাকে। এই রূপকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কাহিনীকে কবি নিজ বুদ্ধির দ্বারা বিস্তৃতভাবে দেখান।[৫২] ভাণ শ্রেণীর রূপকের মত এই রূপকেও মুখ ওপ্রতিমুখ নামক সন্ধি থাকে। এতে সামান্য কৌশিকীবৃত্তি ও বহুল পরিমাণে ভারতীবৃত্তি থাকে। দশটি লাস্যাঙ্গও এই রূপকের বৈশিষ্ট্য। এতে নায়কের জয় এবং প্রতিনায়কের পরাজয় প্রদর্শিত হয়।[৫৩] নায়ক ও প্রতিনায়কের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ এখানে দেখানো হয়, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ নয়। এতে অনেক তিরস্কারবোধক বাক্য থাকে।

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে অস্ত্রযুদ্ধের অবসান ঘোষণা এই প্রথম। এই রূপকে নায়ক ও প্রতিনায়কের জয় পরাজয়ের মধ্যপথে বহু নারীর বেদনা-বিলাপ ও অশ্রুসিক্ত ঘটনা থাকে। এতে ইংরাজী ট্রাজেডির করুণ সুরের স্পর্শ ও প্রকাশ থাকে। ভারতীয় নাট্যলোকের এ যেন এক করুণ রাগিণী।

সমবকার — আচার্য্য বিশ্বনাথ "সমবকার" শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন – "সমবকীর্য্যন্তে বহবোऽর্থা অস্মিন্নিতি" অর্থাৎ যে রূপকে বহু বিষয় কবির কল্পনার দ্বারা নিবদ্ধ হয় তাকে বলে সমবকার। মহেন্দ্রবিজয় উৎসবে অভিনীত প্রথম রূপক "দেবাসুরসংগ্রাম" এবং দ্বিতীয় রূপক "অমৃতমন্থনম্" সমবকারের উদাহরণ হিসাবে কথিত হয়। সুতরাং এর থেকে আমরা মন্তব্য করতে পারি যে রূপকের ইতিবৃত্তে 'সমবকার'ই প্রথম সৃষ্টি।

সমবকার তিন অঙ্কের রূপক। এর প্রথম অঙ্কে মুখ ও প্রতিমুখ নামক দুটি সন্ধি থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে যথাক্রমে গর্ভসন্ধি ও উপসংহার সন্ধির বর্ণনা থাকে। এই দৃশ্যকাব্যে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ ও উপসংহার – এই চারটি সন্ধির বর্ণনা থাকলেও বিমর্ষ নামক কোনো সন্ধি এতে থাকে না। এই রূপকের নাটকীয় কথাবস্তু হবে বিখ্যাত এবং তা দেবতা ও অসুরবিষয়ক হবে।৫৪ সমবকারে দেবতা ও দানব মিলে নায়ক থাকেন বারো জন এবং তাঁরা প্রত্যেকে ধীরোদাত্ত লক্ষণযুক্ত হবেন। এঁদের ফলও হবে পৃথক পৃথক। বীররসই হবে এর অঙ্গীরস।[৫৫] এই রূপকে সমস্ত বৃত্তি থাকবে তবে কৌশিকী বৃত্তি অল্প থাকবে। এতে বিন্দু ও প্রবেশক থাকবে না।[৫৬]

সমবকার নামক দৃশ্যকাব্যের নায়ক কে হবেন সে বিষয়ে সাহিত্যদর্পণকার ও দশরূপককারের মধ্যে আমরা মতপার্থক্য লক্ষ্য করি। দশরূপককার বলেন – সমবকারের নায়ক দেবতা ও দানব।[৫৭] কিন্তু সাহিত্যদর্পনকার আচার্য বিশ্বনাথের মতে সমবকারের নায়ক দেবতা ও মানব।[৫৮] ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে স্পষ্ট তেমন নির্দেশ নেই। তবে সেখানে একটি সুস্পষ্ট সূচনা আছে[৫৯] অবশ্য সমবকারের দৃষ্টান্ত হিসাবে যেহেতু সেখানে 'অমৃতমন্থনম্' এর উল্লেখ আছে, সেহেতু আমরা বলতে পারি যে এই শ্রেণীর রূপকের নায়ক দেবতা ও দানবই হবেন। মানুষ নায়ক হ'লে এক্ষেত্রে তার স্পষ্ট নির্দেশ থাকত।

এই দৃশ্যকাব্যের চরিত্র অনেক। তাই এর অভিনয়ের জন্য বহু নট-নটীর প্রয়োজন। এই রূপক সংগ্রাম অথবা সংগ্রাম-সদৃশ উদ্ধত উৎসাহের এক মহাচিত্র। তাই একই সময়ে বহু নট-নটীর প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। মঞ্চ সুপ্রশস্ত না হ'লে অভিনয় অসম্ভব। সেজন্যই মনে হয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'জ্যেষ্ঠ',

'মধ্যম' ও 'অবর' বা 'কনীয়' – এই ত্রিবিধ নাট্যমণ্ডপের উল্লেখ দেখা যায়। দেবতাদের জন্য 'জ্যেষ্ঠ' ভবন, নৃপতিদের জন্য 'মধ্যম' এবং অন্যসকলের জন্য কনীয় নাট্যমণ্ডপের কথা বলা হ'য়েছে। 'জ্যেষ্ঠ' ভবন দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত, 'মধ্যম' ভবন ৬৪ হাত এবং কনীয় ভবনের জন্য ৩২ হাত পরিমাপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৬০] সুতরাং এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে সমবকার নামক সুবৃহৎ রূপকটি দেবাসুরব্যাপার এবং এটি জ্যেষ্ঠ ভবনেই অভিনীত হ'ত।

এই শ্রেণীর রূপকের অভিনয়ের কাল সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে সর্বসমেত ১৮ নালিকা বা নাড়িকায় এই অভিনয় সম্পন্ন হয়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১ নাড়িকা = ২৪ মিনিট। সুতরাং ১৮ নাড়িকা = ১৮X২৪ মিনিট = ৪৩২ মিনিট = ৭ ঘন্টা ১২ মিনিট। অতএব আমরা বলতে পারি যে সমবকারের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল : ১) অপার্থিব অমানবীয় ব্যাপার, ২) জ্যেষ্ঠভবন অর্থাৎ প্রশস্ত রঙ্গমঞ্চ এবং ৩) অভিনয়ের জন্য দীর্ঘ সময়।

নাটক বা প্রকরণে পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়া উচিত নয় ব'লে নাট্যশাস্ত্রে মতপ্রকাশ করা হয়। পুরুষের সংখ্যা চার অথবা পাঁচ হবে ব'লে এখানে মন্তব্য করা হ'য়েছে।[৬১] সুতরাং চরিত্রসংখ্যা যদি কম হয় তাহলে নাট্যমণ্ডপ বড়ো হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী? বরং অভিনয়মঞ্চ বেশী বড়ো হ'লে সুবিধার থেকে অসুবিধাই বেশী। কারণ বড়ো মঞ্চে নট-নটীর কন্ঠস্বর, গীতবাদ্য সুশ্রাব্য হয় না। একারণেই নাটক-নাটিকা প্রকরণ প্রভৃতির আবির্ভাবের সঙ্গে জ্যেষ্ঠভবনের প্রয়োজনীয়তাও দূরীভূত হয়। তাছাড়া সমবকারের মত রূপকের অদ্ভুত, অপার্থিব ও অমানুষিক ব্যাপার মর্তের সাধারণ মানুষের কাছে ছিল স্বর্গের মতই নাগালের বাইরে। তাই মানুষ যখন এই শ্রেণীর রূপককে আত্মস্থ করতে পারছিল না, এর মধ্যে দিয়ে ঠিক আনন্দ পাচ্ছিল না, তখনই মর্তের ঘটনায় সৃষ্টি হ'ল নাটক-নাটিকা। অভিনয়ের ঘটনা মানুষের বুদ্ধি ও উপলব্ধির সীমার মধ্যে পৌঁছাল। 'সামাজিক জন' সত্যই সেখানে দেখল সমাজের ছবি, শুনল আপন প্রতিবেশের প্রাণের স্পন্দন। তাদের কাছে নাটক হ'ল পরম আদরের, একান্ত হৃদয়ের।

সমবকারের আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ্য যে এই শ্রেণীর রূপকে প্রবেশক ও বিন্দু থাকে না। বিন্দুসমূহের সংক্ষিপ্তসার অবলম্বন ক'রেই প্রবেশক প্রযুক্ত হয়। বস্তুতঃ প্রবেশকের কাজ বিন্দুর মতই। বিন্দুর মতই সংযোগ ও সংহতি রক্ষা ক'রে প্রবেশক ঘটনাবন্ধনকে শিথিল হ'তে দেয় না। সুতরাং সমবকারে যেহেতু বিন্দু ও প্রবেশক থাকে না সেহেতু এটি একটি শিথিল, বন্ধরূপক।

তাই নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে সমবকারের স্থান প্রথম হ'লেও নাট্যশাস্ত্রের বিচারে এর স্থান অনেক নীচে। পূর্ণাংগ, পরিণত দৃশ্যকাব্য বলতে যা বোঝায় এটি সেরূপ নয়। সমগ্র জম্বুদ্বীপকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট থেকে উদ্ধার করবার জন্য একদা লোকশিক্ষার সর্বোত্তম বাহনরূপে যে লোকবেদের উদ্ভব হ'য়েছিল, সমবকার সেই লোকবেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সিদ্ধ করতে পারেনি। তবে রূপকের জগতে এর মূল্যও কম নয়। কারণ বহু দেশ যখন নিছক পশুধর্মে অচৈতন্য ও অনুদার তখন এই দৃশ্যকাব্যটি মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধিকে প্রথম স্পর্শ করেছিল। মানুষের মলিন চিত্তকে অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে বার ক'রে এক নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়েছিল। তাই হীনপ্রভ হ'লেও এটিই ভারতবর্ষের সাহিত্য ও সংস্কৃতির আকাশে প্রথম জ্যোতিষ্ক। পরবর্তী পর্যায়ে এর হাত ধ'রে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক দুটি ভারতবর্ষের সাহিত্য-সংস্কৃতির আকাশকে বিভা দান ক'রেছে সেদুটি হ'ল নাটক ও প্রকরণ।

সমবকারের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'অমৃতমন্থন' পাওয়া যায় না। বর্তমানে এই শ্রেণীর যে রূপক গ্রন্থটি পাওয়া যায় তা হ'ল বৎসরাজকৃত 'সমুদ্রমন্থন'। এটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা। তবে কেউ কেউ ভাসের 'পঞ্চরাত্র'কে সমবকার ব'লে মনে ক'রে থাকেন। কিন্তু এই ভাবনা ঠিক নয়। কারণ এই গ্রন্থটির রূপ (form) এবং আংগিক (technique) এর সঙ্গে সমবকারের মিল নেই।

ডিম — সংস্কৃত-নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনে 'ডিম' হ'ল দ্বিতীয় রূপক। ডিম শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তা বলা কঠিন। তবে মনে হয় এর অর্থ সংঘাত। নায়কে নায়কে সংঘাত-সর্বস্ব ব'লে এই রূপকের নাম ডিম।[৬২] সমবকারের মত এই দৃশ্যকাব্যের বিষয়বস্তুও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এখানে নায়ক সমবকারের মত শুধু দেবতা ও অসুর নয়; দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, মহাসর্প, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি এর ষোল জন নায়ক। এখানে রৌদ্র-রস হ'ল প্রধান রস। এর অঙ্ক সংখ্যা চারটি।[৬৩] এতে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক থাকে না। কিন্তু চূলিকা, অঙ্কাবতার এবং অঙ্কমুখ নামক অঙ্গ থাকে। এখানে কৌশিকী বৃত্তি ভিন্ন অন্যান্য বৃত্তি থাকে এবং বিমর্ষ সন্ধি ব্যতীত অন্যান্য সন্ধি থাকে। ডিম সম্পূর্ণরূপে শান্ত, হাস্য এবং শৃংগাররসবর্জিত।[৬৪]

'রৌদ্র-বীভৎস-ভয়ানক' রসের এই রূপকটিতে বীরত্বের মহিমা অপেক্ষা নৃশংসতার তাণ্ডবই বড়ো। এতে নাটকীয় গতি থাকলেও নাট্যগত প্রগতি নেই। এই রূপকের কোথাও দেবাসুর-সংগ্রামের দৈব উৎসাহ এবং দৈবীমায়া আবার কোথাও বা পৈশাচিক সংগ্রামের পশুপ্রেরণা ও পাশবিক জিঘাংসা। এটি নাট্যজগতে ক্রমোন্নতির পরিচিতি না হ'লেও দেবতার জগৎ থেকে মানুষের জগতে নাট্যসাহিত্যের ক্রমাবতরণের এটি এক অপূর্ব সূচনা।

ডিমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্‌ভ্রান্তি, চন্দ্রগ্রহণ,সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি। এতে দেবতার সঙ্গে অপদেবতা ও উপদেবতার স্থান হ'য়েছে। 'দেবাসুর-সংগ্রাম' অথবা 'অমৃতমন্থন' দেখে মানুষ দেবতাকে আরও বড়ো ক'রে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। সমুদ্রমন্থনের ফলে যে অমৃত, যে লক্ষ্মীলাভ হ'য়েছে তা মানুষকে পরমার্থপ্রবণই করেছে। 'মহেন্দ্রবিজয়ে'র দৃশ্য দেখে, এর সংলাপ শুনে হয়তো কোথাও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, হয়তো বা দর্শকে দর্শকে দলগত বিরোধও বেধেছে কিন্তু বিক্ষোভ ও বিরোধে দেবতার ক্ষমতার প্রচার হ'লেও অপদেবতার নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেজন্য সমবকারে মানবজীবনে নূতনের দোলা লাগলেও সে নূতন মানুষকে অবনত করেনি; সমাজের জঘন্য রূপ এতে ফুটে ওঠেনি। 'ডিম' রূপকেই এই জঘন্য রূপ প্রথম ফুটে উঠল। মানুষের মধ্যে যে পশু অহরহ জেগে উঠে মানুষকে মহানরকের বীভৎসতার দিকে এগিয়ে দিতে চায় তারই প্রচণ্ড রূপ এই 'ডিম'। সমবকার দেখে যেখানে একদিন সংক্ষোভ জেগেছিল, ডিম রূপক প্রত্যক্ষ ক'রে সেখানে জাগল সন্ত্রাস। এরপর থেকেই নাট্যসাহিত্যের মোড় ফিরল। নাট্যসাহিত্যের 'আবিদ্ধ' রূপেও মনুষ্যচরিত্রের স্থান হ'ল। এই পরিবর্তনের স্রোতে আবির্ভূত হ'ল 'ব্যায়োগ'।

ব্যায়োগ — ''ব্যায়ুজ্যন্তে অস্মিন্ বহবঃ পুরুষাঃ ইতি ব্যায়োগঃ'' – অর্থাৎ এই শ্রেণীর রূপকে বহু চরিত্র থাকে ব'লেই এর এরূপ নামকরণ করা হ'য়েছে। ব্যায়োগের ইতিবৃত্ত হয় কোনো পুরাণ বা ইতিহাসখ্যাত ঘটনা। পাঁচটি নাট্যসন্ধির মধ্যে গর্ভ ও বিমর্ষসন্ধি এখানে থাকে না। স্ত্রীচরিত্রও এখানে অত্যন্ত অল্প থাকে।[৬৫] উদ্ধত অথচ বিখ্যাত মানুষ এর নায়ক। ডিমের মত এই রূপকটিও শৃংগার ও হাস্যবর্জিত এবং কৌশিকী বৃত্তিহীন।[৬৬] একটিমাত্র অংকযুক্ত এই শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যে স্ত্রীলোকের জন্য ব্যতীত অন্য কারণে যুদ্ধ হবে।[৬৭]

এই রূপকের নায়ক মানুষ হ'লেও মানুষের নিষ্ঠুরতার চিত্রই এর প্রধান প্রতিপাদ্য। সুকোমল হৃদয়বৃত্তির পরিচয় এতে নেই। এছাড়াও নারীচরিত্রের বিকাশের অবসর এতে নেই। অবশ্য নারীর জীবন নিয়ে খেলা, নারীকে কেন্দ্র ক'রে সংগ্রাম, সংঘর্ষ এতে নিষিদ্ধ হওয়ায় নারীত্বের মর্যাদা ক্ষুন্ন হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। সমবকার ও ডিম নামক রূপকে এধরণের কোনো বাধানিষেধ বিহিত হয়নি। কারণ ঐ দুই রূপকের বিষয়বস্তু ছিল দেবতা বা অর্ধদেবতার লীলা। কিন্তু নরচরিত্রের অভিনয়ে নর-নারীর সম্পর্ক পাছে সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করে ও দর্শকচিত্তে অশুভ প্রবৃত্তির প্রভাব পড়ে, এই আশংকায় হয়তো মনুষ্যজীবনের প্রথম রূপায়ণে এই ধরণের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হ'য়েছে।

এই রূপকের মধ্যে বস্তুবিস্তৃতি নেই। একটি অঙ্কের মধ্যেই মুখ, প্রতিমুখ ও নির্বহণ সন্ধি অর্থাৎ বীজ ও ফল, আরম্ভ ও কার্যের চিত্র অঙ্কিত হ'য়ে থাকে। সেজন্য মানুষের নিষ্ঠুরতা ও ঔদ্ধত্যের গতিপথ অনেকখানি সীমিত ও সংকুচিত হ'য়েছে। যাই হোক্, এটাই প্রাচীন ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে কঠোরতার শেষ রূপ। এরপর কঠোরতার সঙ্গে কোমলতার সংমিশ্রন ঘটল, নরচরিত্রের সঙ্গে নারীচরিত্র যুক্ত হ'ল; নাটকীয় ইতিবৃত্তে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মেলবন্ধন ঘটল। এই রূপকের মধ্যে দিয়েই নাট্যজগতে 'আবিদ্ধ' রূপের উপসংহার ও 'সুকুমার' রূপের প্রারম্ভের শুভ সূচনা ঘটল। ফলে নাট্যজগতে দেখা দিল এক নূতন সৃষ্টি, যে সৃষ্টির নাম হ'ল 'ঈহামৃগ'।

ঈহামৃগ — এই দৃশ্যকাব্যে দুর্লভ মৃগের মতো অলভ্যা নায়িকাকে নায়ক লাভ করবার অভিলাষ করে, এজন্যই এর নাম 'ঈহামৃগ'।[৬৮] আচার্য বিশ্বনাথ ঈহামৃগ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ক'রে বলেছেন যে এইপ্রকার রূপকে নায়ক মৃগের মত অলভ্য নায়িকাকে কামনা করেন বলে এর নামকরণ হ'য়েছে ঈহামৃগ।[৬৯]

এইরূপকের বিষয়বস্তু খ্যাত নয় – মিশ্র অর্থাৎ খ্যাত ও অখ্যাত। এর অঙ্কসংখ্যা চারটি এবং সন্ধি তিনটি। এতে মানুষ নায়ক এবং দেবতা প্রতিনায়ক। উভয়েই ধীরোদ্ধত রূপে কথিত। এর অন্ত্য অর্থাৎ প্রতিনায়ক 'বিপর্যাস' অর্থাৎ বিপর্যয়জ্ঞান বা বিভ্রান্তবুদ্ধির জন্য অন্যায়কারী[৭০] অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে এই দৃশ্যকাব্যটি একাঙ্কবিশিষ্ট এবং দেবতা এর নায়ক।[৭১] কোনো কোনো আলংকারিকের মতে এই রূপকের নায়কসংখ্যা এক নয়, ছয়।[৭২] প্রেমাস্পদরূপে নায়িকা প্রতিনায়ককে না চাইলেও সে দিব্যা স্ত্রীকে অপহরণ ক'রে বা ছলনা ক'রে ধ'রে এনে উপভোগ করতে চাইবে। ফলে নায়ক এবং প্রতিনায়কের মধ্যে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরী হবে। কিন্তু কবি কৌশলে এরূপ যুদ্ধকে বর্জন করবেন। এই অন্যায়ের জন্য কোনো মহাত্মা বধ্য হ'লেও মঞ্চে তার বধ দেখানো চলবে না।

সুতরাং বিচার বিশ্লেষণ ক'রে আমরা বলতে পারি যে পূর্ব পূর্ব রূপক থেকে বহু বিষয়ে এতে ব্যতিক্রম ঘটেছে। মানুষের নায়কত্ব এবং দেবতার প্রতিনায়কত্বে মানুষেরই প্রাধান্য প্রকাশ পায়। দিব্যস্ত্রীলাভের জন্য দেবতা অথবা মানুষের উৎকট উন্মাদনা, দিব্যস্ত্রীর আপন পতিতে অনাসক্তি ইত্যাদি ব্যাপার দেব চরিত্রের উপরেই পরোক্ষ কটাক্ষপাত করেছে। স্ত্রীচরিত্রের প্রাধান্যদ্যোতনা এই রূপকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ব্যায়োগ' নামক রূপকে নারীর স্থান ছিল বটে কিন্তু নারী নিয়ে খেলা ছিল না সেখানে। 'ঈহামৃগে' রমণীলীলা প্রদর্শিত হ'ল এবং সে রমণী মানুষী নয় দেবী। নরনারীর পারস্পরিক অনুরাগ, শৃংগার-অভিলাষ তখন নাট্যসাহিত্যে প্রবর্তিত না হ'লেও পরবর্তী নাট্য-অভিযানে যে তা নিষিদ্ধ থাকবে

না, এই রূপকে তারই পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। ব্যায়োগে নারী নিয়ে সংগ্রাম নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু 'ঈহামৃগ' নামক দৃশ্যকাব্যে সেই নিষেধ অন্তর্হিত হ'য়েছে। বরং নারীর জন্য সংগ্রামই এর 'বীজ', এর 'বিন্দু'। পূর্বপূর্ব রূপকে যুদ্ধ আছে, বধও আছে। কিন্তু এতে যুদ্ধের পরিবেশ থাকলেও বধ্য বিষয়ে নিয়ম আছে, নিয়ন্ত্রণ আছে। নবরূপকে এই অভিনব কৌশল নূতন জীবন দর্শনেরই সূচনা করে। এই রূপক আভাষ দেয় যে প্রেক্ষক আর সংগ্রাম-চিত্রের ধ্বংস-তাণ্ডব দেখতে সম্মত নয়। তাছাড়া এই রূপকের নায়ক উদ্ধত নয়, ধীরোদ্ধত। পূর্ব-পূর্ব রূপকে দেখা যায়, নায়ক 'উদাত্ত', 'উদ্ধত' ও 'অতি উদ্ধত'। কিন্তু এই দৃশ্যকাব্যে 'ধীর' শব্দটির সন্নিবেশ নাট্যনিয়মে একটি ব্যতিক্রমেরই সূচনা করে।

নাট্যজগতে 'ঈহামৃগ'ই বোধহয় আবিদ্ধ শ্রেণীর রূপকের শেষ রূপ, শেষ বৈশিষ্ট্য। দেশ, কাল ও সমাজের বিপ্লব-বিবর্তন, সংগ্রাম ও সংঘর্ষের অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে একদা এই শ্রেণীর রূপকের উদ্ভব হ'য়েছিল। একে বলা যেতে পারে মত্ততা ও মহাপ্রলয়ের রূপ।

আসলে যে যুগে রূপক সৃষ্ট হ'য়েছিল সে যুগ ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। সবকিছুর উপরেই রাজশক্তি ও রাজার আদর্শের প্রভাব পড়ত। ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য – কোনো কিছুই এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। রাজার অনুগ্রহপুষ্ট রাজকবিগণ অনেকসময় রাজার আদর্শ ও রাজমহিমা প্রচারের জন্যই সাহিত্য রচনা করতেন, করতে বাধ্য হতেন। তাই সে যুগের সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য রচিত হ'ত। রাজচরিত্রের উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শেরও উত্থান পতন ঘটত।

কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতে অন্য সবকিছুর মতই নাট্যসাহিত্যেরও ধারা বদলেছে এবং সেই পরিবর্তনের স্রোতে একদা দৃশ্যকাব্যের নায়কের 'দেবতা' থেকে 'মানুষে' অবনমন ঘটেছে। সেই মানুষেরও নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর রূপ ক্রমশঃ কদর্যতা ও সংকীর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে সুন্দর ও মনুষ্যত্বমণ্ডিত হ'য়েছে। এই পরিবর্তনের পথেই 'ডিম' এর নায়ক 'ব্যায়োগে' কিঞ্চিৎ সংযত হ'য়েছে এবং 'ব্যায়োগে'র উদ্ধত নায়ক ঈহামৃগে আরও সংযত হ'য়ে ধীরোদ্ধত রূপ প্রাপ্ত হ'য়েছে।

এপ্রসংগে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে নাট্যাভিনয়ের মুখ্যত দুটি রূপ – ১) আবিদ্ধ এবং ২) সুকুমার। আবিদ্ধ অভিনয়ে নাটকের উগ্র, উদ্ধত, রাজসিক রূপটিই ফুটে ওঠে। আর অভিনয় যখন কান্ত-কোমল, মমতা-মেদুর, হাস্যরসে সিক্ত, তখন তার যে রূপটি প্রকাশ পায় তা 'সুকুমার'। 'সুকুমার' অভিনয়ের বৃত্তি কৌশিকী এবং এর-পাত্র-পাত্রী প্রধানত মানুষ। আবিদ্ধ অভিনয় নির্মম, নিষ্করণ। সেজন্য এই অভিনয়ে

স্ত্রীচরিত্র অতি অল্প। অপরপক্ষে সুকুমার অভিনয় নৃত্য গীতময়। তাই তা রমণীবহুল ও রমণীয়।[৭৩] 'আবিদ্ধ' রূপের প্রকাশ ঘটেছে সমবকার, ডিম, ব্যায়োগ ও ঈহামৃগ নামক চারটি রূপকে। 'নাটক' ও 'প্রহসনে' সুকুমার রূপের প্রকাশ ঘটেছে। আর এই দুই জাতীয় দৃশ্যকাব্যের মধ্যবর্তী সৃষ্টি হ'ল ভাণ, প্রহসন, বীথী ও অঙ্ক (উৎসৃষ্টিকাংক)। এরা প্রত্যেকেই একাংকিকা ও আবিদ্ধ রূপকের মত কৈশিকী বৃত্তিহীন।[৭৪] এদের প্রধান বৃত্তি ভারতী এবং এরা হীনসন্ধি। এদেরকে ঠিক রূপক বলা চলে না। এরা রূপকের অপভ্রংশ অর্থাৎ অপকৃষ্ট রূপক। আকৃতিতে এরা রূপক হ'লেও এদের প্রকৃতি মোটেই নাটকীয় নয়। শুধু সংলাপ এবং এই সংলাপকে আঙ্গিক অভিনয়ে ব্যক্ত করলেই নাটক হয় না। যে বিষয়বস্তুতে জটিলতা নেই, ঘাত-প্রতিঘাত নেই, এ্যাক্‌শন নেই, চরিত্র সৃষ্টি হয় না; তা আর যাই হোক, নাটক নয়। হয়তো একদা রঙ্গ-মঞ্চে যাই অভিনীত হ'ত, তাকেই রূপক বলা হ'ত। বিষয়বস্তু ও তার বিন্যাসে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য থাকুক বা না থাকুক, নট-নটীতে রূপের আরোপ হ'লেই রূপক হবে, হয়তো এটাই ছিল একদিন রূপক-বিচারের মানদণ্ড। তাই এই মানদণ্ড ব্যতীত কোনো প্রকারেই ভাণ প্রভৃতিকে রূপক বলা চলে না।

উপরূপক

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে দশটি রূপকের সঙ্গে আঠারো প্রকার উপরূপকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই উপরূপকগুলি হ'ল – ১) নাটিকা, ২) ত্রোটক, ৩) গোষ্ঠী, ৪) সট্টক, ৫) নাট্যরাসক, ৬) প্রস্থান, ৭) উল্লাপ্য, ৮) কাব্য, ৯) প্রেংখণ, ১০) রাসক, ১১) সংলাপক, ১২) শ্রীগদিত, ১৩) শিল্পক, ১৪) বিলাসিকা, ১৫) দুর্মল্লিকা, ১৬) প্রকরণী, ১৭) হল্লীশ এবং ১৮) ভাণিকা।[৭৫]

উপরূপক শব্দের অর্থ রূপকের নিকটবর্তী বা রূপকসদৃশ। অর্থাৎ এরা ঠিক রূপক নয়, রূপক অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই ক্ষুদ্রতা কিসে — আকারে না উৎকর্ষে? আকৃতিগত ক্ষুদ্রতাই যদি রূপক এবং উপরূপকের পার্থক্যের কারণ হয়, তাহলে বীথী, ব্যায়োগ, অঙ্ক, ভাণ প্রভৃতি একাংক রূপকগুলির উপরূপক সংজ্ঞা হওয়া উচিত। আবার উক্ত একাংকিকা অপেক্ষা বৃহত্তর নটিকা, ত্রোটক, সট্টক, প্রকরণিকা প্রভৃতির রূপক সংজ্ঞা হওয়া উচিত। যদি উৎকর্ষ ও গুণগত ক্ষুদ্রতাই উপরূপকত্বের কারণ হয়, তবে ভাণ, প্রহসন প্রভৃতি নিকৃষ্ট দৃশ্যকাব্যগুলিকে কোনো প্রকারেই রূপক বলা চলে না। অপরপক্ষে নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উপরূপকগুলির রূপক গোষ্ঠীতেই স্থান হওয়া উচিত। আসলে এই রূপক এবং উপরূপকের ভেদের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা সত্যই কঠিন। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রগুলিতে রূপক এবং উপরূপকের কোনো বিভাজন দৃষ্ট হয় না। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' এবং 'দশরূপকে' উপরূপক শব্দের উল্লেখ নেই। তবে উক্ত দুই গ্রন্থে দশপ্রকার রূপকের আলোচনার শেষে 'নাটিকা' সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

তবে বাস্তবিকপক্ষে মনে হয় যে 'নাটিকা' ব্যতীত অন্য উপরূপকগুলি অনেক পরবর্তিকালের রচনা। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' রচনার পূর্বে সম্ভবতঃ এদের উদ্ভব হয়নি। যদি তা হ'ত তাহলে নাটিকার মত এতে এদেরও নামোল্লেখ থাকত। আসলে উপরূপক ক্ষুদ্র অথবা নিকৃষ্ট রূপক নয়; পরবর্তিকালের রূপক (Later dramas)। যখন উপরূপকগুলির উদ্ভব হয়, তখন রূপকের মধ্যে নাটক ও প্রকরণের বহুল প্রচলন ছিল এবং দর্শকসমাজে এদের বিশেষ সমাদর ছিল। নাটক ও প্রকরণের এই গৌরবময় যুগে অন্য কোনো ভিন্ন ধরণের দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হ'লে স্বভাবতই দর্শকগণ নাটক ও প্রকরণের সঙ্গে তুলনা ক'রে এর বিচার করতেন এবং সে বিচারে পরবর্তিকালের দৃশ্যকাব্যগুলির নিকৃষ্টতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'ত। একারণেই নাট্যকলাবিদ্‌গণ নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী ইত্যাদি দৃশ্যকাব্যগুলিকে নূতন একটি শ্রেণীতে ফেলে এই শ্রেণীর নাম দিয়েছিলেন 'উপরূপক'।

গুণের দিক থেকে বিচার করলে এই উপরূপকগুলিতে নাট্যরচনার উৎকৃষ্টতার পরিচয় হয়তো দুর্লভ কিন্তু শ্রেণীসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে সে যুগে ভারতবর্ষে নাট্যানুশীলন ও মঞ্চশিল্পসাধনার যে প্রচণ্ড একটি প্রয়াস ছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যে ষোলটি সংস্কৃত এবং দুটি (গোষ্ঠী ও সট্টক) প্রাকৃত ভাষায় রচিত। এদের অধিকাংশই শৃংগার প্রধান। এইসব উপরূপকের অনেকক্ষেত্রেই নাট্যশাস্ত্রের সাধারণ নীতি ও নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বরঙ্গ

নাট্যশিল্পের রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক নাটক শুরু হবে পূর্ববঙ্গ (preliminaries of play) দিয়ে। শ্রীহর্ষের মতে 'রঙ্গ' শব্দের অর্থ 'তৌর্যত্রিক' অর্থাৎ নৃত্য,গীত ও বাদ্য। এই মতানুসারে বলা যায় যে নৃত্য-গীত-বাদ্যময় অনুষ্ঠানই পূর্বরঙ্গ।[৭৬]

অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে পূর্বরঙ্গ একজাতীয় বিচিত্রানুষ্ঠান। নাটকের অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে রঙ্গমঞ্চে পূজা ও অন্যান্য অনেক কিছু অনুষ্ঠান করা হ'ত। মূল নাটকের সঙ্গে এই সব অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রঙ্গমঞ্চে প্রথম এইসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ত বলে এদের বলা হ'ত পূর্বরঙ্গ। 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে বিশ্বনাথ বলেছেন যে অভিনয় আরম্ভ করার পূর্বে রঙ্গমঞ্চের বিঘ্নশান্তির জন্য নটেরা যে মঙ্গলাচরণ করে, তাকেই বলে পূর্বরঙ্গ।[৭৭]

বিঘ্ননাশের উদ্দেশ্যে পূর্বরঙ্গের উদ্ভব হ'লেও পরবর্তিকালে নাট্যপ্রয়োগের পূর্বে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সামাজিকগণের মনোরঞ্জনই এর প্রধান উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে নাট্যাভিনয়ের পূর্বে অনুষ্ঠিত নৃত্য-বাদ্যময় পবিত্র, মাঙ্গলিক একটি অনুষ্ঠানের নাম পূর্বরঙ্গ। নাট্যরস উপলব্ধির উপযুক্ত একটি বিশুদ্ধ ও মনোজ্ঞ পরিবেশ তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য।

পূর্বরঙ্গের ১৯ (উনিশ)টি অঙ্গ। অবশ্য সাগর নন্দী, সারদাতনয় প্রমুখ ব্যক্তির মতে পূর্বরঙ্গের অঙ্গসংখ্যা বাইশ। সাগরনন্দী পূর্বরঙ্গের বাইটি অঙ্গ ব'লে নাম দিয়েছেন মাত্র দশটির এবং আলোচনা করেছেন মাত্র প্রয়োজনীয় তিনটির। এই দশটি নামের মধ্যে আবার তিনটি (মার্জনা, ব্রহ্মযোগ এবং দিগ্বন্দনা) নাট্যশাস্ত্র বহির্ভূত। নাট্যশাস্ত্রে আলোচিত উনিশটি অঙ্গের মধ্যে প্রথম নয়টির অনুষ্ঠান বিহিত হ'য়েছে যবনিকার অন্তরালে।[৭৮] আর অবশিষ্ট দশটির অনুষ্ঠান রঙ্গমঞ্চে দর্শকসম্মুখে।

নেপথ্যে অনুষ্ঠিত পূর্বরঙ্গের নয়টি অঙ্গ যথা – ১) প্রত্যাহার, ২) অবতরণ, ৩) আরম্ভ, ৪) আশ্রাবণা, ৫) বক্ত্রপাণি, ৬) পরিঘট্টনা, ৭) সংঘোটনা, ৮) মার্গাসারিত ও ৯) আসারিতক্রিয়া।

১। প্রত্যাহার — বাদ্যযন্ত্রের স্থাপন।

২। অবতরণ — গায়ক-গায়িকাদের উপস্থিতি ও উপবেশন।

৩। আরম্ভ — গীতকর্মের আরম্ভ।

৪। আশ্রাবণা — বাদ্যযন্ত্রে ঠাটবাঁধা।

৫। বক্ত্রপাণি — বিভিন্ন বাদনব্যাপারের মহড়া।

৬। পরিঘট্টনা — তারযন্ত্রে সুরবাঁধা।

৭। সংঘোটনা — তাল দেওয়ার জন্য হস্তচালনার মহড়া।

৮। মার্গাসারিত — তারযন্ত্র ও বাদ্যভাণ্ডের সহবাদন।

৯। আসারিত — তাল দেওয়া।

দর্শকের হৃদয়কে সংগীতের সুরে সংকীর্ণতামুক্ত, উদার ও সামাজিক ক'রে তোলাই এইসব অঙ্গের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। হৃদয়বীণার তন্ত্রীগুলি বিশুদ্ধ উদার রাগরাগিণীর সুরমূর্ছনায় প্লাবিত না হ'লে প্রেক্ষকের সাংসারিক মন কিভাবেই বা নাট্যরস উপলব্ধি করবে? তাই অভিনয়ের পূর্বে এই সংগীতাদির আয়োজন। আবার এমনও ভাবা যেতে পারে যে সেকালের দর্শকমণ্ডলী একালের মত এত সময়ানুবর্তী ছিল না। তাই প্রকৃত নাটক শুরু হবার আগে যাতে তারা সমবেত হ'তে পারে বা যারা আগেভাগে রঙ্গমঞ্চের ধারে – পাশে আসন গ্রহণ করেছে তারা যাতে বসে বসে বিরক্তিবোধ না করে সেজন্য পূর্বরঙ্গের নেপথ্য অংশের এই আয়োজন।

পূর্বরঙ্গের এই নবাংগ অনুষ্ঠানের পর যবণিকা উঠে যায়। তারপর মঞ্চে প্রবেশ করে নর্তক-নর্তকী, নান্দীপাঠকের দল। শুরু হয় নৃত্য, গীত, বন্দনা, আবৃত্তি।[৭৯] পূর্বরঙ্গের এই উত্তরাংশের দশটি অঙ্গ। যথা - ১) গীতবিধি বা গীতক, ২) উত্থাপন, ৩) পরিবর্তন বা পরিবর্ত, ৪) নান্দী, ৫) শুষ্কাবকৃষ্টা (ধ্রুবা), ৬) রঙ্গদ্বার, ৭) চারী, ৮) মহাচারী, ৯) ত্রিগত বা ত্রিক এবং ১০) প্ররোচনা।

১। গীতবিধি বা গীতক — দেবতাদের কীর্তি ও প্রশংসাসূচক গান।

২। উত্থাপন — নান্দীপাঠকগণ কর্তৃক রঙ্গমঞ্চে প্রথম কার্যারম্ভ।

৩। পরিবর্তন বা পরিবর্ত — 'পরিবর্তন' শব্দের অর্থ ইতস্তত সঞ্চরণ। এই অংশে সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে পরিক্রমা ক'রে বিভিন্ন লোকের অর্থাৎ ভুবনের অধিপতিগণের বন্দনা করেন।

৪। নান্দী — দেবতা, ব্রাহ্মণ ও রাজাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা।

৫। শুষ্কাবকৃষ্টা — 'অবকৃষ্টা' হ'ল একপ্রকার ধ্রুবা গান। যখন এই ধ্রুবাসংগীতের অক্ষরগুলি শুষ্ক অর্থাৎ অর্থহীন হয়, তখন এর নাম 'শুষ্কাবকৃষ্টা'। এটি 'জর্জর' যষ্টির প্রশস্তি সংগীত।

৬। রঙ্গদ্বার — বাচিক ও আংগিক অভিনয়ের প্রারম্ভ।

৭। চারী — শৃংগারদ্যোতক নৃত্য বা গতিভংগীবিশেষ।

৮। মহাচারী — রৌদ্ররসসূচক গতিবিধি বা নৃত্য।

৯। ত্রিগত বা ত্রিক — সূত্রধার, সহকারী নট ও বিদূষকের সংলাপ।

১০। প্ররোচনা[৮০] — প্রেক্ষকমণ্ডলীকে প্রশংসা ও সম্বোধন ক'রে যুক্তিতর্কসহ আলোচনার মধ্যে দিয়ে দৃশ্যকাব্যের বিষয়সূচনা।

এইসব অঙ্গ অনুষ্ঠান দেব-দানব-রাক্ষস প্রভৃতির তৃপ্তিসাধনের উপযোগী ব'লে বিশ্বাস করা হয়। যেমন – নান্দী, রঙ্গদ্বার ও চারী যথাক্রমে চন্দ্র, বিষ্ণু ও উমার প্রীতিজনক। এইভাবে যাবতীয় বিদ্যা, শিল্প, গতি, চেষ্টা, স্থাবর ও জঙ্গম ভূতরাশির স্বরূপ পূর্বরঙ্গে উপস্থাপন ক'রে সকল শ্রেণীর দর্শকদের মনোরঞ্জন করা হয়।[৮১]

সংক্ষেপে বলা যায় যে অভিনয় আরম্ভের পূর্বে বাদ্যযন্ত্রবিন্যাস, যন্ত্রে সুর বাঁধা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ থেকে আরম্ভ ক'রে মূল রূপকের পাত্র প্রবেশের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দেব-দ্বিজস্তুতি, নাচ-গান ইত্যাদি সবটাই পূর্বরঙ্গ।

ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের প্রথম দিকে পূর্বরঙ্গ নিশ্চয়ই একটা জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার ছিল। কিন্তু কালক্রমে পূর্বরঙ্গ সংক্ষিপ্ত ও সরল হ'য়ে পড়ে। ভরত কর্তৃক নির্দেশিত পূর্বরঙ্গ অত্যন্ত জটিল ব'লে তার অনেকগুলি অঙ্গই পরিত্যক্ত হ'য়েছে ব'লে মনে করা হয়। আমরা মনে করি যে দশম শতাব্দীর আগেই পূর্বরঙ্গ সংক্ষিপ্ত ও সরল হ'য়ে গিয়েছিল। আমাদের দেশের যাত্রার ইতিহাসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ যাত্রার মূল পালা আরম্ভ হওয়ার আগে এখন আর সেকালের মত অনেক্ষণ ধ'রে যন্ত্রবাদ্য, বন্দনা, সখীনৃত্য প্রভৃতি করা হয় না।

রূপক শুরু হওয়ার আগে নেপথ্যে ঐক্যতানবাদন ও কিঞ্চিৎ কন্ঠসংগীতের মহড়ার পর যবনিকা উঠলে দৃশ্যাংশের অভিনয় শুরু হয়। আরম্ভ হয় নাচ, গান, বাজনা ও আবৃত্তি। এই দৃশ্যাংশের উদ্‌ঘাটন হয় দেবতাবিষয়ক বন্দনা গান দিয়ে। এই গানই হ'ল গীতক, যা দৃশ্যাংশের প্রথম অঙ্গ। এরপর নান্দী-পাঠকগণের দ্বারা গীত হয় দুটি 'ধ্রুবা' – উত্থাপনী ও পরিবর্ত। এগুলি পূর্বরঙ্গের উত্তরাংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গ। এই 'ধ্রুবা' দুটি রঙ্গমঞ্চে ঘুরে ঘুরে গাওয়া হয়। বিঘ্ননাশের জন্য রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, শিব প্রমুখের বিগ্রহ বন্দনা করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই 'ধ্রুবা'গুলি গাওয়া হয়। এপ্রসংগে উল্লেখ্য যে নারদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যে জাতীয় গান গীত হয় তাই 'ধ্রুবা' নামে অভিহিত।[৮২] 'ধ্রুবা' এই নামে অভিহিত হয় কারণ এতে সব পদ, বর্ণ, অলংকার, লয়, জাতি ও পাণি ধ্রুবভাবেই পরস্পর যুক্ত থাকে।[৮৩]

এই পরিবর্ত আবার চারপ্রকার।[৮৪] প্রথম পরিবর্তে নট-নটীগণ লোকপাল মূর্তিগুলিকে প্রদক্ষিণ ও পরিবেষ্টন করে। তারপর সূত্রধার শুচিশুভ্র বেশে পুষ্পাঞ্জলি হাতে মঞ্চে প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে থাকেন দুজন পারিপার্শ্বিক। একজনের হাতে থাকে ভৃঙ্গার এবং অপরজনের হাতে থাকে জর্জরযষ্টি। তাঁরা সাবলীল পদবিক্ষেপে ব্রহ্মার দিকে অগ্রসর হন এবং ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ক'রে বন্দনা করেন। সূত্রধারের প্রবেশ থেকে ব্রহ্মাবন্দনা পর্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটি দ্বিতীয় পরিবর্ত। তারপর সূত্রধার মণ্ডপ প্রদক্ষিণ ক'রে তাঁর ভৃঙ্গবাহী সঙ্গীকে আহ্বান করেন ও ভৃঙ্গারের জলে আচমনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন ক'রে গ্রহণ করেন জর্জরযষ্টি। মণ্ডপ প্রদক্ষিণ থেকে জর্জরযষ্টি গ্রহণ পর্যন্ত যে অনুষ্ঠান তাই হ'ল তৃতীয় পরিবর্ত। এক্ষেত্রে জর্জরধারী সূত্রধার অনুচরদের সঙ্গে বাদ্যস্থানের দিকে অগ্রসহ হন এবং নৃত্য-গীত ও বাদ্যসহ দিক্‌পালগণের বন্দনা করেন ও জর্জরপূজা করেন। এর পরেই পঠিত হয় নান্দী।

নান্দী ও রঙ্গদ্বার —

'নান্দী' হ'ল 'পূবরঙ্গের'র দৃশ্যাংশের চতুর্থ অঙ্গ। 'নান্দী'শব্দটির উৎস ও ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা যায় যে নন্দ শব্দের উত্তর 'প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ' সূত্রানুসারে স্বার্থে 'অণ্' প্রত্যয় ও স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈপ্' প্রত্যয় ক'রে নান্দী শব্দটি গঠিত। শব্দটির অর্থ আহ্লাদদায়িনী।

নাট্যশাস্ত্রে নান্দীর সংজ্ঞায় বলা হ'য়েছে যে(পূর্বরঙ্গের এই অঙ্গে) দেবতা, ব্রাহ্মণ ও রাজগণের আশীর্বাদযুক্ত বাক্য সর্বদা প্রযুক্ত হয়, সেজন্য এর নামকরণ হ'য়েছে নান্দী।[৮৫] আচার্য বিশ্বনাথ নান্দীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ব'লেছেন যে নান্দী হ'ল সেই মঙ্গলজনক শ্লোক যা দেবতা, রাজা অথবা ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করার জন্য লিখিত এবং সেখানে শঙ্খ, পদ্ম, চন্দ্র, পুণ্ডরীক এবং রক্তিম হংসের উল্লেখ থাকে।[৮৬]

'নান্দী' শ্লোকে ব্যবহৃত 'পদ' শব্দটি ত্রিবিধ অর্থবোধক। যথা – ১) সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দ (words) ২) শ্লোকের চরণ (foot of a verse) এবং ৩) অবান্তর বাক্য (clauses)[৮৭]

সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দের অর্থবোধক অষ্টপদা ও দ্বাদশপদা নান্দীর উদাহরণ যথাক্রমে ভাসরচিত ''স্বপ্নবাসবদত্তম্'' ও 'প্রতিমানাটকম্' নাটকের শ্লোক দুটি।[৮৮] শ্লোকের চরণ বোঝাচ্ছে এমন নান্দী শ্লোকের উদাহরণ ভবভূতির 'মালতীমাধব'এর মাংগলিক শ্লোক দুটি। এখানে আটটি চরণ অর্থাৎ দুটি শ্লোক আছে। সুতরাং এই শ্লোকদুটি অষ্টপদা নান্দী।[৮৯] আর দ্বাদশপদা বা বারোটি চরণ অর্থাৎ তিনটি শ্লোকবিশিষ্ট নান্দীর উদাহরণ ভট্টনারায়ণের লেখা 'বেণীসংহার' নাটকের প্রারম্ভিক তিনটি শ্লোক। এছাড়া অবান্তর বাক্যবোধক অষ্টপদা নান্দীশ্লোকের উদাহরণ প্রসঙ্গে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোকটির উল্লেখ করা যেতে পারে।[৯০]

রঙ্গদ্বারে অভিনয় আরব্ধ বা অবতারিত হয়। সেজন্যই এর নাম রঙ্গদ্বার। এতে বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয় থাকে।[৯১] যেহেতু রঙ্গালয়ে নটেরা স্তুতিবাক্যদ্বারা অথবা হাতজোড় ক'রে, মাথা নত ক'রে ইত্যাদি অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অভিনয়ের প্রথম অবতারণা করে, তাই অভিনয়ের সেই প্রথম অবস্থা রঙ্গদ্বার নামে খ্যাত। এই নাটকীয় অংশ থেকেই প্রথম অভিনয় আরম্ভ হয় বলে অভিনয়ের দ্বার বা মুখ বা প্রারম্ভ হিসাবে এর নাম হ'য়েছে রঙ্গদ্বার। ঐ নমস্কার বা স্তুতিপাঠ ইত্যাদি অভিনয়েরই অঙ্গ।

আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বলেন যে রঙ্গদ্বার চারটি শ্লোকের সমষ্টি। প্রথম শ্লোকে সেই দেবতার স্তব করা হয় যাঁর পূজা উপলক্ষে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। 'নান্দী' পাঠের পর যথাবিধি শুষ্কাপকৃষ্টা ক'রে গম্ভীরস্বরে সেই দেবস্তোত্র পঠিত হয়। এরপর পঠিত হয় দ্বিতীয় শ্লোক, যে শ্লোকে রাজার প্রতি ভক্তি অথবা ব্রাহ্মণের স্তব থাকে। অবশেষে 'জর্জরপূজা' বিষয়ক আরও দুটি শ্লোক পঠিত হয়।[৯২]

নান্দী ও রঙ্গদ্বারের আলোচনাকে কেন্দ্র ক'রে অলংকারশাস্ত্রে বিতর্ক সৃষ্টি হ'য়েছে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ এবং অন্যান্য বিরূদ্ধবাদিগণ নাটকের মাঙ্গলিক শ্লোকটিকে নান্দী না ব'লে রঙ্গদ্বার বলেছেন। আচার্য বিশ্বনাথ মনে করেন যে রঙ্গদ্বার থেকেই নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। তাই নান্দী নাটকের অঙ্গ নয়, নাটক অভিনীত হবার আগেই এটি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এটিও প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে পূর্বরঙ্গে 'নান্দী' নট-নটীগণের কর্তব্য। তাই নাট্যশাস্ত্রকার একে কবিকর্তব্য ব'লে নির্দেশ দেন নি।

এতদ্ব্যতীত নান্দী দিয়ে যে নাটক শুরু হয় না তা প্রমাণ করার জন্য বিরুদ্ধবাদীরা ভাসের নাটকগুলির কথা বলেন। এই নাটকগুলিতে স্পষ্ট নির্দেশই আছে যে ''নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।'' এই

নির্দেশের পর থাকে আশীর্বচন বা মাঙ্গলিক শ্লোক। অর্থাৎ নাট্যাভিনয় শুরু হবার আগেই 'নান্দী' অনুষ্ঠিত হয়। নান্দী শেষ হবার পর নাট্যপরিচালনার জন্য সূত্রধার পুনরায় প্রবেশ করেন এবং নাটকের মাঙ্গলিক শ্লোক আবৃত্তি করেন। সুতরাং এই আশীর্বচন রঙ্গদ্বার হ'তেও পারে আবার নাও হ'তে পারে। কিন্তু এটি যে নান্দী নয় ভাসের রচনারীতি থেকে তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু নাটকের যে আশীর্বচন তা ঠিক রঙ্গদ্বার নয়। কারণ এতে জর্জরপ্রশস্তি থাকে না এবং এর শ্লোকসংখ্যাও রঙ্গদ্বারের মত নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং নাটকের পূর্বরঙ্গে নান্দীর পরিবর্তে 'রঙ্গদ্বার'ই অবশ্যকরণীয় – এই অভিমতকে আমরা অভ্রান্ত ব'লে মেনে নিতে পারি না।

নান্দী ও রঙ্গদ্বারের বিতর্ক প্রসংগে প্রসিদ্ধ টীকাকার রামচন্দ্র তর্কবাগীশের মতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে "যেখানে লক্ষ্যে অষ্টপদা ও দ্বাদশপদা 'নান্দী'র লক্ষণসংগতি হয়, সেখানে উহা 'নান্দী' ও 'রঙ্গদ্বার' দুইই। যেখানে নান্দীর লক্ষণসংগতি হয় না সেখানে উহা 'রঙ্গদ্বার'। যেখানে লক্ষ্যে যে পর্যন্ত 'নান্দী'র লক্ষণ মিলে, সে পর্যন্ত 'নান্দী', অবশিষ্ট অংশটুকু 'রঙ্গদ্বার'। যেমন নাটকে যদি চারটি আশীর্বচন শ্লোক থাকে, তবে সেখানে তিনটি শ্লোক পর্যন্ত 'দ্বাদশপদা নান্দী' এবং চতুর্থ শ্লোকটি হইবে 'রঙ্গদ্বার'। শুধু তাহাই নয়, তিনি নান্দীর সমর্থনে ইহাও বলেন যে, 'নান্দী'র অষ্টপদত্ব অধিকপদত্বেরই 'উপলক্ষণ' অর্থাৎ সূচক। অতএব 'আট' এর অধিক পদ থাকিলে নান্দীত্বে কোন ব্যাঘাত হয় না এবং এই ব্যাপক ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি 'মহানাটকে' তেরটি শ্লোক সত্ত্বেও 'নান্দীত্ব' সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন - - এবঞ্চাষ্টাভিরিতি তদধিকোপলক্ষণত্বেন শ্লোকত্রয়েণাপি নান্দী সংগচ্ছতে। অতএব মহানাটকে এ্যধিকৈঃ শ্লৌকের্নান্দী কৃতা।" – ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক — ডঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় - পৃঃ ২০২।

রামচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে নাটকীয় আশীর্বচনের নান্দী সংজ্ঞা নিশ্চয়ই বহুলপ্রচারিত ও বহুজনসম্মত ছিল। সেজন্যই তিনি সাহিত্যদর্পণের পরিবর্তিকালের একজন আধুনিক আলংকারিক হ'য়েও 'নান্দী'র অনুকূলে এমন উদার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আচার্য বিশ্বনাথ প্রমুখ আলংকারিকগণ নান্দীর বিপক্ষে মতপ্রকাশ করলেও নাটকের আশীর্বচন শ্লোকটি চিরকাল নান্দীশ্লোক নামেই পরিচিত হ'য়ে আসছে। নাট্যসাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনা, টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি প্রায় সব জায়গাতেই নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোকটিকে 'নান্দী' বলা হ'য়েছে। এসব ক্ষেত্রে রঙ্গদ্বার বলা হয়নি। নাটকের মঙ্গলাচরণকে 'নান্দী' নামে অভিহিত করা যেন একপ্রকার রেওয়াজ

বা রীতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আর রীতি বা ঐতিহ্যকে যদি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে নাটকের আশীর্বচন বা মাঙ্গলিক শ্লোককে নান্দী ব'লে মেনে নিলে এমন কিছু ভুল হবে না।

এপ্রসঙ্গে নাট্যকলা অভিনয়ের প্রসঙ্গটি আর এববার স্মরণ করা যেতে পারে। মহর্ষি ভরত ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হ'য়ে নাট্যকলার প্রয়োগ সম্পর্কে আদেশ চাইলেন। ব্রহ্মা তাঁকে ইন্দ্রমহোৎসবে উপস্থিত হ'য়ে দেবতাদের বিজয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত "দেবাসুরসংগ্রাম" অভিনয় করতে আদেশ দিলেন। দেবতাদের সন্তোষ বিধানের জন্য অভিনয়ের প্রারম্ভেই অষ্টাংগপদযুক্ত নান্দী পাঠ করলেন। এই উপলক্ষেই মহর্ষি ভরত বললেন যে নান্দীপাঠের পরেই নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়।[৯৩] এই নাটক যখন আরম্ভ হয় তখন রঙ্গমঞ্চে কোনো বিঘ্ন ছিল না। অভিনয় আরম্ভ হবার পরেই বিঘ্ন শুরু হয়। তাই বিঘ্ননাশের উদ্দেশ্য নিয়েই রঙ্গমঞ্চে দেবতার প্রতিষ্ঠা ও পূর্বরঙ্গের উদ্ভব হয়। অতএব বলা যেতে পারে যে রঙ্গমঞ্চে বিঘ্ন থাকলে পূর্বরঙ্গের প্রয়োজন হয়। আর বিঘ্ন না থাকলেও যে কোনো শুভকর্মের প্রথমে নান্দী অবশ্য করণীয়।

শুষ্কাবকৃষ্টা — 'শুষ্ক' শব্দের অর্থ 'অর্থহীন', আর 'অবকৃষ্টা' একপ্রকার ধ্রুবাগান। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠানের মধ্যে পাঁচপ্রকার ধ্রুবাসংগীত গীত হয়। যখন এই ধ্রুবাসংগীতের অক্ষরগুলি শুষ্ক বা অর্থহীন হয় তখন এর নাম 'শুষ্কাবকৃষ্টা'। এটি জর্জর শ্লোকসূচক।[৯৪] এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বলা হ'য়েছে যে প্রথমে নয়টি অক্ষর গুরু, পরে ছয়টি লঘু, তারপর তিনটি গুরু, আটটি কলা, আঠারো অক্ষরযুক্ত পাদসমূহে এই শুষ্কাবকৃষ্টা রচিত হবে।[৯৫] নাট্যশাস্ত্রে প্রদত্ত উদাহরণটি এখানে উল্লেখ করা হ'ল।[৯৬]

চারী ও মহাচারী — চারী হ'ল শৃংগারদ্যোতক নৃত্য বা গতিভঙ্গী বিশেষ। আর মহাচারী হ'ল রৌদ্ররসসূচক নৃত্য বা গতিবিধি। নাট্যশাস্ত্রকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে শৃংগাররসদ্যোতক গতির জন্য চারী এবং রৌদ্ররসদ্যোতক গতির জন্য মহাচারী নামে কথিত হয়।[৯৭]

ত্রিগত — সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ সহকারী নট ও বিদূষক – এই তিন জনের সংলাপকে ত্রিগত বলা হয়।[৯৮] এই অঙ্গে সহসা বিদূষক প্রবেশ ক'রে এমন ভাষায় আলাপ করে যা বহুলাংশে অসংলগ্ন এবং যা সূত্রধারের হাস্যোদ্দীপক। এই আলাপের মধ্যে সহসা কোনো বিতর্কমূলক বিষয় অথবা রহস্যময় মন্তব্য এবং 'কে আছে', 'কে জয় করেছে' – এধরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং এরই মধ্যে দিয়ে কাব্যের

বিষয়বস্তু সূচিত হয়।

প্ররোচনা — প্রসিদ্ধ অর্থকে যে উপস্থাপিত করে তাকেই প্ররোচনা বলা হয়।[৯৯] আবার কেউ কেউ মতপ্রকাশ করেন যে সংঘটিত কাহিনীর উল্লেখের দ্বারা প্রস্তুত কাব্যকে যে উপস্থাপিত করা হয় তাই প্ররোচনা।[১০০] আচার্য ভরত এ প্রসঙ্গে বলেন যে কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যুক্তিতর্কদ্বারা যে আবেদন নাট্যক্রিয়া সূচিত করে তা প্ররোচনা নামে অভিহিত হয়।[১০১] সোজা কথায় বলা যায় যে প্রেক্ষকমণ্ডলীকে যে কোনো প্রকারে নাটকদর্শনে উন্মুখ করার নামই প্ররোচনা। সূত্রধার এতে প্রেক্ষকমণ্ডলীকে আহ্বান করেন এবং তাদের প্রশংসা করেন। অভিনয়বিষয়ের সাফল্যের জন্য পুনরায় এতে বিষয়বস্তু সূচিত হয়। সূত্রধার সকল বিধি অনুসরণ ক'রে 'সূচীবেধ' রূপ চারী নৃত্য করেন এবং আবিদ্ধ ব্যতীত যে কোনো চারী নৃত্য করতে করতে একসঙ্গে সকলে বেরিয়ে যান।[১০২] এই নিষ্ক্রমনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

তারপর হয় সূত্রধার নয় সূত্রধারের মত গুণবিশিষ্ট অন্য কোনো প্রধান নট রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন।[১০৩] ইনিই স্থাপক। তিনি কাব্যের অর্থ অনুসারে নির্দোষ ও মধুরবাক্যে রচিত নানাপ্রকার রস ও ভাবসম্বলিত শ্লোকের দ্বারা নিয়ম অনুসারে রঙ্গালয়ের দর্শকগণকে প্রসন্ন করেন এবং কবির নাম কীর্তন করেন। রূপকের বিষয়বস্তু দেব সম্পর্কিত হ'লে দিব্য, মনুষ্য সম্পর্কিত হ'লে মানুষের অনুরূপ এবং দিব্য মানুষ সম্পর্কিত হ'লে দিব্য অথবা মানুষের অনুরূপ বিষয় অবলম্বন ক'রে তিনি প্রস্তাবনা করবেন।[১০৪]

কাব্যের বিষয়বস্তু স্থাপন করেন বলেই এই নটের নাম স্থাপক।[১০৫] আসলে পূর্বরঙ্গ সম্পাদন ক'রে সূত্রধার রঙ্গস্থান থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তারপর রঙ্গস্থানে প্রবেশ করেন স্থাপক। বিশ্বনাথের সময় সূত্রধারই স্থাপকের কর্তব্য ক'তে দিতেন। কারণ তখন পূর্বরঙ্গের সব অনুষ্ঠান হ'ত না। কেবল নান্দী ও রঙ্গদ্বারের অনুষ্ঠান হ'ত। এজন্যই কোনো কোনো নাটকে "নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ" – এর পরিবর্তে "নান্দ্যন্তে স্থাপকঃ" এরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সেজন্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যেখানে যেখানে স্থাপক শব্দের উল্লেখ আছে, অভিনবগুপ্ত তার অর্থ ক'রেছেন 'সূত্রধার'। – "সূত্রধার এব স্থাপকঃ।"

বৃত্তি

নাট্যদর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য সূত্রধার এবং নটীর উপভোগ্য কথাবার্তার মাধ্যমে নাটকের ভূমিকা বা প্রস্তাবনা করা হয়। ভূমিকা অংশে স্থাপক (অভিনেতা) এবং নটী (অভিনেত্রী)র কথোপকথন শুরু হ'য়ে যায়। আবার কখনও একজন হাস্যরসিক বা বিদূষক এই কথাবার্তার মধ্যে অংশগ্রহণ করে। তখন তাকে বলা হয় পারিপার্শ্বিক। কথোপকথনের সময় অভিনেতাগণ "ভারতীবৃত্তিতে" কথাবার্তা বলে।[১০৬] কিন্তু অভিনেত্রীগণ কথা বলেন প্রাকৃতভাষায়।

স্বাভাবিক কারণে প্রশ্ন জাগতে পারে বৃত্তি কি ? 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাটকীয় ঘটনাকে আমরা ঘটতে দেখি। অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকের মুখ্য ফল লাভের জন্য পাত্র-পাত্রীর যে প্রযত্ন তা প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রযত্নে আমরা প্রত্যক্ষ করি পাত্র-পাত্রীর বেশভূষা, তাদের হাবভাব-বিলাস-বিক্রিয়া। এই প্রযত্নকালেই আমরা তাদের বিচিত্র সংলাপ শুনি। সমগ্র অভিনয় ব্যাপারের এই যে সামগ্রিক সাবলীল রূপ, এই যে বহিরঙ্গ প্রকাশ এরই নাম বৃত্তি। একে বলা যায় নাটকের স্টাইল। এপ্রসঙ্গে সাগরনন্দী তাঁর "নাটকলক্ষণরত্নকোশ" নামক গ্রন্থে বলেছেন যে বেশ-ভূষা, গীত, বাদ্য, রস এবং ভাবের অভিনয় এবং নৃত্য – এই সকলের কোনো এক বিশেষ প্রকারের ব্যবহারকেই বলা হয় বৃত্তি। অথবা বিলাস বিন্যাসের ক্রমই বৃত্তি।[১০৭]

বৃত্তি চারপ্রকার। যথা – ১) ভারতী ২) সাত্ত্বতী ৩) কৌশিকী এবং আরভটী। নাট্যগুরু ভরতের মতে বেদচতুষ্টয় থেকেই বৃত্তিচতুষ্টয়ের উদ্ভব। ঋগ্বেদ থেকে 'ভারতী', যজুর্বেদ থেকে 'সাত্ত্বতী', সামবেদ থেকে 'কৈশিকী' এবং অথর্ববেদ থেকে 'আরভটী' বৃত্তির উৎপত্তি।[১০৮]

ভারতীবৃত্তি — যাতে বাক্য প্রধান, যা পুরুষকর্তৃক প্রযোজ্য, স্ত্রীলোকবিহীন, সংস্কৃতপাঠ্যযুক্ত এবং স্বনামযুক্ত ভরত অর্থাৎ নট বা নর্তক কর্তৃক প্রযুক্ত তা ভারতী বৃত্তি নামে উক্ত হয়।[১০৯] বাচনিক বৃত্তির প্রাধান্যের উপর ভিত্তি করেই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ের মূলতঃ পার্থক্য করা হয়। নাট্যাভিনয়ে বচন বা বাক্যই প্রধান। সেজন্য ভরত বা নটের নামানুসারে এই বৃত্তির নামকরণ করা হ'য়েছে ভারতীবৃত্তি।

সাহিত্যদর্পণকার ভারতীবৃত্তি সম্পর্কে একটু অন্যভাবে বলেছেন যে ভারতীবৃত্তি সংস্কৃতপ্রধান ও বাক্যপ্রধান নটাশ্রিত এক ব্যাপার।[১১০] এই বৃত্তি বাক্‌প্রধান বা বাচিক অভিনয়প্রধান। অর্থাৎ এখানে

আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের ব্যাপারও কিছু থাকে। আরও বলা হ'ল যে এই বৃত্তি "সংস্কৃতপ্রায়ঃ" অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার শব্দ বাহুল্য এখানে থাকবে। সুতরাং এই বৃত্তি একেবারে প্রাকৃতভাষাবর্জিত নয়। ধনঞ্জয়ের "দশরূপকে" এই শ্লোকের একটু পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। সেখানে "নরাশ্রয়ঃ" – এর স্থলে "নটাশ্রয়ঃ" এই প্রকার পাঠ দেখা যায়।[১১১]

ভারতীবৃত্তির চারটি অঙ্গ। যথা ১) প্ররোচনা (Laudation), ২) বীথী (Avenue), ৩) প্রহসন (Humour) এবং ৪) আমুখ (Insertion)[১২২] বা প্রস্তাবনা।

কবি কাব্য এবং দর্শকদের প্রশংসার দ্বারা শ্রোতার মনকে নাট্যদর্শনে প্ররোচিত করেন বলেই এই অংশকে প্ররোচনা বলা হয়।[১১৩] প্ররোচনা স্থাপক বা উপস্থাপককে মনোরম পরিবেশ রচনায় সহায়তা করে।

ভারতীবৃত্তির দ্বিতীয় অঙ্গ হ'ল বীথী বা পথ এবং তৃতীয় অঙ্গ হ'ল প্রহসন। বীথী ও প্রহসন – এ দুটি দশপ্রকার রূপকের দুটি ভেদ। এই দুটির (বীথী ও প্রহসন এর) স্বরূপ রূপকের ভেদ ও তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে ব্যাখ্যাত হ'য়েছে। তাই এদুটির আলোচনা এখানে বিস্তৃত করা হ'ল না। ভারতীবৃত্তির চতুর্থ অঙ্গ আমুখ বা প্রস্তাবনা।

প্রস্তাবনা — প্রস্তাবনা সংস্কৃত রূপকের এক অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ "কুসুমপ্রতিমা" টীকায় প্রস্তাবনা শব্দটির অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন — "প্রস্তাবয়তি প্রকৃতবিষয়মুখাপয়তীতি ব্যুত্পত্তেঃ।' এর অপর নাম আমুখ। সাহিত্যদর্পণের টীকাকার এ প্রসঙ্গে বলেন 'প্রকৃতাভিনয়স্য মুখে আদ্যে কর্ত্তব্যাদিতি ভাবঃ।' একমাত্র হনুমৎ প্রনীত 'মহানাটক' ছাড়া সর্বত্রই এই প্রস্তাবনা দেখা যায়।

পারিভাষিক অর্থে 'প্রস্তাবনা' বলতে নাটকীয় ভূমিকার সেই অংশটুকুকেই বোঝায় যেখানে প্রকৃত নাট্যবস্তুর সূচনা হয়। সুতরাং মাঙ্গলিক শ্লোক, কবি ও কাব্যের পরিচয় ও প্রশংসাকীর্তন এবং কোনো ঋতুর বর্ণনা – এইসব বিষয়গুলি ঠিক প্রস্তাবনার অঙ্গ বা অংশ নয়। সূত্রধার যেখানে সহকারী নটনটীগণের সঙ্গে নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে করতে বিচিত্র মধুর বাক্যে হঠাৎ অদ্ভূত কৌশলে নাটকীয় বিষয়ের সূচনা করেন তাকেই বলে আমুখ। এরই আর এক নাম প্রস্তাবনা।[১১৪]

প্রধানতঃ প্রস্তাবনার তিনটি উদ্দেশ্য। যথা ১) সভাপূজা অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সামাজিকগণের স্তুতি, ২) নট-নটী, নাটক ও নাট্যকারের পরিচয় ও প্রশংসা এবং ৩) পাত্রপ্রবেশ। তৃতীয় অংশটিই প্রস্তাবনার প্রধান অংশ। বস্তুত এর জন্যই প্রস্তাবনার উদ্ভব। সংস্কৃত রূপকের প্রায় সর্বত্রই প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ দৃষ্ট হয়। অবশ্য ভাসের রূপকগুলি এর ব্যতিক্রম।

আধুনিক কোনো ভাষার কোনো নাটকেই প্রায় আর প্রস্তাবনা থাকে না। এর প্রয়োজনও হয় না। কারণ বর্তমানে প্রস্তাবনার কাজ করে প্রোগ্রাম, পূর্বাভাষ সম্বলিত পুস্তিকা, সংবাদপত্র এবং মাইক। পূর্বে প্রস্তাবনার যে উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমানে উক্ত চারটি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

সংস্কৃত রূপকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল এর চমকপ্রদ আরম্ভ। এর চমকপ্রদ পরিসমাপ্তি না থাকলেও চমকপ্রদ আরম্ভ অবশ্যই প্রেক্ষক তথা পাঠকদের মনে এক বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে। অতি চমকপ্রদভাবেই সংস্কৃত রূপকে পাত্র-প্রবেশ ঘটে। এই পাত্রপ্রবেশ অংশই হ'ল যথার্থ প্রস্তাবনা। গ্রন্থরূপে যে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যকে আমরা পাই তার ভূমিকা বা গৌরচন্দ্রিকাকে যদি তিনটি মূল অঙ্গে আমরা ভাগ করি তাহলে তার প্রথম অঙ্গটি হ'ল 'নান্দী', দ্বিতীয় অঙ্গটি 'প্ররোচনা' এবং তৃতীয় অঙ্গটি 'প্রস্তাবনা'। এর পরই প্রকৃত নাটক আরম্ভ হয়।

প্রস্তাবনার পাঁচটি ভেদ। যথা — ১) উদ্‌ঘাত্যক, ২) কথোদ্‌ঘাত, ৩) প্রয়োগাতিশয়, ৪) প্রবর্তক এবং ৫) অবলগিত।[১১৫] অবশ্য দশরূপককার ধনঞ্জয়ের মতে প্রস্তাবনা বা আমুখ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত।যথা – কথোদ্‌ঘাত, প্রবৃত্তক ও প্রয়োগাতিশয়। আর উদ্‌ঘাত্যক এবং অবলগিত — এ দুটিকে তিনি বীথ্যঙ্গ রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে "বীথ্যঙ্গানি ত্রয়োদশ।" এই তেরোটি বীথ্যঙ্গ হ'ল – ১) উদ্‌ঘাত্যক, ২) অবলগিত, ৩) প্রপঞ্চ, ৪) ত্রিগত, ৫) ছল, ৬) বাক্‌কেলি, ৭) অধিবল, ৮) গণ্ড, ৯) অবস্যন্দিত, ১০) নালিকা, ১১) অসৎপ্রলাপ, ১২) ব্যাহার এবং ১৩) মৃদব।

উদ্‌ঘাত্যক — পাঁচপ্রকার প্রস্তাবনার মধ্যে প্রথম হ'ল উদ্‌ঘাত্যক। উদ্ – হন্ + ঘ্যণ্ + স্বার্থে ক প্রত্যয় ক'রে উদ্‌ঘাতক শব্দটি গঠিত হ'য়েছে। যেখানে সূত্রধার পঠিত বাক্য শুনে, বাক্যটির একাধিক অর্থ থাকার জন্য, নাটকীয় পাত্র সূত্রধার অভিপ্রেত অর্থে বাক্যটিকে না বুঝে আপন অভিপ্রেত অর্থে গ্রহন করে এবং সেই অনুসারে সূত্রধারের বাক্যের সঙ্গে নিজের অভিপ্রায়বোধক পদ যোজন ক'রে প্রবেশ করে সেখানে 'উদ্‌ঘাত্যক' প্রস্তাবনা হয়।[১১৬] আচার্য বিশ্বনাথ প্রায় একইরকমভাবে বললেন যে প্রবেশকারী

পাত্রগণ যখন অনিশ্চিৎ অর্থযুক্ত পদসমূহকে অর্থবোধের জন্য অন্য পদসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত করেন তখন বলা হয় যে উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনা হ'য়েছে।[১১৭]

সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনার উদাহরণটি 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক থেকে দেওয়া হ'য়েছে। সূত্রধার বললেন — ক্রূরগ্রহ কেতু (অর্থাৎ রাহু) এখন পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে সবলে গ্রাস করতে ইচ্ছা করছে। এরপর নেপথ্যে – আঃ! আমি জীবিত থাকতে কে চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করতে ইচ্ছা করছে ?[১১৮]

চাণক্য সূত্রধারের বাক্য শুনে তাকে ভিন্নপ্রকার অর্থে পরিবর্তিত করলেন। চাণক্য ক্রূরগ্রহ্ শব্দের অর্থ বুঝলেন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি, কেতু শব্দের অর্থ বুঝলেন – মলয়কেতু, চন্দ্রমস শব্দের অর্থ বুঝলেন চন্দ্রগুপ্ত। নামের একটা অংশ বললেই সমস্ত নামকে বোঝানো হয়। আশুতোষ বোঝাতে আশু শব্দ ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রেও তেমনি চন্দ্রমস্ পদের দ্বারা চন্দ্রগুপ্তকে বুঝেছে চাণক্য। পূর্ণিমায় চন্দ্রমণ্ডল পূর্ণ না হ'লে রাহু তাকে গ্রাস করে না। তেমনি অসম্পূর্ণমণ্ডল (রাজ্যবিজয় সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত) চন্দ্রগুপ্তকে কেউ গ্রাস করতে পারে না।অতএব সূত্রধারের কথাকে, সর্বদা চন্দ্রগুপ্তের মঙ্গলচিন্তায় নিরত চাণক্য, ভিন্ন অর্থে যোজনা ক'রে বললেন — 'আমি জীবিত থাকতে কোন্ ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করতে ইচ্ছা করছে?' এর পরেই চাণক্য প্রবেশ করলেন মঞ্চে। এভাবেই সূত্রধারের বক্তব্যকে ভিন্ন অর্থে যোজনা ক'রে এখানে পাত্রপ্রবেশ ঘটেছে।

কথোদ্‌ঘাত — সূত্রধারের বাক্য বা তার অর্থ গ্রহণ ক'রে পাত্র প্রবেশ হ'লে তাকে বলে কথোদ্‌ঘাত প্রস্তাবনা।[১১৯] নাট্যশাস্ত্রকারও অনুরূপভাবে বললেন যে, যে প্রস্তাবনায় সূত্রধারের বাক্য অবিকল আবৃত্তি করতে করতে অথবা সূত্রধার অভিপ্রেত বাক্যের অর্থ উপলব্ধি ক'রে সেইরূপ মন্তব্য করতে করতে পাত্র-প্রবেশ হয় তা কথোদ্‌ঘাত।[১২০]

শ্রীহর্ষরচিত "রত্নাবলী" নাটিকায় সূত্রধারের বাক্য গ্রহণ ক'রে পাত্রপ্রবেশ ঘটেছে। সূত্রধার পঠিত 'দ্বীপাদন্যস্মাদপি' শ্লোকটি নেপথ্যে শুনে সেটি আবৃত্তি করতে করতে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ন মঞ্চে প্রবেশ করেন। এক্ষেত্রে সূত্রধারের বাক্য গ্রহণ ক'রে পাত্র প্রবেশ ঘটেছে ব'লে কথোদ্‌ঘাত প্রস্তাবনা হ'য়েছে।[১২১]

আবার 'বেণীসংহার' নাটকে সূত্রধারের দ্বারা উচ্চারিত বাক্যের অর্থ গ্রহণ ক'রে মঞ্চে পাত্রপ্রবেশ ঘটেছে। সূত্রধারের দ্বারা উচ্চারিত শ্লোকটি এখানে শ্লেষাত্মক।[১২২] সূত্রধার এখানে যে শ্লোকটি প'ড়েছে

তার অর্থ হ'ল – ''শত্রুগণের শান্ত স্বভাব গ্রহণবশতঃ যাঁদের বৈরাগ্নি নির্বাপিত হ'য়েছে সেই পাণ্ডুপুত্রগণ কৃষ্ণের সঙ্গে আনন্দ করতে থাকুন। অনুরাগসহকারে যারা পৃথিবীকে আয়ত্ত করেছেন সেই কুরুরাজপুত্রগণ ভৃত্যবর্গের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ ক'রে সুস্থ হোন।''

কিন্তু নাট্যবিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এর একটি ভিন্ন অর্থও আছে। সেই অর্থটি হ'ল শত্রুতা শান্ত হওয়ার জন্য যাঁদের শত্রুতার আগুন নির্বাপিত হ'য়েছে সেই পাণ্ডুপুত্রগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আনন্দলাভ করুন। যে কৌরবদের শরীর যুদ্ধের ফলে ক্ষতবিক্ষত হ'য়েছে এবং যাঁরা পৃথিবীকে রক্তে রঞ্জিত ক'রেছে তাঁরা সপরিজন স্বর্গে গমন করুন।

শ্লোকের 'রক্তপ্রসাধিতভুবঃ' এবং 'ক্ষতবিগ্রহাশ্চ' শব্দ দুটি দ্ব্যর্থবোধক। শ্লোকের প্রথম অর্থটি সূত্রধারের ঈপ্সিত অর্থ। দ্বিতীয় অর্থটি নাট্যকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সূত্রধারের দ্বারা পঠিত শ্লোকের প্রথম অংশ গ্রহণ ক'রে নেপথ্য থেকে ভীমসেন ব'লে উঠলেন – ''আঃ দুরাত্মন্'' ইত্যাদি বাক্য, যার অর্থ হ'ল ''আমি জীবিত থাকতে কিরূপে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সুস্থ থাকবে?'' এরপর সূত্রধার প্রস্থান করলে ''লাক্ষাগৃহানল' ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে ভীম মঞ্চে প্রবেশ করলেন। এখানে সূত্রধারের বাক্যার্থ গ্রহণ ক'রে মঞ্চে ভীমসেনের প্রবেশ ঘটায় এটি দ্বিতীয় প্রকারের কথোদ্‌ঘাত।

প্রয়োগাতিশয় — প্রস্তাবনার তৃতীয় ভেদ হ'ল প্রয়োগাতিশয়। একটি প্রসংগ প্রযুক্ত হওয়ার সময় অন্য প্রসংগের প্রয়োগ ক'রে পাত্র প্রবেশ করলে প্রয়োগাতিশয় হয়।[১২৩] এই আমুখে সূত্রধার তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত রূপকের প্রয়োগকে সূচিত করেন এবং তারপর মঞ্চে উদ্দিষ্ট পাত্র প্রবেশ করেন। আচার্য ভরত এপ্রসঙ্গে বলেন যে একটি প্রসঙ্গ চলছে, এমন সময় যদি অন্য একটি প্রসঙ্গ সহসা উপস্থাপিত হয় এবং তখন প্রথম প্রসঙ্গটি চাপা দিয়ে যদি সূত্রধার দ্বিতীয় প্রসঙ্গকে আশ্রয় করে পাত্র প্রবেশ সূচনা করেন তবে তা হবে প্রয়োগাতিশয়।[১২৪] সাহিত্যদর্পণকারের মতে একটি প্রসঙ্গের আলোচনা চলছে, এমন অবস্থায় যদি অন্য প্রসঙ্গের প্রয়োগপূর্বক পাত্র প্রবেশ হয় তাহলে সেই প্রস্তাবনাকে প্রয়োগাতিশয় বলে।[১২৫] প্রয়োগাতিশয়ের উদাহরণ হিসাবে সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে 'কুন্দমালা'র কথা বলা হ'য়েছে। সূত্রধার যখন নিজের স্ত্রীর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছেন তখন নেপথ্যে শোনা গেল — ইত ইতোঽবতরত্বার্য্যা'' অর্থাৎ আর্যে এখানে অবতরণ করুন। এটি লক্ষ্মণের বাক্য। একথা শুনে সূত্রধার ভাবলেন যে আমার পত্নীকে আহ্বান ক'রে কে আমাকে সহায়তা করতে চাইছে? একথা শোনার পর চারদিকে তিনি তাকালেন এবং প্রকৃত ঘটনা জানার পর বললেন — ''কষ্টমতিকরুণং বর্ত্ততে'' অর্থাৎ হায়। অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার।

সীতাদেবী বহুকাল যাবৎ রাবণের গৃহে অবস্থান ক'রেছেন। সেজন্য লোকাপবাদের ভয়ে ভীত হ'য়ে রামচন্দ্র গর্ভভারাবনতা সীতাকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দিয়েছেন। লক্ষ্মণ তাকে বনের দিকে নিয়ে আসছে।[১২৬]

এখানে সূত্রধার নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য নিজ পত্নীকে আহ্বান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্লোকের শেষ চরণে বললেন – "সীতাং বনায় পরিকর্ষতি লক্ষ্মণোঽয়ম্" অর্থাৎ সীতাকে লক্ষ্মণ বনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ সূচনা ক'রে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্য পূর্বের প্রয়োগটির অর্থাৎ নৃত্যের জন্য স্ত্রীকে ডাকারূপ প্রয়োগের অতিক্রম ঘটেছে এবং লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশরূপ অন্য প্রয়োগের উপক্রম হ'য়েছে। এজন্যই এখানে প্রয়োগাতিশয় নামক প্রস্তাবনা হ'য়েছে।

প্রবর্তক বা প্রবৃত্তক — প্রস্তাবনা বা আমুখের অপর ভেদটি হ'ল প্রবৃত্তক। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এটি প্রবর্তক নামে উল্লিখিত হ'য়েছে।[১২৭] রূপগোস্বামী প্রবর্তককে প্রবৃত্তক নামে অভিহিত করেছেন। এই প্রস্তাবনা পাত্র-পাত্রীকে অভিনয়ে প্রবৃত্ত করে বলে এর নাম প্রবর্তক।[১২৮] ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রবর্তক বা পাত্রপ্রবেশ বর্ণিত হ'য়েছে একপ্রকার চরিত্রের প্রস্তাবনা হিসাবে যা সূত্রধার কর্তৃক নাট্যক্রিয়ার বর্ণনা হিসাবে করা হয়।[১২৯] বিশ্বনাথ এবং ধনঞ্জয় একে পাত্রপ্রবেশ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে যেখানে সূত্রধার তৎকালে বিদ্যমান ঋতুর বর্ণনা করেন ও সেই বর্ণনার আশ্রয়ে পাত্রপ্রবেশ হয় সেখানে প্রবর্তক প্রস্তাবনা হয়।[১৩০] প্রকৃপক্ষে এক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি একদিকে যেমন ঋতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অপরদিকে তেমনি যিনি মঞ্চে প্রবেশ করবেন সেই নাটকীয় পাত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আরও স্পষ্ট ক'রে বলা যায় যে সূত্রধারের এই ঋতুবর্ণনা হবে শ্লেষাত্মক। এখানে কাল শব্দের দ্বারা বসন্তাদি কালকে বুঝতে হবে। প্রবর্তকের উদাহরণ হিসাবে আচার্য বিশ্বনাথ এবং ধনঞ্জয় উভয়েই "আসদিতপ্রকটনির্মলচন্দ্রহাস" ইত্যাদি শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন।[১৩১] শ্লোকটিতে শ্লেষাত্মক শব্দ প্রয়োগের দ্বারা একদিকে যেমন শরৎকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে, অপরদিকে তেমনি রামচন্দ্রের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাবলীও সূচিত হ'য়েছে। সূত্রধার পঠিত এই শরৎবর্ণনাকে আশ্রয় ক'রেই রামচন্দ্র মঞ্চে প্রবেশ ক'রেছেন।[১৩২] তাই এই জাতীয় প্রস্তাবনা বা আমুখের নাম প্রবর্তক বা প্রবৃত্তক।

অবলগিত — প্রস্তাবনার ভেদ আলোচনাপ্রসঙ্গে অবলগিতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন যে, যে প্রস্তাবনায় একটি বিষয়ের প্রশংসাছলে সাদৃশ্যহেতু বিষয়ান্তরের প্রশংসা উক্ত হয় এবং সেই প্রশংসার উপমানরূপে নাটকীয় পাত্রের প্রবেশ ঘটে তা অবলগিত প্রস্তাবনা।[১৩৩] সাহিত্যদর্পণকার এ

প্রসঙ্গে অভিমত দেন যে, যেখানে এক বিষয়ের সমাবেশ থেকে অন্য কাজের অবতারণা করা হয় সেখানে পণ্ডিতগণ সেই প্রস্তাবনাকে অবলগিত নামে অভিহিত করেন।[১৩৪]

অবলগিত প্রস্তাবনার উদাহরণ প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণে ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকের ''তবাস্মি গীতরাগেন'' ইত্যাদি শ্লোকটি উল্লিখিত হয়েছে।[১৩৫] সূত্রধার নটীর গানে এতই মুগ্ধ যে কোন্ নাটকের অভিনয় করতে হবে তাও তিনি ভুলে গেছেন। নটী স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি উক্ত শ্লোকটি পাঠ করেন। সূত্রধার বলেন যে বেগবান এই সারংগ রাজা দুষ্যন্তকে যেমন টেনে এনেছে, নটীর মনোমুগ্ধকর গানও তাঁকে কোথায় যেন টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একথা বলতে বলতে সারংগকে অনুসরণ ক'রে ধনুর্বাণ হাতে রথস্থ্ মহারাজ দুষ্যন্ত প্রবেশ করেন।

প্রয়োগাতিশয় এবং অবলগিত — এই দুটি প্রস্তাবনাভেদকে বাহ্যতঃ অভিন্ন ব'লে বোধ হ'লেও এরা বস্তুতঃ এক নয়, ভিন্ন। সূত্রধারের আলোচ্য বিষয় যেখানে বিষয়ান্তর দ্বারা বাধিত হয় সেখানে প্রয়োগাতিশয়। আর সূত্রধার যেখানে আপন বিষয় দ্বারা অন্য বিষয়কে সাদৃশ্যহেতু স্বেচ্ছায় আকর্ষণ ক'রে উপন্যস্ত করেন, সেখানে অবলগিত প্রস্তাবনা। যেখানে কোনো কালের বা ঋতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্লেষাদি দ্বারা সাদৃশ্য বর্ণনা ক'রে পাত্র প্রবেশ হয় সেখানে প্রবর্তক প্রস্তাবনা হবে, আর যেখানে অন্যভাবে সাদৃশ্য বর্ণনা দ্বারাই কেবল পাত্রের সূচনা হয় তাকে বলে অবলগিত প্রস্তাবনা। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে অবলগিত প্রস্তাবনায় সাদৃশ্য থাকলেও শ্লেষ থাকে না।

প্রস্তাবনা হ'ল নাটকের মুখবন্ধ বা ভূমিকা। উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত প্রভৃতি প্রস্তাবনার যে কোনো একটি অঙ্গের মাধ্যমে সূত্রধার নাট্যের প্রকৃত বিষয় বা নাটকীয় পাত্রকে সহৃদয় সামাজিকের কাছে পরিচিত করেন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সূত্রধার ভারতীবৃত্তি অবলম্বন ক'রে এই পরিচয়পর্ব সম্পন্ন করেন। পূর্বরঙ্গে বিধানসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন ক'রে সূত্রধার মঞ্চ থেকে নির্গত হন। তারপর সূত্রধারের সমান আকৃতিসম্পন্ন অন্য কোনো নট মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং কথাবস্তু, বীজ, মুখ বা পাত্রের সূচনা করেন।

সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা বা প্রারম্ভিক অংশের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। কারণ নাট্য-বিষয়বস্তু বা ঘটনার আভাস সংস্কৃত নাটকের প্রারম্ভিক অংশের মধ্যেই দেওয়া হয়। প্রকৃতিগতভাবে সংস্কৃত নাটকসমূহ রোমান্টিক এবং প্রস্তাবনা বা প্রারম্ভিক অংশের মধ্যে নাট্যবস্তুর আভাস থাকে।

এলিজাবেথীয় নাটকসমূহও প্রকৃতগতভাবে রোমান্টিক এবং সেগুলিও সেই নাট্যবস্তু বা নাটকীয় ঘটনার ইঙ্গিত দেয় যে ঘটনাসমূহ ঘটতে চ'লেছে।

সমগ্র নাটকের অভিনয়ব্যবস্থা যাঁর অধীন সেই সূত্রধারই হ'ল এই নাটকীয় প্রস্তাবনা অংশের প্রধান নট। তবে এর ব্যতিক্রমও যে দৃষ্ট হয় না, তা নয়। রাজশেখরের লেখা 'কর্পূরমঞ্জরী'' নামক প্রাকৃত সট্টকে সূত্রধারের স্থান গৌণ। এই সট্টকের প্রযোজক 'সূত্রধার' নয়, প্রযোজিকা কবি-পত্নী অবন্তী সুন্দরী। পাত্র-পাত্রী প্রবেশের কর্তা সূত্রধার নয়, কর্তা পারিপার্শ্বিক।

কখনও কখনও প্রস্তাবনায় পাত্র প্রবেশ বিষয়েও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম হ'ল — সূত্রধার মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর কথাবস্তু বা মূল নাটকীয় বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হবে।[১৩৬] সুতরাং তখনই মঞ্চে পাত্র প্রবেশ ঘটবে। কিন্তু ভবভূতি প্রণীত "উত্তররামচরিতে" সূত্রধার প্রস্থান না ক'রেও নিজেকে অযোধ্যাবাসী ব'লে পরিচয় দেন।[১৩৭] তিনি এখন আর সূত্রধার নন। তিনি অযোধ্যাবাসী এক নাটকীয় পাত্র। সূত্রধারের প্রস্থান এবং তারপর পাত্রপ্রবেশ – এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বরঙ্গের নৃত্য-গীত-বাদ্য-আবৃত্তির বিশুদ্ধ গাম্ভীর্য ও বিচিত্র আনন্দে এক নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারপর নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হ'লে অভিনব কৌশলে পঞ্চবিধ প্রস্তাবনার যে কোনো একটিকে অবলম্বন ক'রে নাটকীয় পাত্র প্রবেশ হয়। এই পাত্র প্রবেশের পর থেকেই শুরু হয় নাটকের Action বা গতি। মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন সূত্রধার। অগ্রসর হয় ঘটনার স্রোত। বিস্তৃতি লাভ করে বস্তু বা বৃত্ত।

ঃঃ পাদটীকা ঃঃ

১। দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধামতম্। — সাহিত্যদর্পণ -৬/১

২। দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্। — সাহিত্যদর্পণ ৬/১

৩। তদ্রূপারোপাত্তু রূপকম্। — সাহিত্যদর্পণ ৬/১

৪। অবস্থানুকৃতির্নাট্যং রূপং দৃশ্যতয়োচ্যতে।
রূপকং তৎ সমারোপাৎ —।। — দশরূপক ১/৭

৫। নৃত্তং তাললয়াশ্রয়ম্। — দশরূপক - ১/৯

৬। অন্যদ্ভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্। — দশরূপক - ১/৯

৭। অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্। — দশরূপক - ১/৭

৮। দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্।
বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি।।
ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্ধনম্।
লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি।। — নাট্যশাস্ত্র – ১/১১৪-১১৫

৯। "This ancient ballad poetry is the source both of the epic and of the drama." winternitz : HIL, VOL I, p 90.

১০। "সূত্রয়ন্ কাব্যনিক্ষিপ্তবস্তুনেতৃকথারসান্।
নান্দীশ্লোকেন নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইতি স্মৃতঃ।" — শারদাতনয় রচিত – "ভাবপ্রকাশ" গ্রন্থ

১১। 'The early evidence adduced for the existence of the shadow drama is wholly unreliable." – Keith : The Sanskrit Drama – p.54.

১২। The word primarily is an adjective meaning Ionian, the Greeks with whom India first came into contact. But it was not confined to what was Greek in the strict sense of the word ; it applies to anything connected with Hellenized Persian Empire, Egytp, Syria, Bactria, and it, therefore, can not be rigidly limited to what is Greek ... Nor in fact was there any curtain in the case of Greek drama, so far as is known for which it could be borrowed. – Keith : Sanskrit Drama – p.61.

১৩। "জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।

যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানথর্বনাদপি।। — নাট্যশাস্ত্র - ১/১৭

১৪। "সাম্না তাবদিমে বিঘ্নাঃ স্থাপ্যন্তাং বচসা ত্বয়া।।" — নাট্যশাস্ত্র - ১/৯৮ (খ)

১৫। বিরূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
অলং বো মন্যুনা দৈত্যা বিষাদং ত্যজতানঘাঃ।।
ভবতাং দৈবতানাং চ শুভাশুভবিকল্পকঃ।।
কর্মভাবান্বয়াপেক্ষো নাট্যবেদো ময়াকৃতঃ।।
নৈকান্ততো২ত্র ভবতাং দেবানাং চাত্র ভাবনম্।
ত্রৈলোকস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্।।
ক্বচিদ্ধর্মঃ ক্বচিৎক্রীড়া ক্বচিদর্থঃ ক্বচিচ্ছ্রমঃ।
ক্বচিদ্ধাস্যং ক্বচিদ্ যুদ্ধং ক্বচিৎকামঃ ক্বচিদ্বধঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ১/১০৪-১০৭
দেবতানামসুরাণাং রাজ্ঞামথ কুটুম্বিনাম্।।
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে।
যো২য়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ১/১২০ (খ), ১২১

১৬। অপূজয়িত্বা রঙ্গং তু নৈব প্রেক্ষাং প্রবর্ত্তয়েৎ। — নাট্যশাস্ত্র – ১/১২৫ (ক)

১৭। নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যায়োগসমবকারডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/৩

১৮। নৃপতীনাং যচ্চরিতং নানারসভাবচেষ্টিতৈর্বহুধা।
সুখদুঃখোৎপত্তিকৃতং তজ্জ্ঞেয়ং নাটকং নাম।। — নাট্যশাস্ত্র – ২০/১২

১৯। নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৭ (ক)

২০। প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ং প্রখ্যাতোদাত্তনায়কং চৈব।
রাজর্ষিবংশচরিতং তথা চ দিব্যাশ্রয়োপেতম্।।
নানাবিভূতিসংযুতমৃদ্ধিবিলাসাদিভির্গুণৈশ্চাপি।
অঙ্কপ্রবেশকাঢ্যং ভবতি হি তন্নাটকং নাম।। — নাট্যশাস্ত্র ২০/১০-১১

২১। রাজর্ষিঃ ঋষিযোগ্যদয়া-দাক্ষিণ্য-ক্ষমাদিগুণবান্ রাজা রাজ্যাধিপতিঃ, ন তু ঋষিতুল্যক্ষত্রিয়নৃপতিঃ"
— কুসুমপ্রতিমা টীকা - সা.দ. - ৬/৯

২২। অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ।। — সাহিত্যদর্পন - ৩/৩৮

২৩। কিঞ্চান্যৎ শস্যপূর্ণা ভবতু বসুমতী শাশ্বতী নষ্টরোগা।

শান্তির্গোব্রাহ্মণানাং নয়পতিরবনিং পাতু চেমাং সমগ্রাম্।। – ভরত নাট্যশাস্ত্র ৩৬/৮৩

২৪। প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিব – অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – ৭/৩৫ (ক)

২৫। ত্বং মে প্রসাদসুমুখী ভব দেবি!

নিত্যমেতাবদেব মৃগয়ে প্রতিপক্ষহেতোঃ।

আশাস্যমত্যধিগমাৎ প্রভৃতি প্রজানাং

সম্পদ্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে।। – মালবিকাগ্নিমিত্রম্ – ৫/২০

২৬। স্বান্যা সাধারণস্ত্রীতি তদ্‌গুণা নায়িকা ত্রিধা। – দশরূপক ২/১৫

২৭। অথ নায়িকা ত্রিবিধা, স্বা২ন্যা সাধারণী স্ত্রীতি। – সাহিত্যদর্পণ ৩/৬৯

২৮। এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।

অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্য্যো নির্বহণে২দ্ভুতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ ৬/১০

২৯। পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাংকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।। – সাহিত্যদর্পণ ৬/৮ (খ)

৩০। ইতিবৃত্তং তু কাব্যস্য শরীরং পরিকীর্তিতম্।

পঞ্চভিঃ সন্ধিভিস্তস্য বিভাগঃ সংপ্রকল্পিতঃ।। – নাট্যশাস্ত্র - ২১/১

৩১। শৃঙ্গারে কৌশিকী বীরে সাত্ত্বত্যারভটী পুনঃ।

রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃত্তিঃ সর্বত্র ভারতী।। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/১২২

৩২। এতদেব যদা সর্বৈঃ পতাকাস্থানকৈর্যুতম্।

অঙ্কৈশ্চ দশভির্ধীরা মহানাটকমুচিরে।। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/২২৩

৩৩। ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্। – সাহিত্যদর্পণ - ৬/২২৮

৩৪। যত্র কবিরাত্মশক্ত্যা বস্তু শরীরঞ্চ নায়কং চৈব।

উৎপত্তিকং প্রকুরুতে প্রকরণমেতদ্ বুধৈর্জ্ঞেয়ম্।। – নাট্যশাস্ত্র – ২০/৪৮

৩৫। শৃঙ্গারো২ঙ্গী নায়কস্তু বিপ্রো২মাত্যো২থবা বণিক্।

সাপায়ধর্মকামার্থপরো ধীরপ্রশান্তকঃ।। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/২২৫

৩৬। অমাত্যবিপ্রবণিজামেকং কুর্যাচ্চ নায়কম্।। – দশরূপক – ৩/৩৯

৩৭। ধীরপ্রশান্তং সাপায়ং ধর্মকামার্থতৎপরম্। – দশরূপক – ৩/৪০ (ক)

৩৮। নায়িকা কুলজা ক্বাপি বেশ্যা ক্বাপি দ্বয়ং ক্বচিৎ। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/২২৬ (ক)

৩৯। নায়িকা তু দ্বিধা নেতুঃ কুলস্ত্রী গণিকা তথা।

ক্বচিদেকৈব কুলজা বেশ্যা ক্বাপি দ্বয়ং ক্বচিৎ।। – দশরূপক ৩/৪১

৪০। শৃঙ্গারো২ঙ্গী নায়কস্তু বিপ্রো২মাত্যো২থবা বণিক্।

সাপায়ধর্মকামার্থপরো ধীরপ্রশান্তকঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২২৫

৪১। প্রকরণনাটকবিষয়ে কবিভিঃ পঞ্চাদ্যা দশাবরাশ্চ।
অঙ্কাঃ কর্তব্যাঃ স্যুর্নানারসভাবসংযুক্তাঃ।। — ভরত নাট্যশাস্ত্র - ২০/৫৭

৪২। অথ প্রকরণে বৃত্তমুৎপাদ্যং লোকসংশ্রয়ম্।
অমাত্যবিপ্রবণিজামেকং কুর্যাচ্চ নায়কম্।।
ধীরপ্রশান্তং সাপায়ং ধর্মকামার্থতৎপরম্।
শেষং নাটকবৎ সন্ধিপ্রবেশকরসাদিকম্।। — দশরূপক – ৩/৩৯-৪০

৪৩। সম্ভোগহীনসম্পদ্বিটস্তু ধূর্ত্তঃ কলৈকদেশজ্ঞঃ।
বেশোপচারকুশলো বাগ্মী মধুরোঽথ বহুমতো গোষ্ঠ্যাম্।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৫০

৪৪। ভাণস্তু ধূর্তচরিতং স্বানুভূতং পরেণ বা।
যত্রোপবর্ণয়েদেকো নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ।। — দশরূপক – ৩/৪৯

৪৫। ভাণবৎ সন্ধিসন্ধ্যঙ্গলাস্যাঙ্গাঙ্কৈবিনির্মিতম্।
ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্।।
অত্র নারভটী, নাপি বিষ্কম্ভক – প্রবেশকৌ।
অঙ্গী হাস্যরসস্তত্র বীথ্যঙ্গানাং স্থিতির্নবা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৬৪-২৬৫

৪৬। প্রহসনমপি বিজ্ঞেয়ং দ্বিবিধং শুদ্ধং তথৈব সঙ্কীর্ণম্। — ভরত নাট্যশাস্ত্র - ২০/১০২(ক)

৪৭। তদ্বৎ প্রহসনং ত্রেধা শুদ্ধবৈকৃতসঙ্করৈঃ। — দশরূপক - ৩/৫৪ (ক)

৪৮। কৃতাগা অপি নিঃশঙ্কস্তর্জিতোঽপি ন লজ্জিতঃ।
দৃষ্টদোষোঽপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্টনায়কঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৪৪

৪৯। বীথ্যামেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকোঽত্র কল্প্যতে।
আকাশভাষিতৈরুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তিমাশ্রিতঃ।।
সূচয়েদ্ভূরিশৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান্ রসানপি।
মুখনির্বহণে সন্ধী অর্থপ্রকৃতয়োঽখিলাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৫৩-২৫৪

৫০। বীথী স্যাদেকাঙ্কা দ্বিপাত্রহার্যা তথৈকহার্যা বা।
অধমোত্তমমধ্যাভির্যুক্তা স্যাৎ প্রকৃতিভিস্তিসৃভিঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ২০/১১২

৫১। এতানি চাংগানি নাটকাদিষু সম্ভবন্ত্যপি বীথ্যামবশ্যং বিধেয়ানি — সাহিত্যদর্পণ - ৬/২৬৩-(বৃত্তি)

৫২। উৎসৃষ্টিকাঙ্ক একাঙ্কো নেতারঃ প্রাকৃতা নরাঃ।
রসোঽত্র করুণঃ স্থায়ী বহুস্ত্রীপরিদেবিতম্।।

প্রখ্যাতমিতিবৃত্তং চ কবির্বুদ্ধ্যা প্রপঞ্চয়েৎ।
ভাণবৎসন্ধিবৃত্ত্যঙ্গান্যস্মিন্ জয়পরাজয়ৌ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/২৫০-২৫১

৫৩। ভাণবৎ সন্ধি-বৃত্ত্যংগৈর্যুক্তঃ স্ত্রীপরিদেবিতৈঃ।।
বাচা যুদ্ধং বিধাতব্যং তথা জয়-পরাজয়ৌ।। — দশরূপক – ৩/৭১ (খ), ৭২ (ক)

৫৪। বৃত্তং সমবকারে তু খ্যাতং দেবাসুরাশ্রয়ম্।
সন্ধয়ো নির্বিমর্ষাস্তু ত্রয়োঽঙ্কাস্তত্র চাদিমে।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৩৪

৫৫। দ্বাদশোদাত্তবিখ্যাতাঃ ফলং তেষাং পৃথক্ পৃথক্।
বহুবীররসাঃ সর্বে যদ্বদম্ভোধিমন্থনে।। — দশরূপক – ৩/৬৪

৫৬। ফলং পৃথক্ পৃথক্ তেষাং বীরমুখ্যোঽখিলো রসঃ।
বৃত্তয়ো মন্দকৌশিক্যো নাত্র বিন্দুপ্রবেশকৌ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৩৬

৫৭। বৃত্তয়ো মন্দকৌশিক্যো নেতারো দেবদানবাঃ।। — দশরূপক – ৩/৬৩ (খ)

৫৮। নায়কা দ্বাদশোদাত্তাঃ প্রখ্যাতা দেবমানবাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৩৫ (খ)

৫৯। দেবাসুরবীজকৃতঃ প্রখ্যাতোদাত্তনায়কশ্চৈব। — নাট্যশাস্ত্র – ২০/৬৪ (ক)

৬০। অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠং চতুঃষষ্ঠিস্তু মধ্যমম্।
কণীয়স্তু তথা বেশ্ম হস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে।। — নাট্যশাস্ত্র – ২/১০

৬১। ন মহাজনপরিবারং কর্তব্যং নাটকং প্রকরণং বা।
যে তত্র কার্যপুরুষাশ্চত্বারঃ পঞ্চ বা তে স্যুঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২০/৩৯

৬২। ডিমসংঘাত ইতি নায়কসংঘাতব্যাপারাত্মকত্বাৎ ডিমঃ। — দশরূপক - অবলোক, পৃ–৭৪

৬৩। প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ঃ প্রখ্যাতোদাত্তনায়কোপেতঃ।
ষট্‌লক্ষণযুক্তশ্চতুরঙ্কো বৈ ডিমঃ কার্যঃ।। — নাট্যশাস্ত্র –২০/৮৪

৬৪। বৃত্তয়ঃ কৌশিকীহীনা নির্বিমর্ষাশ্চ সন্ধয়ঃ।
দীপ্তাঃ স্যুঃ ষড্রসাঃ শান্ত-হাস্য-শৃঙ্গারবর্জিতাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৪৪

৬৫। খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ স্বল্পস্ত্রীজনসংযুতঃ।
হীনো গর্ভবিমর্ষাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৩১

৬৬। খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ খ্যাতোদ্ধতনরাশ্রয়ঃ।।
হীনো গর্ভবিমর্শাভ্যাং দীপ্তাঃ স্যুর্ডিমবদ্ রসাঃ। — দশরূপক – ৩/৬০ (খ), ৬১ (ক)

৬৭। একাঙ্কশ্চ ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদয়ঃ। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৩২ (ক)

৬৮। মৃগবদলভ্যাং নায়িকাং নায়কোঽস্মিন্নীহতে ইতীহামৃগঃ। — অবলোক – পৃ–৭৬

৬৯। নায়কো মৃগবদলভ্যাং নায়িকামত্র ঈহতে বাঞ্চতীতীহামৃগাঃ। – সাহিত্যদর্পণ - ৬। ২৪৯-বৃত্তি

৭০। মিশ্রমীহামৃগে বৃত্তং চতুরঙ্কং ত্রিসন্ধিমৎ।।
নরদিব্যাবনিয়মান্ নায়কপ্রতিনায়কৌ।
খ্যাতৌ ধীরোদ্ধতাবন্তৌ বিপর্যাসাদযুক্তকৃৎ।। – দশরূপক – ৩/৭২ (খ) - ৭৩

৭১। একাঙ্কো দেব এবাত্র নেতেত্যাহুঃ পরে পুনঃ। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৪৯ (ক)

৭২। দিব্যস্ত্রীহেতুকং যুদ্ধং নায়কাঃ ষড়িতীতরে।। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৪৯ (খ)

৭৩। প্রয়োগো দ্বিবিধশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো নাটকাশ্রয়ঃ।
সুকুমারস্তথাবিদ্ধো নাট্যযুক্তিসমাশ্রয়ঃ।। – নাট্যশাস্ত্র – ১৪/৫৫

৭৪। ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী চেহামৃগস্তথা।
উৎসৃষ্টিকাংকো ব্যায়োগো ডিমঃ প্রহসনং তথা।।
কৈশিকীবৃত্তিহীনানি রূপাণ্যেতানি কারয়েৎ। – ভরত নাট্যশাস্ত্র ২০/৮-৯ (ক)

৭৫। নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকম্।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খনং রাসকং তথা।।
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা।
দুর্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ।।
অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ।
বিনা বিশেষং সর্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতম্।। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/৪-৬

৭৬। শ্রীহর্ষস্তু রংগশব্দেন তৌর্যত্রিকং ব্রুবন্।
নাট্যাংগপ্রয়োগস্য তসৈব পূর্বরংগতাং
মন্যমানঃ পূর্বশ্চাসৌ রংগ ইতি সমাসমমংস্ত। – অভিনবভারতী – ৫ম অধ্যায় – অভিনবগুপ্ত

৭৭। যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে।
কুশীলবাঃ প্রকুর্বন্তি পূর্বরঙ্গঃ স উচ্যতে।। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/২২

৭৮। এতানি চ বহির্গীতান্যন্তর্যবনিকাগতৈঃ।
প্রযোক্তিভিঃ প্রযোজ্যানি তন্ত্রীভাণ্ডকৃতানি তু।। – নাট্যশাস্ত্র – ৫/১১

৭৯। ততশ্চ সর্বকুতপৈর্যুক্তান্যন্যানি কারয়েৎ।
বিঘাট্য বৈ যবনিকাং নৃত্তপাঠ্যকৃতানি চ।। – নাট্যশাস্ত্র – ৫/১২

৮০। উপক্ষেপেণ কার্যস্য হেতুযুক্তিসমাশ্রয়া।
সিদ্ধেনামন্ত্রনা যা তু বিজ্ঞেয়া সা প্ররোচনা।। – নাট্যশাস্ত্র – ৫/২৯ (খ)-৩০ (ক)

৮১। দৈত্যদানবতুষ্ট্যর্থং সর্বেষাং চ দিবৌকসাম্।
নির্গীতানি সগীতানি পূর্বরঙ্গকৃতানি তু।। — নাট্যশাস্ত্র – ৫/৫৮

৮২। ধ্রুবেতি সংজ্ঞিতানি স্যুর্নারদপ্রমুখৈর্দ্বিটজৈঃ।
যান্যঙ্গানীহ উক্তানি তানি মে সন্নিবোধত।। — নাট্যশাস্ত্র – ৩২/১

৮৩। বাক্যবর্ণা হ্যলংকারা লয়া যত্যথ পাণয়ঃ।
ধ্রুবমন্যোন্যসম্বদ্ধা যস্মাত্তস্মাদ্ ধ্রুবাস্মৃতা।। — নাট্যশাস্ত্র – ৩২/৮

৮৪। পরিবর্তাস্তু চত্বারঃ পাণয়স্ত্রয় এব চ।
জাত্যা চৈব হি বিশ্লোকাস্তাংশ্চ তালেন যোজয়েৎ।। — নাট্যশাস্ত্র – ৫/৬৩

৮৫। আশীর্বচনসংযুক্তা নিত্য যস্মাৎ প্রবর্ততে।।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্ নান্দীতি সংজ্ঞিতা। — নাট্যশাস্ত্র ৫/২৪(খ)-২৫(ক)

৮৬। আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা।।
মাঙ্গল্যশঙ্খচন্দ্রাব্জকোককৈরবশংসিনো।
পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভিরষ্টাভির্বা পদৈরুত।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৪-২৫

৮৭। শ্লোকপাদং পদং কেচিৎ সুপ্তিঙন্তমথাপরে।
পরেঽবান্তববাকৈকস্বরূপং পদমুচিরে।। — নাট্যপ্রদীপ

৮৮। ক) অষ্টাপদা :-
উদয়নবেন্দুবাসবদত্তাবলৌ বলস্যাত্মাম্।
পদ্মাবতীর্ণৌ বসন্তকম্রৌ ভুজৌ পাতাম্।। — স্বপ্নবাসবদত্তম্। – স্থাপনা – ।।১।।

খ) দ্বাদশপদা :-
সীতাভবঃ পাতু সুমন্ত্রতুষ্টঃ
সুগ্রীবরামঃ সহলক্ষ্মণশ্চ।
যো রাবণার্যপ্রতিমশ্চ দেব্যা
বিভীষণাত্মা ভরতোঽনুসর্গম্।। — প্রতিমানাটকম্ - ১/১

৮৯। ক) সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহূতকৌমারবর্হি-
-ত্রাসান্নাসাগ্ররন্ধ্রং বিশতি ফণিপতৌ ভোগসংকোচভাজি।
গণ্ডোড্ডীনালিমালামুখরিতককুভস্তাণ্ডবে শূলপাণে –
বৈনায়ক্যশ্চিরং বো বদনবিধূতয়ঃ পান্তু চীরকারবত্যঃ।। — মালতীমাধবম্ – ১/১

খ) চূড়াপীড়কপালসংকুলগলন্মন্দাকিনীবারয়ো
বিদ্যুৎপ্রায়ললাটলোচনশিখিজ্বালাবিমিশ্রত্বিষঃ।
পান্তু ত্বামকঠোরকেতকশিখাসংদিগ্ধমুগ্ধেন্দবো
ভূতেশস্য ভুজঙ্গবল্লিবলয়শ্রঙ্নদ্ধজূটা জটাঃ।। — মালতীমাধবম্ – ১/২

৯০। যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিণঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।। — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ - প্রস্তাবনা - ১

৯১। যস্মাদভিনয়স্তত্র প্রথমং হ্যবতার্যতে।।
রঙ্গদ্বারমতো জ্ঞেয়ং বাগঙ্গাভিনয়াত্মকম্। — নাট্যশাস্ত্র - ৫/২৬ (খ) - ২৭ (ক)

৯২। কৃত্বা শুষ্কাপকৃষ্টাং তু যথাবদ্ দ্বিজসত্তমাঃ।।
ততঃ শ্লোকং পঠেদেকং গম্ভীরস্বরসংযুতম্।
দেবস্তোত্রং পুরস্কৃত্য যস্য পূজা প্রবর্ততে।।
রাজ্ঞো ভক্তিশ্চ যত্র স্যাদথবা ব্রহ্মণস্তবঃ।
গদিত্বা জর্জরশ্লোকং রঙ্গদ্বারে চ যৎ স্মৃতম্।।
পঠেদন্যং পুনঃ শ্লোকং জর্জরস্য বিনামনম্।
জর্জরং নময়িত্বা তু ততশ্চারীং প্রযোজয়েৎ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৫/১১৬ (খ) - ১১৯

৯৩। নান্দীকৃতা ময়া পূর্বমাশীর্বচনসংযুতা।।
অষ্টাঙ্গপদসংযুক্তা বিচিত্রা দেবসংমতা। — নাট্যশাস্ত্র – ১/৫৬ (খ) - ৫৭ (ক)

৯৪। অত্র শুষ্কাক্ষরৈরেব হ্যপকৃষ্টা ধ্রুবা যতঃ।।
তস্মাচ্ছুষ্কাপকৃষ্টেব জর্জরশ্লোকদর্শিতা। — নাট্যশাস্ত্র – ৫/২৫ (খ) - ২৬ (ক)

৯৫। নবগুর্বক্ষরাণ্যাদৌ ষট্ লঘূনি গুরুত্রয়ম্।।
কলাশ্চাষ্টৌ প্রমাণেন পাদৈর্হ্যষ্টাদশাক্ষরৈঃ। —নাট্যশাস্ত্র – ৫/১১৪ (খ)-১১৫ (ক)

৯৬। ঝণ্ডে ঝণ্ডে দি গ্লে দি গ্লে।।
জ ম্বু ক বলিতক তেত্তেন্নাম্। —নাট্যশাস্ত্র - ৫/১১৫(খ) - ১১৬ (ক)

৯৭। শৃংগারস্য প্রচরণাচ্চারী সংপরিকীর্তিতা।।
রৌদ্রপ্রচরণাচ্চাপি মহাচারীতি কীর্তিতা। — নাট্যশাস্ত্র ৫/২৭ (খ) - ২৮ (ক)

৯৮। বিদূষকঃ সূত্রধারস্তথা বৈ পারিপার্শ্বকঃ।।

যত্র কুর্বন্তি সজ্জল্পং তত্রাপি ত্রিগতং স্মৃতম্। — নাট্যশাস্ত্র – ৫/২৮(খ) - ২৯ (ক)

৯৯। প্রসিদ্ধার্থ-প্রদর্শিনী প্ররোচনাভিধীয়তে। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ – (ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত, পৃ–১৪৩)

১০০। প্রস্তুতস্যৈব কাব্যস্য যন্নিষ্পন্নেন বস্তুনা।
কথনং সা প্ররোচনা .....।। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ - (ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত, পৃঃ–১৪৩)

১০১। উপক্ষেপেণ কার্যস্য হেতুযুক্তিসমাশ্রয়া।।
সিদ্ধেনামন্ত্রণা যা তু বিজ্ঞেয়া সা প্ররোচনা। — নাট্যশাস্ত্র – ৫/২৯ (খ) – ৩০ (ক)

১০২। সর্বমেবং বিধং কৃত্বা সূচীবেধকৃতৈরথ।
পাদৈরনাবিদ্ধগতৈর্নিষ্ক্রামেয়ুঃ সমং ত্রয়ঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ৫/১৪২

১০৩। প্রযুজ্য বিধিনৈবং তু পূর্বরঙ্গং প্রয়োগতঃ।
স্থাপকঃ প্রবিশেৎ তত্র সূত্রধারগুণাকৃতিঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ৫/১৬৭

১০৪। কুর্যাদনন্তরচারীং দেবব্রাহ্মণশংসিনীম্।
সুবাক্যমধুরৈঃ শ্লোকৈর্নানাভাবরসান্বিতৈঃ।।
প্রসাদ্য রঙ্গং বিধিবৎ কবের্নামানুকীর্তয়েৎ।।
প্রস্তাবনাং ততঃ কুর্যাৎ কাব্যপ্রখ্যাপনাশ্রয়াম্।।
দিব্যো দিব্যাশ্রয়ৈর্ভূত্বা মানুষো মানুষাশ্রয়ৈঃ।
দিব্যমানুষসংযোগো দিব্যো বা মানুষোঽপি বা।। — নাট্যশাস্ত্র – ৫/১৭০-১৭২

১০৫। কাব্যার্থস্য স্থাপনাৎ স্থাপকঃ। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৭ – বৃত্তি

১০৬। ভারতীসংস্কৃতপ্রায়ো বাগ্‌ব্যাপারো নটাশ্রয়ঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৯ (খ)

১০৭। নেপথ্যগীতবাদিত - রস - ভাবাভিনয় - নৃত্য - জাতীনাং ক্বাপি বিশেষে বর্তনমিতি বৃত্তিঃ কথিতা।
অথবা বিলাস - বিন্যাসক্রমো বৃত্তিরিতি। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ - (ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অনূদিত পৃ–১৪২)

১০৮। ঋগ্বেদাদ্ ভারতী বৃত্তির্যজুর্বেদাত্তু সাত্ত্বতী।
কৈশিকী সামবেদাচ্চ শেষা চাথর্বণাত্তথা।। — নাট্যশাস্ত্র – ২২/২৪

১০৯। যা বাক্‌প্রধানা পুরুষপ্রযোজ্যা

স্ত্রীবর্জিতা সংস্কৃতপাঠ্যযুক্তা।

স্বনামধেয়ৈর্ভরতৈঃ প্রযুক্তা

সা ভারতী নাম ভবেত্তু বৃত্তিঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২২/২৫

১১০। ভারতীসংস্কৃতপ্রায়ো বাগ্‌ব্যাপারো নরাশ্রয়ঃ। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২৯ (খ)

১১১। ভারতীসংস্কৃতপ্রায়ো বাগ্‌ব্যাপারো নটাশ্রয়ঃ। — দশরূপক – ৩/৫ (ক)

১১২। তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনামুখে।

অঙ্গান্যত্রোন্মুখীকারঃ প্রশংসতঃ প্ররোচনা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৩০

১১৩। প্রস্তুতাভিনয়েষু প্রশংসতঃ শ্রোতৃণাং প্রবৃত্ত্যুন্মুখীকরণং প্ররোচনা। —সাহিত্যদর্পণ-৬/৩০ (বৃত্তি)

১১৪। নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।

সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে।।

চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।

আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৩১-৩২

১১৫। উদ্‌ঘাত্যকঃ কথোদ্‌ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা।

প্রবর্তকাবলগিতে পঞ্চ প্রস্তাবনাভিদাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৩৩

১১৬। পদানি ত্বগতার্থানি যৈর্নরাঃ পুনরাদরাৎ।

যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈস্তদুদ্‌ঘাত্যকমুচ্যতে।। — নাট্যশাস্ত্র – ২০/১১৭

১১৭। পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।

যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৩৪

১১৮। সূত্রধারঃ। ক্রূরগ্রহ স কেতুশ্চন্দ্রং সম্পূর্ণমণ্ডলমিদানীম্।

অভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ —

ইত্যনন্তরম্ – ‘(নেপথ্যে), আঃ ক এষ ময়ি স্থিতে

চন্দ্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি? — মুদ্রারাক্ষসম্ – প্রস্তাবনা-৬

১১৯। সূত্রধারস্য বাক্যং বা সমাদায়ার্থমস্য বা।

ভবেৎ পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ কথোদ্ঘাতঃ স উচ্যতে।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৩৫

১২০। সূত্রধারস্য বাক্যং বা যত্র বাক্যার্থমেব বা।

গৃহীত্বা প্রবিশেৎ পাত্রং কথোদ্‌ঘাতঃ স কীর্তিতঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২২/৩২

১২১। দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোঽপ্যন্তাৎ।

আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ।। — রত্নাবলী – ১/৭

১২২। নির্বাণবৈরদহণাঃ প্রশমাদরীণাং
নন্দন্তু পাণ্ডুতনয়াঃ সহ মাধবেন।
রক্তপ্রসাধিতভুবঃ ক্ষতবিগ্রহাশ্চ
স্বস্থা ভবন্তু কুরুরাজসুতাঃ সভৃত্যাঃ। — বেণীসংহার – ১/৭

১২৩। এযো২য়মিত্যুপক্ষেপাৎ সূত্রধারপ্রয়োগতঃ।
পাত্রপ্রবেশো যত্রৈষ প্রয়োগাতিশয়ো মতঃ।। — দশরূপক – ৩/১১

১২৪। প্রয়োগে২ত্র প্রয়োগং তু সূত্রধারঃ প্রযোজয়েৎ।
ততশ্চ প্রবিশেৎ পাত্রং প্রয়োগাতিশয়ো হি সঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২২/৩৩

১২৫। যদি প্রয়োগ একস্মিন্ প্রয়োগো২ন্যঃ প্রযুজ্যতে।
তেন পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ প্রয়োগাতিশয়স্তদা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৩৬

১২৬। লংকেশ্বরস্য ভবনে সুচিরং স্থিতেতি
রামেন লোকপরিবাদভয়াকুলেন।
নির্বাসিতাং জনপদাদপি গর্ভগুর্বীং
সীতাং বনায় পরিকর্ষতি লক্ষ্মণো২য়ম্।। — কুন্দমালা

১২৭। কালং প্রবৃত্তমাশ্রিত্য সূত্রধৃগ্ যত্র বর্ণয়েত্।
তদাশ্রয়শ্চ পাত্রস্য প্রবেশস্তত্প্রবর্ত্তকম্।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৩৭

১২৮। "পাত্রমভিনয়ে প্রবর্ত্তয়তীতি প্রবর্ত্তকম্।" — সাহিত্যদর্পণ-৬/৩৭- কুসুমপ্রতিমা টীকা

১২৯। প্রবৃত্তং কার্যমাশ্রিত্য সূত্রভৃদ্যত্র বর্ণয়েৎ।
তদাশ্রয়াচ্চ পাত্রস্য প্রবেশস্তৎ প্রবৃত্তকম্।। — নাট্যশাস্ত্র – ২২/৩৪

১৩০। কালসাম্যসমাক্ষিপ্তপ্রবেশঃ স্যাৎ প্রবৃত্তকম্। — দশরূপক – ৩/১০ (খ)

১৩১। আসাদিতপ্রকটনির্মলচন্দ্রহাসঃ
প্রাপ্তঃ শরৎসময় এব বিশুদ্ধকান্তঃ।
উৎখায় গাঢ়তমসং ঘনকালমুগ্রং
রামো দশাস্যমিব সম্ভৃতবন্ধুজীব।। —অজ্ঞাতনামা জনৈক কবিকর্তৃক রচিত

১৩২। ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টো রামঃ। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৩৭ - বৃত্তি

১৩৩। যত্রান্যস্মিন্ সমাবেশ্য কার্যমন্যৎপ্রশস্যতে।
তচ্চাবলগিতং নাম বিজ্ঞেয়ং নাট্যযোক্তৃভিঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২০/১১৮

১৩৪। যত্রৈকশ্চ সমাবেশাৎ কার্য্যমন্যৎ প্রসাধ্যতে।

প্রয়োগে খলু তজ্জ্ঞেয়ং নান্নাবলগিতং বুধৈঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৩৮

১৩৫। তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।

এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসাঃ।। — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – প্রস্তাবনা - ৫

১৩৬। প্রস্তাবনান্তে নির্গচ্ছেৎ ততো বস্তু প্রপঞ্চয়েৎ। — দশরূপক – ৩/২২ (ক)

১৩৭। এষোঽস্মি কার্যবশাদাযোধ্যকস্তদানীন্তনশ্চ সংবৃত্তঃ। — উত্তরচরিতম্ – প্রথম অঙ্ক

ঃঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃঃ

সংস্কৃত নাটকের ঘটনাবিন্যাস পদ্ধতি

রূপকের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'ল বস্তু। কারণ রূপকের সাফল্য এই বস্তু বা ইতিবৃত্তের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংস্কৃত রূপকের ইতিবৃত্তকে দেখা হ'য়েছে। আচার্য ভরত এই বস্তুর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে ইতিবৃত্তই হ'ল নাট্যের কলেবর। মানবদেহ যেমন মস্তক, হস্ত-পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত হয় তেমনি রূপকের ইতিবৃত্তও সৃষ্টি হয় অবস্থা, অর্থপ্রকৃতি, সন্ধি প্রমুখ উপাদানের সমন্বয়ে। অগ্নিপুরাণেও প্লট বা ইতিবৃত্তকে নাটকাদির শরীর ব'লে অভিহিত করা হ'য়েছে।[১]

রূপকের ইতিবৃত্তকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা ১) আধিকারিক ও ২) প্রাসঙ্গিক।[২] রূপকের মূল কাহিনীকে বলা হয় আধিকারিক।[৩] 'অধিকার' বলতে বোঝায় ফলের উপর স্বামিত্ব অর্থাৎ প্রধান ফল ভোগকারী। এখানে ফল বলতে রূপকের মুখ্য প্রয়োজনকেই বোঝানো হয়। রূপকের এই মুখ্য প্রয়োজনে বা ফলে যাঁর অধিকার থাকে তিনিই অধিকারী।[৪] আর একটু সহজভাবে বলা যায় যে প্রধান ঘটনার নায়ককেই বলা হয় অধিকারী। নায়ক বা অধিকারীর চরিত কথাই হ'ল 'আধিকারিকম্'। তাই প্রধান ঘটনাকেই বলা হয় আধিকারিক যেহেতু অধিকারীর সঙ্গে তার চরিতকথা সম্পৃক্ত থাকে। নায়ক বা অধিকারীর বৃত্তান্ত রূপকের একটি স্থায়ী বিষয়। এই বৃত্তান্ত রূপকের ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। যে নাট্যবস্তু অধিকারীকে আশ্রয় ক'রে বর্ণিত হয় সেই নাট্যবস্তুকে বলা হয় আধিকারিক বস্তু।[৫] "বালরামায়ণ" নাটকে রাম-সীতার কাহিনীই প্রধান। তাই এই দৃশ্যকাব্যে রাম ও সীতার বৃত্তান্তই আধিকারিক বস্তু। একইরকমভাবে বলা যায় যে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" রূপকের মূল উপজীব্য বিষয় দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেম। সুতরাং এই দৃশ্যকাব্যে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় কাহিনীই হ'ল আধিকারিক বস্তু।

নাটকে আধিকারিক বৃত্তরূপে কিরূপ কাহিনী গৃহীত হ'তে পারে সে সম্পর্কে বলা যায় যে নাটকের আধিকারিক বস্তু হবে পুরাণ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন প্রখ্যাত কাহিনী।[৬] তবে নাটকের বস্তু যে সর্বদাই পুরাণপ্রসিদ্ধ হবে এমন কোন কথা নেই। লোকগাথা – প্রসিদ্ধ কোন ঘটনা অবলম্বনেও নাটক হ'তে পারে। কালিদাসের "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকের বিষয়বস্তু পদ্মপুরাণ ও মহাভারত অবলম্বনে রচিত। ভবভূতির 'উত্তরচরিতে'র কাহিনী রামায়ণ থেকে গৃহীত। আবার ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তম্" নাটকের বিষয়বস্তু

লোকগাথা থেকে সঞ্জাত। কিন্তু কবিকল্পিত কোন কাহিনী নাটকের আধিকারিক বস্তু হ'তে পারে না।

আধিকারিক বৃত্তের নায়ক হবেন কোন প্রখ্যাত রাজর্ষি অথবা দিব্য বা স্বর্গীয় পুরুষ। তিনি হবেন সত্যবাদী, নীতিশাস্ত্র প্রসিদ্ধ উদার গুণসম্পন্ন, প্রতাপশালী, বেদপরম্পরার রক্ষক, উৎসাহী এবং যশোলিপ্সু।[৭] আচার্য বিশ্বনাথের মতে নাটকীয় বস্তুর নায়ক হবেন বিখ্যাত বংশোদ্ভূত কোন ব্যক্তি, রাজর্ষি, দিব্য বা দিব্যাদিব্য গুণসম্পন্ন কোন ব্যক্তি।[৮]

তবে নাট্যকার পুরাণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বৃত্তান্তকে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে নাটকে উপস্থাপিত করতে পারেন। সেজন্য কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ নাট্যকারগণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি আকর গ্রন্থের কাহিনীকে নাট্যপ্রয়োজনে কিছুটা পরিবর্তিত করেছেন। কখনও কখনও নিজ কপোল কল্পিত বৃত্তান্তের সংযোজনও করেছেন তাঁরা। তবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে বর্ণিত প্রখ্যাত কোন ধীরোদাত্ত রাজর্ষির কাহিনী কিংবা দিব্য নায়কের কাহিনীই হবে নাটকের আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বস্তুর বা প্রধান ঘটনার বিস্তৃতির জন্য রূপকে প্রাসঙ্গিকভাবে যে বস্তু সন্নিবেশিত হয় তাকেই বলে প্রাসঙ্গিক বস্তু।[৯] যেমন "বালরামায়ণ" নাটকে রামচন্দ্রের ঘটনাই হ'ল প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু অন্যান্য চরিত্রের সহায়তা ছাড়া প্রধান চরিত্রকে কোনভাবেই পরিপুষ্ট করা সম্ভব নয়। সেজন্যই মূল কাহিনীর অঙ্গরূপে বিভীষণ, সুগ্রীব প্রমুখ বৃত্তান্তের উপস্থাপনা করা হ'য়েছে। সুতরাং বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতি চরিত্র এখানে প্রাসঙ্গিক চরিত্র। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকেও প্রধান কাহিনীর বিস্তৃতি ও পরিপুষ্টির জন্য সানুমতী, ধীবর, হংসপদিকা ইত্যাদি বৃত্তান্তের অবতারণা করা হ'য়েছে।

প্রাসঙ্গিক বৃত্তের দুটি ভেদ। যথা – ১) পতাকা এবং ২) প্রকরী।[১০] দশরূপককার রূপকের বস্তু বা বৃত্তকে সাকুল্যে তিনপ্রকার বলে মনে করেন। যথা ১) আধিকারিক, ২)পতাকা (প্রাসঙ্গিক) এবং ৩) প্রকরী (প্রাসঙ্গিক)। এই বস্তুত্রয় প্রখ্যাত, উৎপাদ্য এবং মিশ্রভেদে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত।[১১] এই তিন পৃথক শ্রেণী অনুযায়ী আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক বস্তুকে ধনঞ্জয় নয়ভাগে বিভক্ত করেছেন। বস্তুর এই নয়টি ভেদকে দিব্য, দিব্যাদিব্য এবং মর্ত্যভেদে মোট সাতাশটি ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে।[১২] ডঃ সীতানাথ আচার্য এবং ডঃ দেবকুমার দাস কর্তৃক লিখিত "দশরূপক" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে যে ছকটি প্রদত্ত হ'য়েছে এপ্রসঙ্গে তা সংযোজিত হ'ল।[১৩]

রূপকের বৃত্ত বা বস্তু ইতিহাস থেকে যদি গৃহীত হয় তাহলে সেই বস্তুকে বলা হয় প্রখ্যাত। নাট্যের ইতিবৃত্ত যদি কবিকল্পিত হয় তবে তাকে বলে উৎপাদ্য; আর দৃশ্যকাব্যের বস্তু ইতিহাস ও কবিকল্পনার মিশ্রণ হ'লে তাকে বলা হয় মিশ্র।

প্রাসঙ্গিক বস্তুর যে অংশ পতাকা নামে খ্যাত সেই অংশকে আমরা পতাকাস্থান বা পতাকাস্থানক ব'লে বিবৃত করব। কারণ নাটকের পাঁচপ্রকার অর্থপ্রকৃতির মধ্যে একটির নাম পতাকা। সেই পতাকার থেকে প্রাসঙ্গিক পতাকার ভিন্নত্ব দেখাবার জন্য প্রাসঙ্গিক পতাকাকে পতাকাস্থান বলা হ'চ্ছে। আসলে পতাকা নাটকের একটি পারিভাষিক শব্দ বা technical term।

নাটকের আবেদনকে মধুরতর করার জন্য নাট্যকারকে অনেকরকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পতাকাস্থান এরকমই একটি নাট্যকৌশল। এটি নাটকের আকস্মিক ভাব্যর্থসূচক। অকস্মাৎ উপস্থিতি ও ভাব্যর্থসূচনাই পতাকাস্থানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধনিক দশরূপকের টীকায় পতাকাস্থানকের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন – পতাকাদ্বারা যেভাবে কোন স্থানকে চিহ্নিত করা হয়, তেমনিভাবে পতাকাস্থানের দ্বারা নাটকে পরবর্তীকালে ঘটবে এমন কোন ঘটনার সূচনা দেওয়া হয়। সাগরনন্দী একটু অন্যভাবে বলেন যে পতাকা যেমন একস্থান থেকে সকল সৈন্যকে দ্যোতিত করে, তেমনি দৃশ্যকাব্যের পতাকা নামক প্রাসঙ্গিক বৃত্তও একদেশে থেকে সমগ্র দৃশ্যকাব্যকে দ্যোতিত করে।

নাট্যশাস্ত্রে পতাকাস্থানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হ'য়েছে যে একটি বিষয়ের চিন্তা অথবা আলোচনা করতে করতে অতর্কিতে তৎস্বরূপ অন্য একটি বিষয়ের অবতারণাই পতাকাস্থান।[১৪] আচার্য ভরত চারপ্রকার পতাকাস্থানের কথা বলেছেন।[১৫] মহর্ষি ভরতকে অনুসরণ ক'রে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ চতুর্বিধ পতাকাস্থানের কথাই আলোচনা করেছেন। পতাকাস্থানের চারটি ভেদকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পতাকাস্থান ব'লে সাহিত্যদর্পণে উল্লেখ করা হ'য়েছে। সংক্ষেপে ক্রমান্বয়ে উক্ত চারপ্রকার পতাকাস্থানের আলোচনা করা হ'ল।

প্রথম পতাকাস্থান —

অতর্কিতভাবে উপচারবশতঃ যদি অধিকতর আনন্দসৃষ্টি বা অধিকতর গুণযুক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তবে তাকে প্রথম প্রকারের পতাকাস্থান বলে।[১৬] এই পতাকাস্থানে হঠাৎ কোন ঘটনা আবির্ভূত হ'য়ে

উৎকৃষ্ট ফললাভ ঘটায়। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে 'রত্নাবলী' নাটিকা থেকে প্রথম পতাকাস্থানের উদাহরণ দেওয়া হ'য়েছে।[১৭] রাজা উদয়ন মহিষী বাসবদত্তার কণ্ঠপাশ ছেদ করছেন ভাববার সময় কণ্ঠস্বর শুনে তাঁকে সাগরিকা ব'লে চিনতে পারেন এবং তাঁকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য অনুনয় করেন। সহসা সাগরিকার সঙ্গে রাজার একান্ত সাক্ষাৎকার উভয়ের ভাবী মিলনের সূচনা করেছে। এই সাক্ষাৎকার রাজার পক্ষে অধিকতর আনন্দদায়ক ও গুণবিশিষ্ট। রাজা যখন ভাবছেন যে বাসবদত্তা তাঁর উপর রুষ্ট হ'য়েছে তখন আকস্মিকভাবে সাগরিকাকে পেয়ে আগের থেকে তিনি আরও বেশী আনন্দ পেলেন। এভাবেই সাগরিকাপ্রাপ্তিতে প্রথম পতাকাস্থানের সঙ্গে লক্ষণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পতাকাস্থান —

বাক্য যখন অতিশয় শ্লিষ্ট ও বহুবন্ধযুক্ত হয় তখন তাকে দ্বিতীয় পতাকাস্থান বলে।[১৮] অনেকগুলি শ্লেষযুক্ত বিশেষণ বা বিশেষ্যপদ, বীজার্থ ও নায়কের মঙ্গল প্রভৃতির সূচনা দ্বিতীয় পতাকাস্থানের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় পতাকাস্থানের উদাহরণ প্রসঙ্গে ''বেণীসংহার'' নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারকথিত ''রক্তপ্রসাধিতভুবঃ'' ইত্যাদি শ্লোকের উদাহরণ দেওয়া যায়।[১৯] এই উদাহরণে 'কুরুরাজসুতাঃ' এই পদের 'রক্তপ্রসাধিতভুবঃ', 'ক্ষতবিগ্রহাঃ' এবং 'স্বস্থাঃ' — এই বিশেষণ তিনটি দ্ব্যর্থক। যেমন 'রক্ত' শব্দের দুটি অর্থ অনুরাগ ও শোণিত। 'প্রসাধিত' শব্দের অর্থ দুটি হ'ল – বশীকৃত এবং অলংকৃত। 'ক্ষত' শব্দের অর্থ –বিলুপ্ত এবং অস্ত্রশস্ত্রে বিদীর্ণ। 'বিগ্রহ' শব্দের অর্থদুটি যথাক্রমে যুদ্ধ ও শরীর। আর 'স্বস্থাঃ' শব্দের দুটি অর্থ হ'ল – সুস্থচিত্ত ও স্বর্গস্থ।

শ্লোকাংশের সাধারণ অর্থ হ'ল দুর্যোধনাদি যে কৌরবগণ অনুরাগ বা প্রেমের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে বশে এনেছেন যাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ বিলুপ্ত হ'য়েছে তাঁরা সপরিজন সুস্থচিত্ত হউন। এই শ্লোকাংশটির শ্লেষাত্মক অর্থটি হ'ল — যাঁদের দেহশোণিতে বসুমতী অলংকৃত, যাঁদের দেহ অস্ত্রশস্ত্রে বিদীর্ণ, দুর্যোধনাদি সেই কৌরবগণ (নিহত হ'য়ে) সপরিজন স্বর্গলাভ করুন। আলোচ্য শ্লোকাংশে উল্লিখিত রক্ত প্রভৃতি শব্দ শ্লেষের দ্বারা রুধিরকে বুঝিয়েছে এবং বীজার্থকে প্রতিপাদিত করেছে। এভাবেই নায়ক যুধিষ্ঠিরের মঙ্গল প্রতিপাদিত হওয়ায় দ্বিতীয় পতাকাস্থানের লক্ষণসঙ্গতি হ'য়েছে।

তৃতীয় পতাকাস্থান —

যে বাক্যবিন্যাসে অর্থ প্রথমে লীন বা অস্পষ্ট কিন্তু অন্তে সুস্পষ্ট, যা মুখ্য বিষয়বস্তুর সূচক ও সশ্লেষ প্রত্যুত্তরবিশিষ্ট তা তৃতীয় পতাকাস্থান।[২০] ভট্টনারায়ণের "বেণীসংহার" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা ও কঞ্চুকীর কথোপকথনের মধ্যে এই পতাকাস্থানের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রচণ্ড ঝড়ে যখন দুর্যোধনের রথের ধ্বজা ভেঙে গেল, তখন কঞ্চুকী দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন — "হে মহারাজ! ভেঙে গেছে। ভেঙে গেছে। রাজা বললেন "কে ভেঙেছে?" ইত্যাদি।[২১]

আলোচ্য উদাহরণে বর্ণনীয় বস্তুর দ্বারা দুর্যোধনের উরুভঙ্গরূপ বিষয়ের অর্থ সূচিত হ'চ্ছে। এখানে সাধারণ অর্থ হ'ল প্রচণ্ড ঝড়ে রথের চূড়া ভঙ্গ হওয়া এবং আগন্তুক বিষয় ভীমসেনের দ্বারা দুর্যোধনের উরুভঙ্গ।

চতুর্থ পতাকাস্থান —

যেখানে দ্ব্যর্থক অর্থাৎ সুশ্লিষ্ট বচনবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে মুখ্য বিষয়বস্তুর সূচনা হয় সেখানে চতুর্থ পতাকাস্থান হয়।[২২] চতুর্থ পতাকাস্থান হিসাবে "রত্নাবলী" নাটিকা থেকে উদ্ধৃত "উদ্দামোৎকলিকাং" ইত্যাদি শ্লোকটির কথা বলা যায়।[২৩] একটি উদ্যানলতাকে দেখতে দেখতে নায়ক এই মন্তব্য করেছেন। আলোচ্য শ্লোকে লতার বিশেষণগুলি শ্লিষ্ট। তাই লতা ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই এই বিশেষণগুলি প্রযোজ্য। সুতরাং দ্ব্যর্থক বচন এখানে আছে। উদ্দামোৎকলিকা ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত সাগরিকাকে রাজা উদয়ন যখন প্রেমাকুল দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকবেন তখন তা জেনে বাসবদত্তার মুখ রাগে রক্তবর্ণ হ'য়ে যাবে। এই শ্লোকের দ্বারা নাটকে পরবর্তীকালে যা ঘটবে সেই ভাবী অর্থকে সূচিত করা হ'য়েছে। অর্থাৎ উদয়ন সাগরিকার মিলনই যে ভাবী প্রধান ফল তা এখানে সূচিত হ'য়েছে।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ এই উভয় পতাকাস্থানেই তো শ্লেষের আবশ্যকতা আছে। তাহলে উভয়ের পার্থক্য কোথায়? এর উত্তরে বলা যায় যে চতুর্থ পতাকাস্থান মুখ্যার্থের সূচক; আর দ্বিতীয় পতাকাস্থান গৌণার্থের সূচক। সোজা কথায় চতুর্থ পতকাস্থানে শ্লেষের দ্বারা নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বোঝানো হয়। অপরপক্ষে দ্বিতীয় পতাকাস্থানে শ্লেষের দ্বারা নাটকের কোন অপ্রধান বিষয়কে বোঝানো হয়, মূল বিষয় নয়।

দশরূপককার ধনঞ্জয়ের মতে পতাকাস্থান দুই প্রকার। যথা – ১) তুল্যসংবিধান এবং ২)

তুল্যবিশেষণ।[২৪] তুল্যসংবিধান কথাটির অর্থ হ'ল সমান ইতিবৃত্ত বা কাহিনী। যেখানে প্রস্তুত বা প্রাকরণিক বিষয়ের ভাবী অর্থ অন্যোক্তির মাধ্যমে সূচিত হয় সেখানে তুল্যসংবিধান নামক পতাকাস্থান হয়। এই পতাকাস্থানের উদাহরণ হিসাবে "রত্নাবলী" নাটিকার "যাতোঽস্মি পদ্মনয়নে" ইত্যাদি শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়।[২৫] অপরপক্ষে যেখানে প্রাকরণিক বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে সমান বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা মুখ্য বিষয় সূচিত হয় সেখানে তুল্যবিশেষণ নামক পতাকাস্থান হয়। এই পতাকাস্থানের উদাহরণস্বরূপ "রত্নাবলী" নাটিকার "উদ্দামোৎকলিকাম্" ইত্যাদি শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য।

পতাকাস্থান কখনো মঙ্গলের জন্য আবার কখনও অমঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। বিশ্বনাথ যে চারটি পতাকাস্থানের চারপ্রকার উদাহরণ দিয়েছেন তার সবগুলিতেই শুভ সূচনা দেখা যায়। নায়কের অমঙ্গল সূচনার জন্য পতাকাস্থানের ব্যবহার দেখা যায় "উত্তররামচরিত" নাটকে। সেখানে রামচন্দ্র বলছেন – প্রিয়তমাবিষয়ে কোন্ বস্তুই না প্রিয় যদি পুনরায় বিরহ অসহ্য না হয়।[২৬] এমন সময় প্রতিহারী প্রবেশ ক'রে সংবাদ দিল — "দেব উবত্থিদো" (দেব! উপস্থিতঃ) এই কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বোঝা গেল যে সীতাদেবীর নির্বাসন নিকটবর্তী। এভাবেই এই পতাকাস্থানের মাধ্যমে নায়কের অমঙ্গল সূচিত হ'ল। কারণ এরপর থেকে নায়ক রামচন্দ্রকে সীতার বিরহ সহ্য করতে হবে।

পতাকাস্থান সাধারণতঃ চারপ্রকার হ'লেও কার্যক্ষেত্রে তার বেশীও পতাকাস্থান হ'তে পারে। নাট্যকার তাঁর নাটকের প্রয়োজনে একই পতাকাস্থান একাধিকবার ব্যবহার করতে পারেন। তাই নাটকে পতাকাস্থান কতবার প্রযুক্ত হবে তা নাট্যকারের প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভর করবে।

অবশ্য একদল নাট্যশাস্ত্রকার মনে করেন যে মুখসন্ধি থেকে আরম্ভ ক'রে পরপর চারটি সন্ধিতে পরপর চারটি পতাকাস্থানের ব্যবহার হবে। অন্তিম সন্ধি অর্থাৎ উপসংহার সন্ধিতে কোন পতাকাস্থানের ব্যবহার হবে না। বিশ্বনাথ অবশ্য এই মত মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে যে কোন সন্ধিতে যে কোন পতাকাস্থানের প্রয়োগ হ'তে পারে। কারণ যা উপাদেয়, যা মধুর, তা নিয়মসূত্রে বাঁধা পড়লে নিষ্প্রাণ হ'য়ে পড়ে।

পতাকাস্থান এক অপূর্ব নাট্যকৌশল। নাটকের এ এক অনবদ্য বাচনভঙ্গী। কখনও একটি ঘটনা, কখনও বা নূতন একটি পরিস্থিতি, কখনও বা উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে এর অভিব্যক্তি ঘটে। সকল দেশের নাটকেই এই নাট্যকৌশলটির প্রয়োগ দেখা যায়। তবে সশ্লেষ শ্রেণীর পতাকাস্থান সংস্কৃত নাটকে যত

দেখা যায় অন্য ভাষায় তত দেখা যায় না। কারণ সংস্কৃত শব্দসম্ভার অনন্ত। তাই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এই জাতীয় পতাকাস্থান অনায়াসসাধ্য।

আকস্মিকভাবে ভবিষ্যৎ সূচনা করাই পতাকাস্থানের বৈশিষ্ট্য হ'লেও এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ নানা ধরণের হ'তে পারে। অনেকসময় দেখা যায় যে নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণ যে উক্তি করে, যে উক্তির ফলে পতাকাস্থান সৃষ্ট হয়, যে ভবিষ্যৎ সূচিত হয় তা পাত্র-পাত্রীগণ বুঝতে পারে না। কিন্তু দর্শকগণ তা বুঝতে পারে। আলংকারিকদের মতে নাটকের মধ্যে এ একজাতীয় বৈসাদৃশ্য বা contrast । বাংলায় এই বৈসাদৃশ্যমূলক পতাকাস্থানকে নাট্যশ্লেষ বা Dramatic Irony বলা হয়। আবার কখনও কখনও নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর উক্তির ফলে যে পতাকাস্থান সৃষ্ট হয়, যে ভবিষ্যৎ সূচিত হয় তা উক্তি-প্রত্যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দর্শক বা নাটকীয় চরিত্র কেউই বুঝতে পারে না, পরে তা বোঝা যায়।

সুতরাং বলা যায় যে কখনও দর্শকের জ্ঞাতসারে, কখনও নাটকীয় চরিত্রের অজ্ঞাতে, কখনও বা উভয়ের অজ্ঞাতে, কখনও বা সশ্লেষ বচনবিন্যাসের মাধ্যমে, কখনও আকস্মিক একটি ঘটনা অথবা পরিস্থিতি সৃষ্টি ক'রে, কখনও সামান্য একটি উক্তি, কখনও বা উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়ে নাটকে পতাকাস্থান সন্নিবেশিত হয়। এরফলে নাটকে অসাধারণ এক চমক সৃষ্টি হয়। এই চমকের ফলেই নাটক আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠে এবং দর্শকচিত্ত গতানুগতিকতার নিষ্প্রাণ যাতনা থেকে মুক্ত হ'য়ে এক অনাবিল রসসাগরে নিমজ্জিত হয়।

প্রকরী

প্রধান বৃত্তের উপকারক স্বল্পদেশস্থায়ী বৃত্তকেই বলা হয় প্রকরী।[২৭] নাট্যশাস্ত্রকার প্রকরীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, যে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত অনুবন্ধহীন অর্থাৎ বহুদূরব্যাপী নয় এবং যা পরার্থে অর্থাৎ নায়কের ফললাভের সহায়ক তাকেই বলে প্রকরী।[২৮] আচার্য বিশ্বনাথ বলেন যে নাটকের একটিমাত্র অংশে বর্ণিত আখ্যানই হ'ল প্রকরী।[২৯] প্রকরী রূপকের মুখ্য ফললাভে সহায়ক হ'লেও এর ব্যাপ্তি অনেক কম। ''স্বপ্নবাসবদত্তা'' নাটকের ব্রহ্মচারী বৃত্তান্তকে আমরা প্রকরী বলতে পারি। এই নাটকের প্রথমাঙ্কে উপস্থাপিত ব্রহ্মচারী বৃত্তান্ত বাসবদত্তার অন্তরে উদয়নের পত্নীপ্রেমের একনিষ্ঠতাকে জাগিয়ে তুলেছে এবং উদয়নের প্রতি পদ্মাবতীর অনুরাগ সঞ্চার করেছে। এই ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত নাটকীয় বীজের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও নাটকে একদেশব্যাপী। রামচরিতমূলক নাটকে জটায়ুর বৃত্তান্ত ও হনুমানের বৃত্তান্ত প্রকরীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাগরনন্দী মন্তব্য করেন যে প্রকরী নাটকে পুষ্পরাশির মত শোভাবর্ধন করে।

পতাকা ও প্রকরীর মধ্যে যে পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয় তা সংক্ষেপে হ'ল ঃ- ১) পতাকা এমন এক প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত যার ব্যাপ্তি বহুদূর পর্যন্ত কিন্তু প্রকরী হ'ল স্বল্পব্যাপ্ত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত। ২) পতাকা রূপকের অনেকাংশ জুড়ে থাকে এবং তা নায়কের ফললাভের অন্যতম সহায়ক হয়। অপরপক্ষে সহসা আলোকোদ্ভাসের মত দৃশ্যকাব্যের একটিমাত্র স্থানে প্রকরীর উদ্ভব। তাই প্রকরী উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যফললাভে কিছুটা সহায়ক হ'য়ে তার বিলুপ্তি ঘটে। অবশ্য পতাকানায়কের মত প্রকরী-নায়কেরও নিজস্ব কোন ফললাভ বা উদ্দেশ্যসিদ্ধি থাকে না।

অর্থোপক্ষেপক

অলংকারশাস্ত্রে নাটকীয় বস্তুকে সূচ্য এবং অসূচ্য — এই দুই প্রকারে ভাগ করা হ'য়েছে। দৃশ্যকাব্যের কিছু ইতিবৃত্ত থাকে যাকে বিশদভাবে বর্ণনা করা যায় না, বিভিন্ন নাট্যকৌশলের মাধ্যমে তা কেবলমাত্র সূচিতহয়। এই জাতীয় বস্তুকে বলে সূচ্য। আর যে ইতিবৃত্ত রঙ্গমঞ্চে সম্যক্‌ভাবে প্রদর্শিত হয় তাকে বলে অসূচ্য। দশরূপককার অসূচ্য বিষয়গুলিকে দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে দুভাগে ভাগ করেছেন।[৩০] আলংকারিকেরা সূচ্য শব্দটির দ্বারা রসহীন বস্তুকে বোঝাতে চেয়েছেন।[৩১] দীর্ঘকাল ধ'রে সংঘটিত কোন ঘটনা, নীরস ঘটনা বা নাট্যশাস্ত্রমতে অনুচিত বিষয়ের বর্ণনার জন্য কবিরা যে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য নেন তাকেই বলে অর্থোপক্ষেপক। অন্যভাবে বলা যায় যে যার মাধ্যমে 'অর্থ' বা বস্তুর 'উপক্ষেপ' বা সূচনা হয় সাধারণভাবে তাকেই বলা হয় অর্থোপক্ষেপক। সাগরনন্দী অর্থোপক্ষেপক শব্দটির অর্থ করেছেন অর্থপ্রতিপাদক।[৩২] আসলে অর্থোপক্ষেপক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের এক বিশিষ্ট আঙ্গিক। ঘটনাসংক্ষেপ ও বস্তুসূচনার এ এক অভিনব কলাকৌশল।

অঙ্কে যা দেখানো সম্ভব নয়, তা এই অংশে সংবাদরূপে মধ্যম বা অধম শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীর দ্বারা সূচিত হয়। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে কতিপয় দৃশ্যের প্রত্যক্ষ অভিনয় নিষিদ্ধ। যথা যুদ্ধ-বিগ্রহ, বধ, মৃত্যু, বিবাহ, অভিশাপ ইত্যাদি।[৩৩] কিন্তু বিষয়গুলিকে একেবারে বাদ দিলে দৃশ্যকাব্যের কাহিনীর অধিকার পরিধি একেবারে সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। সেজন্যই দৃশ্যকাব্যে অর্থোপক্ষেপকের উদ্ভব হ'য়েছে। মহাকবি কালিদাসের লেখা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের দুর্বাসার অভিশাপ দৃশ্যটি সেকারণেই চতুর্থ অঙ্কের আদিতে বিষ্কম্ভকে নেপথ্য থেকে সূচিত হ'য়েছে। তাই অঙ্কে যার প্রদর্শন নিষিদ্ধ অথচ যা নাটকীয় প্রয়োজনে অভিপ্রেত ও বক্তব্য তা এই অর্থোপক্ষেপকে সূচনীয়। এছাড়া দুটি অঙ্কের মধ্যে কালের ব্যবধান দীর্ঘ হ'লে অনেক সময় দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী অবস্থা, পরিস্থিতি বা ঘটনাবলীর কিঞ্চিৎ সূচনা না করলে পূর্বাপর সংযোগ বা সামঞ্জস্য থাকে না এবং নাটকের ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন হয়। ঘটনাগুলি বিশৃংখলভাবে ঘটছে ব'লে মনে হ'তে পারে।

নাট্যকার হয়তো পৌরাণিক কোন ঘটনা অবলম্বন ক'রে নাটক প্রণয়ন করেছেন। পুরাণকার তাঁর পুরাণে সমস্ত দিন ধ'রে সংগঠিত একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। নাটকে যদি অনুরূপভাবে ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে নীরস হ'য়ে পড়বে। তাই সংক্ষিপ্ত ক'রে ঘটনাটিকে উপস্থাপিত করতে হবে। কিন্তু এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন নাটকের অঙ্কের মধ্যে হবে না ব'লে অভিমত প্রকাশ

ক'রেছেন সাহিত্যদর্পণকার। তাঁর মতে ঘটনার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন অঙ্ক শেষ হবার পর অর্থোপক্ষেপকের সাহায্যে করতে হবে।[৩৪]

অলংকারশাস্ত্রমতে অর্থোপক্ষেপক পাঁচপ্রকার।[৩৫] যথা –

১) বিষ্কম্ভক
২) প্রবেশক
৩) চূলিকা
৪) অঙ্কাবতার
৫) অঙ্কমুখ

বিষ্কম্ভক —

অঙ্কের আদিতে প্রদর্শিত অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দেশক সংক্ষিপ্ত অর্থযুক্ত বস্তুকে বলা হয় বিষ্কম্ভক।[৩৬] বি-স্কনভ্ + ণ্বুল্ প্রত্যয় ক'রে বিষ্কম্ভ বা বিষ্কম্ভক শব্দটি নিষ্পন্ন হ'য়েছে। রূপকে বিষ্কম্ভক মধ্যবর্তী বৃত্তান্তের সূচনা ক'রে পূর্ববর্তী ঘটনা ও পরবর্তী ঘটনার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে।[৩৭] বিষ্কম্ভকের প্রয়োগকর্তা কখনই উত্তমপাত্র হয় না। মধ্যমপাত্র বা নীচ পাত্রের দ্বারাই বিষ্কম্ভকের স্থাপনা করতে হয়। কিরূপ পাত্রের দ্বারা বিষ্কম্ভক স্থাপিত হ'ল তার উপর ভিত্তি ক'রে বিষ্কম্ভককে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা ১) শুদ্ধ বিষ্কম্ভক এবং ২) সংকীর্ণ বা মিশ্র বিষ্কম্ভক।[৩৮]

সংস্কৃত ভাষায় মধ্যম পাত্রদের কথোপকথনের মাধ্যমে যদি বিষ্কম্ভক গঠিত হয় তাহলে তাকে বলে শুদ্ধ বিষ্কম্ভক। আর নীচ পাত্রদের দ্বারা সংস্কৃত ও মিশ্র ভাষায় (সংস্কৃত ও প্রাকৃত) যদি বিষ্কম্ভক স্থাপিত হয় তাহলে তাকে বলে সংকীর্ণ ও মিশ্র বিষ্কম্ভক। শুদ্ধ বিষ্কম্ভকের উদাহরণ হ'ল "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের চতুর্থ অঙ্কের শুরুতে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কর্তৃক উপস্থাপিত অংশ। এখানে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা মধ্যমপাত্র। কিন্তু এরা প্রাকৃতভাষায় কথাবার্তা বলেছে। মিশ্র বা সংকীর্ণ বিষ্কম্ভকের উদাহরণ "স্বপ্নবাসবদত্তা" নাটকে লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কের মধ্যে কঞ্চুকী ও প্রতিহারীর কথোপকথন সংকীর্ণ বা মিশ্র বিষ্কম্ভক। কারণ এখানে কঞ্চুকী মধ্যম পাত্র এবং প্রতিহারী নীচ পাত্র।

নাট্যশাস্ত্রে বলা হ'য়েছে যে বিষ্কম্ভক কেবলমাত্র নাটকের মুখসন্ধিতে থাকবে।[৩৯] কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের এই মত বাস্তবে গৃহীত হয়নি। কারণ বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন সন্ধিতে বিষ্কম্ভক দেখা যায়। তাই পরবর্তীকালের নাট্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে এ জাতীয় মত উল্লিখিত হয়নি। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ এ প্রসঙ্গে মত প্রকাশ করেন যে, বিষ্কম্ভক প্রথম অঙ্কের আদিতেও থাকতে পারে আবার অন্য যে কোন অঙ্কের আদিতেও থাকতে পারে। সেজন্য "রত্নাবলী" নাটিকায় প্রথম অঙ্কের প্রথমেই বিষ্কম্ভক লক্ষ্য করা যায়।

প্রবেশক —

অর্থোপক্ষেপকের দ্বিতীয় বিভাগ হ'ল প্রবেশক। সাহিত্যদর্পণের টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রবেশক শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে এরপর রঙ্গমঞ্চে কোন পাত্রের প্রবেশ হ'চ্ছে; তার সূচনা করে বলেই এর নাম প্রবেশক।[৪০] এই প্রবেশক বিষ্কম্ভকের মতই অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞাপনা করে। একজন বা দুজন নীচ পাত্রের দ্বারা নীচ ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় প্রবেশক প্রযুক্ত হয়।[৪১] নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে কেবল নাটক ও প্রকরণে প্রবেশকের সন্নিবেশ থাকবে।[৪২] নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রবেশক হয় না। দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে আরম্ভ ক'রে অন্য যে কোন দুটি অঙ্কের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশক হয়।[৪৩] "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কের মধ্যবর্তী রক্ষিদ্বয়, ধীবর প্রভৃতি নীচ পাত্রদ্বারা প্রযোজিত নাট্যাংশটি প্রবেশকের উদাহরণ।

বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক নামক অর্থোপক্ষেপকের এই দুটি ভেদকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করি। উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্যগুলি দৃষ্ট হয় সেগুলি হ'ল ঃ-

ক) উভয়েই অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞাপক। অর্থাৎ পরবর্তী অঙ্কের পূর্বে যা ঘটেছে এবং পরবর্তী অঙ্কে যা ঘটবে এই দুয়েরই আভাস থাকে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকে।

খ) উভয়েই অতি সংক্ষেপে অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের সূচনা করে।

গ) দুয়েরই উপস্থিতি অঙ্কের বাইরে এবং দুটিকেই নাটকের এক একটি দৃশ্য মনে করা যেতে পারে।

উভয়ের যে বৈসাদৃশ্যগুলি পরিলক্ষিত হয় সেগুলি নিম্নরূপ –

ক) বিষ্কম্ভকে এক বা একাধিক মধ্যম শ্রেণীর পাত্র-পাত্রী থাকবে; অধম শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীও থাকতে পারে। কিন্তু প্রবেশক শুধু নীচ পাত্র-পাত্রী দ্বারাই প্রযোজিত হয়।

খ) বিষ্কম্ভক যেহেতু মধ্যমপাত্রের দ্বারা প্রযোজিত সেহেতু এর ভাষা সংস্কৃত। যদি মধ্যমের সঙ্গে অধম

পাত্র থাকে তবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত — এই উভয় ভাষাই সেখানে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু প্রবেশক যেহেতু নীচ পাত্র প্রযোজিত সেহেতু এর ভাষা শুধুই প্রাকৃত।

গ) বিষ্কম্ভক দৃশ্যকাব্যের প্রারম্ভেও থাকতে পারে। কিন্তু নাটকের আদিতে প্রবেশক নিষিদ্ধ।

চূলিকা —

রঙ্গমঞ্চে যখন কোন পাত্র-পাত্রী উপস্থিত থাকে না, সেই সময় যদি পর্দা বা যবনিকার অন্তরাল থেকে কোন বিষয়ের সূচনা হয় তখন তাকে বলে চূলিকা।[৪৪] নাট্যশাস্ত্রকারের মতেও যবনিকার অন্তরাল থেকে উত্তম ও মধ্যম পাত্রের দ্বারা কোন বিষয় সূচনা হ'ল চূলিকা।[৪৫] অঙ্কের ঠিক কোন্‌খানে চূলিকার অবস্থান হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিশ্বনাথ স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি। তবে রূপ গোস্বামীর আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে অঙ্কের আদিতে বা প্রথম অঙ্কের প্রথমেই যেমন চূলিকা থাকতে পারে, তেমনি দুটি অঙ্কের মাঝখানেও চূলিকা থাকতে পারে।[৪৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যবণিকার অন্তরাল থেকে যখন কোন বিষয়ের সূচনা হচ্ছে তখন যদি মঞ্চে কোন পাত্র-পাত্রী না থাকে তবেই চূলিকা হবে। আর যদি যবনিকার অন্তরাল থেকে বিষয়সূচনার সময় নট-নটী রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকে তাহলে তা চূলিকা হবে না। সেকারণেই ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকে দুর্বাসার অভিশাপ নেপথ্য থেকে সূচিত হ'লেও তা চূলিকা হয়নি; যেহেতু সেইসময় অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা মঞ্চে উপস্থিত ছিল। তাই উক্ত ঘটনা চূলিকা নয়, বিষ্কম্ভক।

রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধপ্রদর্শন নিষিদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধের ফল ঘোষণার প্রয়োজন আছে। তাই ভবভূতিকৃত ''মহাবীরচরিত'' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথমে এই প্রয়োজন–সিদ্ধির জন্য নেপথ্য থেকে দেবতাগণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্র ও পরশুরামের যুদ্ধে পরশুরামের পরাজয়–সংবাদ সূচিত হ'য়েছে।

অঙ্কাবতার —

পাঁচপ্রকার অর্থোপক্ষেপকের মধ্যে চতুর্থ অর্থোপক্ষেপক হ'ল অঙ্কাবতার। একটি অঙ্ক যখন শেষ হ'য়ে আসে সেই সময় সংক্ষেপে অন্য অঙ্কের সূচনা হ'লে তাকে অঙ্কাবতার আখ্যা দেওয়া হয়।[৪৭] দশরূপককারও প্রায় একই রকম ভাবে বললেন যে পূর্ব অঙ্কের অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে পরবর্তী অঙ্কের বস্তু

যখন সূচিত হয় তখন তাকে বলে অঙ্কাবতার।[৪৮] অঙ্কাবতারের উদাহরণ প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার ''অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'' নাটকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কের মধ্যবর্তী ধীবর বৃত্তান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। ধীবরের কাছে নিজের নামাংকিত আংটিটি দেখে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করার জন্য দুঃখে ভেঙে পড়েছেন। পঞ্চম অঙ্কের শেষে ধীবর ও রাজবাড়ীর রক্ষী দুজন রাজপুরুষের কথোপকথন থেকে দর্শকগণ বুঝে গেল যে শকুন্তলার জন্য রাজা শোকাকুল হ'য়ে উঠেছেন। পঞ্চম অঙ্কে অর্থোপক্ষেপকের সাহায্যে যা বলা হ'ল সমগ্র ষষ্ঠ অঙ্কে সেই ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। এভাবেই পঞ্চম অঙ্কের শেষভাগ ষষ্ঠ অঙ্ককে অবতীর্ণ করিয়েছে। ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকটি দেখতে দেখতে দর্শককুলের মনে হয় যেন ধীবর বৃত্তান্ত ও ষষ্ঠ অঙ্কের মধ্যপথে কোন ছেদ নেই। পরবর্তী অঙ্কে একই ঘটনার জের চ'লেছে। সুতরাং ধীবর বৃত্তান্তটি অঙ্কাবতার। ষষ্ঠ অঙ্কটি এই বৃত্তান্তেরই অঙ্গবিশেষরূপে অবতারিত হ'য়েছে।

কিন্তু ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকে আমরা দেখি যে ধীবর বৃত্তান্তটিকে প্রবেশকরূপে অভিহিত করা হ'য়েছে। কারণ এই ধীবর বৃত্তান্তটি নীচ পাত্র প্রযোজিত এবং পরবর্তী অঙ্কের ঘটনার সূচক। তাই একে প্রবেশক বলাই বোধহয় অধিকতর যুক্তিসংগত।

অঙ্কাস্য বা অঙ্কমুখ —

যখন কোন অঙ্কের অংশবিশেষে পরবর্তী সকল অঙ্কের ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া হয় তখন তাকে বলে অঙ্কমুখ।[৪৯] এখানে অঙ্ক শব্দের অর্থ অঙ্কের অংশবিশেষ। এতে সংশ্লিষ্ট দৃশ্যকাব্যটির বীজ সূচিত হয়। ভবভূতির লেখা ''মালতীমাধব'' নাটকের প্রথম অঙ্কের আদিতে এর দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। এতে কামন্দকী এবং অবলোকিতার মুখ দিয়ে পরবর্তী অঙ্কসমূহের সংক্ষিপ্তসার সূচিত হ'য়েছে। কিন্তু ''মালতীমাধব''-এর কোন কোন সংস্করণে এই অর্থোপক্ষেপকটি 'বিষ্কম্ভক' ব'লে নির্দিষ্ট হ'য়েছে।

অঙ্কমুখের লক্ষণ নিয়ে শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। ধনঞ্জয়ের মতে কোন অঙ্কের শেষে কোন নাটকীয় পাত্র প্রবেশ ক'রে পূর্বের অঙ্কে যে ঘটনা চলছিল তাকে ছিন্ন ক'রে দিয়ে যখন পরবর্তী অঙ্কের বিষয়বস্তুকে সূচনা করে তখন তাকে বলে অঙ্কাস্য।[৫০] অঙ্কাস্যের উদাহরণ প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় ভবভূতির ''মহাবীরচরিত'' নাটকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সেখানে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সুমন্ত্র প্রবেশ ক'রে জনক ও শতানন্দের আলোচনা ছিন্ন ক'রে দিয়েছে এবং পরবর্তী অঙ্কের বিষয়বস্তুকে সূচিত ক'রেছে।

অন্যান্য আলংকারিকেরা অঙ্কাস্যকে অঙ্কাবতারের অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করেন। কারণ তাঁদের মতে 'অঙ্কাস্য' ও বক্ষ্যমাণ 'অঙ্কাবতারের' লক্ষণে কোন পার্থক্য নেই। বিশ্বনাথও এ জাতীয় অঙ্কাস্যকে অঙ্কবতারের অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করেন।[৫১]

সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে অর্থোপক্ষেপকের সংজ্ঞা ও তার পাঁচপ্রকার ভেদের স্বরূপ সম্পর্কে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অঙ্কমুখ ও অঙ্কাবতারের স্বরূপ নিয়ে এই মতবিভেদ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অর্থোপক্ষেপকগুলির মধ্যে প্রবেশক ও বিষ্কম্ভককে নিঃসংশয়ে এক একটি দৃশ্য বলা যায়। এদের স্থানও অঙ্কের বাইরে। এদের স্থান কোনক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কাস্য — এদের কোনটিই অঙ্কের বাইরে থাকে না। এদের স্থান অঙ্কের মধ্যেই নির্দিষ্ট। তাই এগুলিকে অঙ্কের বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

অর্থপ্রকৃতি

অর্থপ্রকৃতি হ'ল এক অন্যতম নাট্যকৌশল বা dramatic technique। এখানে অর্থ বলতে বোঝায় প্রয়োজন; আর প্রকৃতি বলতে বোঝায় হেতু। অর্থাৎ 'অর্থপ্রকৃতি' শব্দের অর্থ হ'ল – নাটকের প্রকৃত অর্থ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির হেতু বা কারণসমূহ।[৫২] দশরূপকের টীকাকার ও সাহিত্যদর্পণকার বলেন - অর্থপ্রকৃতি হ'ল নাট্যপ্রয়োজনসিদ্ধির হেতুস্বরূপ।[৫৩] ভোজদেব ও শারদাতনয়ের মতে অর্থপ্রকৃতিগুলি হ'ল নাটকীয় কথাবস্তুর শরীরভূত উপাদান। সাগরনন্দীর মতে এগুলি নাটকীয় বস্তুর স্বভাব। অর্থাৎ plot বা নাটকীয় বস্তু থাকলে এগুলি থাকবেই। অন্যভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলা যায় যে নাটকীয় বিষয়বস্তুর উপাদানই হ'ল অর্থপ্রকৃতি।

অর্থপ্রকৃতির স্বরূপ সম্পর্কে নাট্যতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এদের সংখ্যা নিয়ে তেমন মতভেদ নেই। নাট্যশাস্ত্রানুসারে অর্থপ্রকৃতির ভেদ পাঁচটি। যথা –

১) বীজ

২) বিন্দু

৩) পতাকা

৪) প্রকরী

৫) কার্য[৫৪]

সাহিত্যদর্পণকার নাট্যশাস্ত্রের মতটিকেই পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন।

বীজ —

নাটক মাত্রেই একটি প্রধান উদ্দেশ্য বা মুখ্য ফল থাকে। এই উদ্দেশ্যকে বলে কার্য। আর কার্যের প্রথম যে হেতু তারই নাম বীজ। ক্ষুদ্র বীজে যদি জলসেচন করা হয় তাহলে তার থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়। তারপর কালক্রমে সেই অঙ্কুরিত বীজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয় এবং তা ফল দান করে। অনুরূপভাবে কোন ঘটনা নাটকের প্রথমে অল্পমাত্র প্রদর্শিত হ'য়ে পরে নানাপ্রকার অপ্রধান ঘটনার সাহচর্যে ক্রমশ বিস্তৃত হ'য়ে যখন নায়কের মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রথম হেতু বা প্রধান কারণ হয় তখন তাকে নাটকীয় পরিভাষায় বীজ বলে।[৫৫] সংক্ষেপে বলা যায় যে, যা থেকে নাটকীয় ঘটনার উদ্ভব হয় তাকেই বলে নাটকের বীজ। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, বীজ রূপকের প্রথম দিকে স্বল্পমাত্রায় প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে

পরবর্তীকালে বহুধারায় বিস্তৃত হ'য়ে রূপকে ফললাভের হেতুরূপে গণ্য হয়।[৫৬]

বীজের উদাহরণ দিতে গিয়ে আচার্য বিশ্বনাথ "রত্নাবলী" নাটিকার প্রথম অঙ্কের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এই নাটিকার মুখ্য ফল হ'ল উদয়ন ও রত্নাবলীর মিলন। এই কার্যসাধনের ব্যাপারে দৈবের সহায়তা ও মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের প্রচেষ্টা প্রধান সহায়ক হ'য়েছে। "রত্নাবলী" নাটিকার বিষ্কম্ভকে যৌগন্ধরায়ণ বলছেন — "বিধি অনুকূল হ'লে অন্য দ্বীপ থেকে, এমন কি সমুদ্রের মাঝখান থেকেও অভিমত ফলকে নিয়ে এসে, জীবনে তার মিলন ঘটিয়ে দেয়।"[৫৭] যৌগন্ধরায়ণের কথাটা যে কতখানি সত্য তা রূপকের শেষে উদয়নের সঙ্গে রত্নাবলীর পরিণয়ের ঘটনায় বোঝা যায়। যৌগন্ধরায়ণের উক্তিটি বীজ হিসাবে নাটিকায় কাজ করেছে যে বীজটি অত্যন্ত অল্প ভাষায় রূপকে বিন্যস্ত হ'য়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র দৃশ্যকাব্যটিতে এই বীজটিই পত্রে-পুষ্পে-ফলে সুশোভিত হ'য়েছে।

বিন্দু —

অর্থপ্রকৃতির পাঁচটি উপাদানের মধ্যে বিন্দু হ'ল দ্বিতীয় উপাদান। নাট্যের ইতিবৃত্ত কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লে তাকে পুনরায় মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে নাট্যবৃত্তকে যা অগ্রগতির দিকে নিয়ে যায় তাকে বলে বিন্দু।[৫৮] সাহিত্যদর্পণকার বিন্দুর আলোচনা প্রসঙ্গে ধনঞ্জয়ের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। আচার্য ভরত মনে করেন যে নাট্যের কার্য কোন কারণে ব্যাহত হ'লে বিন্দু তাকে মূল প্রবাহে ফিরিয়ে আনে।[৫৯] ধণিক একটি উপমার সাহায্যে আলোচ্য বিষয়টিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে জলে একবিন্দু তেল ফেলে দিলে সেই তেল যেমন অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ে, সেইরূপ নাটকীয় বিন্দুর সাহায্যে ঘটনার তাৎপর্য বহুদূর বিস্তৃতিলাভ করে।[৬০] সাগরনন্দী মনে করেন যে রূপকে প্রতি অঙ্কে ও প্রতি সন্ধিতে বিন্দু থাকা দরকার।

সাহিত্যদর্পণকার "রত্নাবলী" থেকে বিন্দুর উদাহরণটি সংকলন করেছেন। বাসবদত্তা মদনপূজা করছেন। এমন সময় সেই পূজাস্থলেই সাগরিকা কর্তৃক বৎসরাজ উদয়ন প্রথম দৃষ্ট হলেন। তখন সাগরিকা উদয়নকে কামদেব ব'লে মনে করেছিলেন। সাগরিকা নামে অবস্থিতা রত্নাবলীর সঙ্গে উদয়নের প্রেম ও পরিণয় হ'ল "রত্নাবলী" নাটিকার মূল ঘটনা। মদনপূজার আনুষঙ্গিক ঘটনা সরাসরিভাবে সেই প্রেমে সহায়ক হয়নি। তাই মদনপূজা পরিসমাপ্তির পর সেই কথার বিচ্ছেদ ঘটেছে। অথচ পরবর্তী ঘটনা উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার পরবর্তী প্রেমের সহায়ক হ'য়েছে। এজন্যই মদনপূজার ঘটনাটি "রত্নাবলী"

নাটিকার বিন্দু।

বিন্দু বিচ্ছিন্ন ঘটনার পুনর্ঘটনের আকাংক্ষা জাগিয়ে তোলে এবং এরপর মুখ্য ঘটনাপ্রবাহ দ্রুততর হয়। বিন্দুর জন্যই নাটকীয় মুখ্য বিষয়টি বিশৃংখল হ'তে পারে না। বহু ঘটনার সমাবেশ হ'লেও ঘটনার ঐক্য ও সংহতি বর্তমান থাকে। Unity of action-এর এটি একটি অমোঘ উপায়।

পতাকা —

নাটকীয় ঘটনাকে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। সেজন্য নাটকীয় কার্যসিদ্ধির পথ সুগম করার জন্য অবান্তর বা প্রাসঙ্গিক ঘটনার অবতারণা করতে হয়। এই প্রাসঙ্গিক ঘটনাকেই পতাকা বা প্রকরী বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক ঘটনা যখন বহুদূর বিস্তৃত হয় তখন তাকে পতাকা বলে।[৬১] নাট্যশাস্ত্রকারের মতে যে বিষয় অপর বিষয়ের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত এবং প্রধান ইতিবৃত্তের উপকারক হয় ও প্রধান বিষয়ের মত পরিকল্পিত হয় তাকেই বলা হয় পতাকা।[৬২]

পতাকা মূল নায়কেরই প্রয়োজন সাধন করে; পতাকা অংশের নায়কের প্রয়োজন সাধন করে না। আচার্য বিশ্বনাথের মতে "রামচরিত" নাটকে সুগ্রীবের ঘটনা হ'ল পতাকা, আর সুগ্রীব পতাকা নায়ক। বালি বধ হ'য়েছে। সুগ্রীব রাজ্যে অভিষিক্ত হ'য়েছে। সুতরাং পতাকানায়ক সুগ্রীব তার ফল পেয়ে গেছে কিন্তু আখ্যানে সুগ্রীব চরিত্র এখানে শেষ হয়ে যায়নি। সীতা উদ্ধার পর্যন্ত সুগ্রীবের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ইতিবৃত্তের মূল নায়ক রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধাররূপ ফলপ্রাপ্তি হলে তবেই সুগ্রীবের কাজ শেষ হবে। তাই সুগ্রীব চরিত্রটি রূপকের নির্বহণ সন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত। ভরতের মতে পতাকানায়কের ফল গর্ভ বা বিমর্শসন্ধিতে শেষ হয়। কিন্তু অভিনবগুপ্ত মনে করেন যে পতাকানায়কের চরিত্র নির্বহণ সন্ধি পর্যন্ত থাকবে।

প্রকরী —

প্রকরী হ'ল নাটকের অংশবিশেষে স্থিত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।[৬৩] প্রকরী একদেশস্থ ব'লে সংক্ষিপ্ত

এবং এতই সংক্ষিপ্ত যে এতে কোন চরিত্রের কোন নিজস্ব প্রয়োজন চরিতার্থ হয় না।[৬৪] নাট্যশাস্ত্রকারের মতে যার শুধু ফল সজ্জনগণ কর্তৃক আধিকারিক ইতিবৃত্তের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতা নেই তা প্রকরী নামে নির্দিষ্ট হবে।[৬৫]

প্রকরীর উদাহরণ ''কুলপত্যঙ্কে'' রাবণ ও জটায়ুর কথাবার্তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। জটায়ুর ঘটনা নাটকের সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। কিন্তু সুগ্রীব প্রভৃতি পতাকা চরিত্র নাটকের নির্বহন সন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হ'তে পারে। পতাকা অংশের নায়কের মত প্রকরী অংশের নায়কও নাটকের মূল নায়কের ফলসাধক হয়।

কার্য —

পাঁচপ্রকার অর্থপ্রকৃতির মধ্যে শেষ অর্থপ্রকৃতির নাম কার্য। নাটকমাত্রেরই একটি মুখ্য ফল বা উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যই হ'ল নাটকের কার্য। নাটকে যে বস্তু আকাংক্ষিত, যে বস্তু সাধ্য অর্থাৎ প্রধানরূপে প্রতিপাদ্য, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাটক আরম্ভ হ'য়েছে এবং যার সাফল্যে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে তাকেই বলে কার্য।[৬৬] নাট্যশাস্ত্রকার এ প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করলেন যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা যে আধিকারিক বস্তু যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় তার জন্য সমারম্ভই কার্য ব'লে কথিত হয়।[৬৭] মোদ্দা কথা হ'ল সমগ্র নাটক জুড়ে যে ফলটাকে দেখতে চাওয়া হয়, তাকেই বলে কার্য। ''রামচরিত'' নাটকের শুরু থেকেই রাবণবধের প্রস্তুতি নেওয়া হ'য়েছে এবং রাবণবধের পরেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাই ''রামচরিতে'' রাবণবধই হ'ল কার্য।

দশরূপককার ধনঞ্জয় নাটকের ফলকেই কার্য বলেছেন। তাঁর মতে কার্য বা ফল ত্রিবর্গসমন্বিত। তা শুদ্ধ, এক বা অনেকানুবন্ধী হ'তে পারে।[৬৮] এখানে ত্রিবর্গ হ'ল ধর্ম, অর্থ ও কাম। কোন নাটকে কেবল ধর্মকে, কোন নাটকে অর্থকে, আবার কোন নাটকে কামকে ফল হিসাবে দেখানো হ'তে পারে। আবার কোন নাটকে ধর্ম ও অর্থকে,বা অর্থ ও কামকে অথবা ধর্ম-অর্থ-কামকে যুক্তভাবে ফল বা কার্য হিসাবে দেখানো হ'তে পারে। যদি ত্রিবর্গের কোন একটি বিষয়কে ফল বা কার্য হিসাবে দেখানো হয় তবে তাকে বলে শুদ্ধ কার্য; আর ত্রিবর্গের দুটি বা তিনটিকে যুক্তভাবে যদি ফল বা কার্য হিসাবে দেখানো হয় তবে তাকে বলা হয় অনুবন্ধ।

নাটকীয় ইতিবৃত্তের এই পাঁচটি উপাদানকে আলংকারিক ভাষায় বলা হয় অর্থপ্রকৃতি। অর্থপ্রকৃতি শব্দের 'অর্থ' বলতে যদি আমরা বুঝি প্রয়োজন, আর 'প্রকৃতি' বলতে যদি আমরা বুঝি হেতু তাহলে অর্থপ্রকৃতি বলতে 'প্রয়োজন সিদ্ধির হেতু' এরূপ অর্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু অর্থপ্রকৃতি শব্দের 'অর্থ' বলতে আমরা যদি বুঝি বিষয়; আর 'প্রকৃতি' বলতে যদি বুঝি উপাদান তাহলে অর্থপ্রকৃতি শব্দের অর্থ দাঁড়ায় বিষয়বস্তুর উপাদান। এরকম অর্থ করলে আর কোন সমস্যা থাকে না। কারণ প্লট বা বিষয়বস্তুর বীজ, বিন্দু প্রভৃতির মত কার্যও একটি অঙ্গ। এই পাঁচটি উপাদান নাটকের মুখ্য প্রয়োজন চরিতার্থ করে ব'লে এদের নাম অর্থপ্রকৃতি। কার্য বা ফললাভের জন্যই অন্য অর্থপ্রকৃতিগুলির প্রয়োজন হয়।

অবস্থা

নাটকীয় কাহিনী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অগ্রসর হয়। দৃশ্যকাব্যে যেহেতু বিষয়বস্তুটিকে দেখাতে হয় সেজন্য মুখ্যফললাভের উদ্দেশ্যে পাত্র-পাত্রীগণের উদ্যোগ, গতি ও ক্রিয়ায় প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই গতি শুধুমাত্র নিয়ম-নির্দিষ্ট যান্ত্রিক গতি নয়, এই গতি বৈচিত্র্যময় ও প্রাণবন্ত। এই গতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল পরিবর্তনের পথে অবস্থান্তর প্রাপ্তি। আবার এমনও বলা যায় যে ঈপ্সিত ফললাভের জন্য রূপকের নায়ককে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। নায়কের এই প্রচেষ্টা বা কার্যের পাঁচটি স্তর বা stage কে বলা হয় কার্যাবস্থা। নাটকের কার্যাবস্থা নাটকের কাংক্ষিত ফললাভকে ত্বরান্বিত ক'রে তোলে এবং নাটককে গতিশীল ক'রে তোলে। নাটকীয় এই গতির পাঁচটি অবস্থা। যথা – ১) প্রারম্ভ, ২) প্রযত্ন ৩) প্রাপ্ত্যাশা, ৪) নিয়তাপ্তি এবং ৫) ফলযোগ বা ফলাগম।[৬৯] এপ্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রকারের অভিমত হ'ল যে, উদ্দিষ্ট ফলের জন্য নায়কের যে চেষ্টা তার সঙ্গে প্রযোক্তৃগণের পাঁচটি অবস্থা যুক্ত করা উচিত।[৭০]

প্রারম্ভ বা আরম্ভ — আরম্ভ হ'ল নাটকীয় গতির প্রথম অবস্থা। এ অবস্থাতেই নাটকীয় বীজ উপ্ত হয় এবং বিশেষ ফললাভের জন্য সাধারণ ঔৎসুক্য বা অভিলাষ প্রকাশ পায়।[৭১] সাহিত্যদর্পণকার একইরকমভাবে বললেন যে প্রধান ফলসিদ্ধির জন্য যে ঔৎসুক্য তাকেই বলে আরম্ভ।[৭২] আচার্য ভরত "আরম্ভ" নামক কার্যাবস্থা সম্পর্কে জানালেন যে মহাফললাভের বীজ সম্বন্ধে শুধু যে ঔৎসুক্য জন্মায় তাই হ'ল আরম্ভ।[৭৩] সাগরনন্দীর মতে বীজ সম্পর্কে ঔৎসুক্যের সূচনাই আরম্ভ।[৭৪] দশরূপকের টীকাকার ধনিক ঔৎসুক্য পদটির দ্বারা কেবলমাত্র কার্য্য-সাধনের ইচ্ছাকেই বোঝেননি। তিনি মনে করেন যে কার্য্য-সাধনের জন্য যে প্রচেষ্টা দরকার সেটিও ঔৎসুক্য।[৭৫]

"রত্নাবলী" নাটিকায় রত্নাবলীর সঙ্গে বৎসরাজ উদয়নের পরিণয় হ'ল নাটিকার প্রধান ফল। উদয়ন ও রত্নাবলীর মধ্যে পারস্পরিক প্রণয় সৃষ্টি না হ'লে ঐ বিবাহ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রণয় ঘটাতে গেলে উভয়ের সাক্ষাৎকার প্রয়োজন। রত্নাবলী যদি মহারাজ উদয়নের অন্তঃপুরে না আসে তাহলে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না। তাই উদয়নের অন্তঃপুরে রত্নাবলীর স্থানলাভ থেকেই নাটিকার প্রধান বস্তুর সূচনা ঘটেছে। "রত্নাবলী" নাটিকার অন্যতম প্রধান চরিত্র যৌগন্ধরায়নের ঔৎসুক্য ও প্রচেষ্টা কার্য্যের প্রথম অবস্থা। বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ন নাটিকার কার্যকে সিদ্ধ করেছে। সেজন্য যৌগন্ধরায়নের প্রচেষ্টাই নাটিকার আরম্ভ অংশ।

প্রযত্ন — প্রযত্ন হ'ল নাটকীয় ক্রিয়ার দ্বিতীয় অবস্থা। নায়ক-নায়িকার ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তির ব্যাপারবিশেষ হ'ল এই প্রযত্ন। ফলপ্রাপ্তির পথে বাধা বা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হ'লে সেই ফললাভের জন্য তীব্র আকাংক্ষা ও প্রয়াস দেখা যায়। আলংকারিকগণ নাটকীয় গতির এই দ্বিতীয় অবস্থাকে বলেছেন প্রযত্ন।[৭৬] সাহিত্যদর্পণকার ও দশরূপককার প্রায় একইরকমভাবে বললেন যে ফলের অপ্রাপ্তিতে ফললাভের জন্য ত্বরান্বিত ব্যাপার প্রযত্ন নামে কথিত।[৭৭] সাগরনন্দীর মতে ফলপ্রাপ্তির অভাববশতঃ সেই বিষয়ে নায়ক বা নায়িকার উদ্যমই হল প্রযত্ন।[৭৮] আরম্ভের সঙ্গে প্রযত্নের একটা মূলগত পার্থক্য আছে যদিও উভয়ক্ষেত্রেই মুখ্যফলসিদ্ধির জন্য ঔৎসুক্য দেখা যায়। আরম্ভে কেবল ঔৎসুক্য বা ইচ্ছা থাকে। কিন্তু প্রযত্নে সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য অতিত্বরান্বিত একটি প্রচেষ্টা থাকে।[৭৯]

আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর "সাহিত্যদর্পণ" গ্রন্থে প্রযত্নের দুটি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথমটি "রত্নাবলী" নাটিকা থেকে এবং দ্বিতীয়টি "রামচরিত" থেকে। "রামচরিত" নাটকের মুখ্য ফল হ'ল বারণবধ ও সীতা উদ্ধার। সীতা উদ্ধার করার জন্য ও রাবণবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্র – বন্ধনরূপ প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। সেই কার্য্যের জন্য আরম্ভ অংশে যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি হ'য়েছিল প্রযত্ন নামক দ্বিতীয় কার্য্যে তা বাস্তবায়িত করার জন্য অতিত্বরান্বিত প্রচেষ্টা যুক্ত হ'ল। তাই সেতুবন্ধন প্রযত্ন নামক দ্বিতীয় কার্য্যের উদাহরণ।

প্রাপ্ত্যাশা — নাটকীয় গতির তৃতীয় অবস্থা হ'ল প্রাপ্ত্যাশা। এই অবস্থায় বারংবার উপায় এবং অপায় (বিঘ্ন), আশা এবং নিরাশার মধ্যে দিয়ে রূপকের ঘটনাস্রোত অগ্রসর হ'তে থাকে এবং অবশেষে ফলপ্রাপ্তির অনুকূল অবস্থা ও সম্ভাবনা দেখা যায়।[৮০] ধনঞ্জয়ের এই মতটিকেই হুবহু গ্রহণ করেছেন আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর "সাহিত্যদর্পণ" গ্রন্থে। নাট্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত্যাশাকে বলা হ'য়েছে 'প্রাপ্তিসম্ভব'।[৮১] নাট্যশাস্ত্রের মতকে সংক্ষিপ্ত আকারে সাগরনন্দী উপস্থাপিত ক'রে বলেছেন যে কেবলমাত্র ভাবে অর্থাৎ মনে মনে ফলের যে প্রাপ্তি তাই প্রাপ্তিসম্ভব।[৮২]

"রত্নাবলী" নাটিকার তৃতীয় অঙ্ক থেকে বিশ্বনাথ প্রাপ্ত্যাশার উদাহরণ দিয়েছেন। সাগরিকা নামে অবস্থিতা রত্নাবলী পরিধান করেছেন বাসবদত্তার বেশ। অভিপ্রায় হ'ল রাজা উদয়নের সঙ্গে মিলন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর অভিসার। এই অভিসারই হ'ল বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে রত্নাবলীর মিলনের একমাত্র উপায়। কিন্তু এই মিলনের মাঝখানে যদি বাসবদত্তা এসে উপস্থিত হয় তাহলে তো উদয়নের সঙ্গে রত্নাবলীর মিলন বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাই অভিসার করলেও উদয়নের সঙ্গে রত্নাবলী মিলনের ফল পাবে

কিনা তা অনিশ্চিত হ'য়ে পড়ে। মনের মধ্যে দোলায়মান হয় উভয়ের মিলন ফলপ্রসূ হবে, না বিঘ্নিত হবে। এই অনিশ্চয়তা, এই দোলায়মান অবস্থার জন্যই এটি প্রাপ্ত্যাশার উদাহরণ।

নিয়তাপ্তি — নাটকীয় গতির চতুর্থ অবস্থা হ'ল নিয়তাপ্তি। প্রাপ্ত্যাশায় ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিলেও পুনরায় বিঘ্ন বা সংকট উপস্থিত হয়। তাই প্রাপ্ত্যাশাতে ফলপ্রাপ্তি হ'তেও পারে আবার নাও হ'তে পারে এরূপ সংশয় থাকে। নিয়তাপ্তিতে নিয়ত অর্থাৎ নির্দিষ্টরূপে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য বলা যায় যে নিয়তাপ্তি হ'ল বাধার অভাবে ফলাগমের নিশ্চয়তার অবস্থা।[৮৩] মহর্ষি ভরত নিয়তাপ্তি বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন যে যাতে ভাবের দ্বারা নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তি দেখা যায়, গুনযুক্ত সেই প্রাপ্তিকে নিয়তা ফলপ্রাপ্তি বলে।[৮৪] সাহিত্যদর্পণে নিয়তাপ্তি প্রসঙ্গে ধনঞ্জয়ের কথাই প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে। রূপগোস্বামী "নাটকচন্দ্রিকা"য় আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন যে প্রাপ্ত্যাশার মধ্যে উপায় এবং অপায়ের যে সংঘাত দেখা দেয় নিয়তাপ্তিতে সেই অপায়ের নিরসন ঘটিয়ে কার্যসিদ্ধি বা ফলপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।[৮৫]

বিশ্বনাথ "রত্নাবলী" নাটিকা থেকে নিয়তাপ্তির উদাহরণ দিয়েছেন। "রত্নাবলী" নাটিকার মুখ্যফল হ'ল বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে রত্নাবলীর মিলন। এই মিলনে বিঘ্ন হয়ে দেখা দিলেন বাসবদত্তা। কারণ আলোচ্য নাটিকার তৃতীয় অঙ্কে সংকেতস্থানে অবগুণ্ঠনবতী বাসবদত্তার কাছে রাজা ধরা পড়লেন। সাগরিকার সঙ্গে উদয়নের প্রণয়ের কথা ফাঁস হ'য়ে গেল। এমন অবস্থায় বিদূষক মন্তব্য করলেন যে এখন সাগরিকার বেঁচে থাকাই দুষ্কর। তখন তিনি রাজার কাছে পরবর্তী কর্তব্য জানতে চাইলে রাজা উদয়ন জানালেন যে বাসবদত্তার অনুগ্রহই সংকটমোচনের একমাত্র উপায়। রাজার এই উক্তিতে এটাই সূচিত হ'চ্ছে যে দেবী প্রসন্ন হ'লে সমস্ত বিঘ্ন দূর হ'য়ে নিশ্চিত ফললাভ ঘটবে। এভাবেই রত্নাবলীর উক্ত অংশটি নিয়তাপ্তি নামক চতুর্থ কার্যাবস্থাকে সূচিত করেছে।

ফলযোগ বা ফলাগম — নাটকীয় ক্রিয়ার সর্বশেষ অবস্থার নাম ফলযোগ বা ফলাগম। এই পর্যায়ে নাটকের মুখ্য ফল ও অন্যান্য ফলের আগম বা আবির্ভাব ঘটে। এই স্তরে সব রকমের প্রতিবন্ধকতা কোন না কোনভাবে দূরীভূত হয় এবং নায়কের সমস্ত প্রচেষ্টা ঈপ্সিত ফলের দ্বারা অন্বিত হয়। ফলাগমে কেবলমাত্র নাটকের মুখ্যফল অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার মিলনই ঘটে না, অন্য আরো নানা প্রকার আনুষঙ্গিক ফলপ্রাপ্তিও ঘটে।[৮৬] আচার্য ধনঞ্জয়ের মতে সমগ্র ফলসম্পত্তি লাভই হ'ল ফলযোগ।[৮৭] রূপগোস্বামীও প্রায় অনুরূপভাবেই বললেন যে, নিজের অভিলষিত ফলের যে প্রাপ্তি তাই ফলাগম নামে পরিগণিত।[৮৮]

"রত্নাবলী" নাটিকার চতুর্থ অঙ্কে মহারাজ উদয়নের সঙ্গে নায়িকা রত্নাবলীর মিলন হ'য়েছে। সেই সঙ্গে উদয়নের সঙ্গে রত্নাবলীর বিবাহ হওয়ায় তিনি রাজচক্রবর্তী হয়েছেন। সুতরাং মহারাজ উদয়নের সঙ্গে রত্নাবলীর মিলন মুখ্যফল এবং রাজা উদয়নের রাজচক্রবর্তী হওয়া আনুষঙ্গিক ফল। এভাবেই নাটিকায় ফলযোগ বা ফলপ্রাপ্তি ঘটেছে। আবার "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের সপ্তম অঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে পত্নী হিসাবে ফিরে পেয়েছেন। আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে পেয়েছেন পুত্র সর্বদমনকে। এভাবেই উক্ত দুই রূপকে মুখ্যফল ছাড়া অন্যান্য ফলপ্রাপ্তিও ঘটেছে।

সন্ধি

নাট্যবস্তু নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। এই অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে কতকগুলি ধাপ বা স্তর আছে। এই এক একটি ধাপ বা স্তরই হ'ল সন্ধি। 'সন্ধি' শব্দের অর্থ হ'ল সংযোগ। এটি একদিকে যেমন সন্ধির সঙ্গে সন্ধিফলের অন্যদিকে তেমনি সন্ধিফলের সঙ্গে সামগ্রিক মুখ্যফলের সংযোগ। সন্ধিহীন শরীর যেমন বিকলাঙ্গ, তেমনি সন্ধিহীন নাটকও অসম্ভব। নাটকের কাহিনীসূত্র যাতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে না পড়ে সেজন্যই নাটকে সন্ধির প্রয়োজন অপরিহার্য।

বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং কার্য্য – এই পাঁচপ্রকার অর্থপ্রকৃতির সঙ্গে আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম নামক পাঁচটি কার্যাবস্থা ক্রমান্বয়ে যোগ করলে পঞ্চসন্ধির উদ্ভব হয়।[৮৯] অর্থাৎ বীজ নামক প্রথম অর্থপ্রকৃতির সঙ্গে আরম্ভ নামক প্রথম কার্যের যোগের ফলে যে নাট্যভাগের উদ্ভব হয় তার নাম হ'ল মুখসন্ধি। অনুরূপভাবে বিন্দুর সঙ্গে প্রযত্নের, পতাকার সঙ্গে প্রাপ্ত্যাশার, প্রকরীর সঙ্গে নিয়তাপ্তির এবং কার্যের সঙ্গে ফলাগমের সংযোগে যথাক্রমে প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ বা অবমর্শ এবং নির্বহন সন্ধির উদ্ভব ঘটে। এটাই হ'ল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কোন একটি অঙ্গ না থাকলেও অন্য অর্থপ্রকৃতির সঙ্গে সেই জাতীয় কার্য্যের মিলনে সন্ধিগুলি হ'য়ে যাবে। সেজন্য "নাটকচন্দ্রিকা" গ্রন্থে বলা হ'য়েছে যে পতাকার অবস্থান কোথাও হ'তে পারে, আবার না হ'তেও পারে। কিন্তু যেখানে পতাকার অবস্থান হবে না, সেখানে বীজ ও বিন্দুর নিবেশ কর্তব্য।[৯০]

নাটকের প্রস্তাবনা অংশ নাটকের কোন সন্ধি নয়। কারণ প্রস্তাবনা অংশে নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর সূচনা ঘটলেও এই সূচনা অংশের সঙ্গে নাটকের মুখ্য প্রয়োজনের কোন যোগ থাকে না। তাছাড়া এটি নাটকের কার্যসিদ্ধিরও সহায়ক নয়।

সাগরনন্দী মূল ইতিবৃত্তের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সংযোগকে সন্ধি বলেছেন।[৯১] দশরূপককার ধনঞ্জয় এ প্রসঙ্গে বলেন যে পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি পঞ্চ অবস্থা সমন্বিত হ'য়ে যথাক্রমে মুখ প্রভৃতি পাঁচটি সন্ধিতে পরিণত হয়।[৯২]

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সন্ধির সঙ্গে অর্থপ্রকৃতির এবং অবস্থার সংযোগের কথা বলেছেন। কিন্তু আচার্য বিশ্বনাথ সন্ধির সঙ্গে অবস্থার সংযোগের কথা উল্লেখ করলেও সন্ধির সঙ্গে অর্থপ্রকৃতির যোগের কথা

বলেননি।[৯৩]

নাট্যসাহিত্যের ধারা পার্বত্য নদীর মত। এই্ ধারার এক একটি বাঁক এক একটি সন্ধি। নাটকীয় গতিতে এই্ ধারার এক একটি বাঁক এক একটি সন্ধি। নাটকীয় গতিতে ছোট-বড় বহু বাঁক। এদের প্রধান পাঁচটি বাঁকই 'পঞ্চসন্ধি'।

সন্ধির ভেদ পাঁচপ্রকার। যথা – ১) মুখ, ২) প্রতিমুখ, ৩) গর্ভ, ৪) বিমর্ষ বা অবমর্শ, ৫) উপসংহৃতি বা নির্বহণ[৯৪]।

মুখসন্ধি — যেখানে 'আরম্ভ' নামক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে নানা বৃত্তান্ত ও রসসম্ভাবনাযুক্ত বীজের উৎপত্তি হয় তাকেই বলে মুখসন্ধি।[৯৫] এখানে মুখ' শব্দের অর্থ আরম্ভ। সুতরাং বলা যায় যে এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে নাটকের শুরু। নাট্যের এই্ অংশে নাট্যকার বীজের উপন্যাস এবং বিভিন্ন বিষয় ও ভাবের অবতারণা করেন। নাট্যের এই্ অংশে কিছু মুখ্য নাটকীয় চরিত্র উপস্থাপিত হয় এবং নাট্যের মূল অভিপ্রায়কে সম্মুখে চালিত করে। সোজা কথায় বলা যেতে পারে যে ১) 'মুখসন্ধি' অংশে নাটকের বীজ উপন্যস্ত হয়; ২) উদ্ভূত বীজ নানা প্রয়োজন ও রসের হেতু হ'য়ে থাকে এবং ৩) নাটকের এই্ অংশ প্রারম্ভ অবস্থাযুক্ত। নাট্যশাস্ত্রে মুখসন্ধি সম্পর্কে বলা হ'য়েছে যে দৃশ্যকাব্যের যেখানে বিবিধ বিষয় ও রস থেকে উদ্ভূত বীজোৎপত্তি হয় তা শরীরের মতই মুখ নামে কথিত। অর্থাৎ শরীরে যেমন মুখ প্রধান অঙ্গ, তেমনি নাট্যের ইতিবৃত্তরূপ শরীরে মুখ প্রথম ও প্রধান সন্ধি।[৯৬]

মহাকবি কালিদাস রচিত ''অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'' নাটকের মুখসন্ধি অংশটি কিভাবে প্রযুক্ত হ'য়েছে এপ্রসঙ্গে তা আলোচনা করা যাক্। এই্ নাটকের কার্য বা ফল হ'ল দুষ্যন্ত – শকুন্তলার স্থায়ী দাম্পত্য মিলন। সুতরাং নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য মিলনের জন্য তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক অনুরাগ উৎপত্তির প্রয়োজন। এই অনুরাগই মুখ্য ফললাভের প্রধান উপায় অর্থাৎ বীজ। এই অনুরাগ উন্মেষের সম্ভাবনা যেখানে প্রথম সূচিত সেখানেই নাটকীয় বীজ উপন্যস্ত।

মৃগয়ামান অবস্থায় দুষ্যন্তের প্রবেশ থেকে কণ্বের আশ্রম অভিমুখে গমন পর্যন্ত যেসব ব্যাপার তা বীজবপনের পূর্বে বিশেষ আয়োজনের নিদর্শন। কিন্তু শকুন্তলার আতিথ্য গ্রহণের জন্য আশ্রমদ্বারে প্রবেশ করতেই যখন দুষ্যন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হ'ল তখন তিনি বললেন – ''শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ

বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য'' — এখানেই নাটকের বীজ উপ্ত হ'য়েছে। বাহুস্পন্দনের পরিণতি দেখার জন্য দর্শকচিত্ত কৌতূহলী হ'ল; রাজাও আশ্রমে প্রবেশ করলেন স্ত্রীরত্নলাভের চেতনা নিয়ে। রাজার আকস্মিক এই বাহুস্পন্দনে ও উক্তিতে এটুকু আভাস পাওয়া যায় যে নাটকের বিষয়বস্তু ও রস হবে শৃংগার। এরপর হস্তিবৃত্তান্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম অঙ্কের যেসব ঘটনা তাতে নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক অনুরাগ অর্থাৎ মুখ্য ফললাভের জন্য ঔৎসুক্য কোথাও স্পষ্টভাবে আবার কোথাও অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এটাই নাটকীয় ক্রিয়ার আরম্ভ নামক অবস্থা। অতএব হস্তিবৃত্তান্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম অঙ্কের যে অংশ তাই মুখসন্ধি।

প্রতিমুখ সন্ধি — সন্ধির দ্বিতীয় ভেদ প্রতিমুখসন্ধি। যা মুখসন্ধির প্রতিকূল তাই প্রতিমুখ। মুখসন্ধিতে উপন্যস্ত, মুখ্যফলের প্রধান হেতুভূত বীজ রূপকের যে অংশে কখনও লক্ষিতভাবে আবার কখনও অলক্ষিতভাবে বিকাশলাভ করে তাই প্রতিমুখসন্ধি।[৯৭] সাহিত্যদর্পণকার এপ্রসঙ্গে বলেন যে মুখসন্ধিতে সন্নিবিষ্ট মুখ্য ফললাভের উপায় কিছুটা লক্ষিত ও কিছুটা অলক্ষিত হ'য়ে যেখানে প্রথম প্রকাশিত হয় তাকে প্রতিমুখ সন্ধি বলে।[৯৮] আর রূপ গোস্বামীর মতে প্রতিমুখ সন্ধি হ'ল দৃশ্য ও অদৃশ্য বীজের প্রকাশ।[৯৯]

এই সন্ধিতে প্রতিকূল অবস্থার অবতারণার ফলে বীজ বারংবার প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। কখনও মনে হয় যে বীজটি বোধহয় একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেল; আবার কখনও মনে হয় যে নষ্ট প্রায় বীজটি অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে প্রকাশমান হচ্ছে এবং তার বিকাশের জন্য প্রযত্ন দেখা যায়। এই সন্ধিতে নায়ক-নায়িকা ফললাভের জন্য অধিকতর উৎসুক ও সচেষ্ট হয়। কিন্তু সাফল্য সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ, উদ্বেগ ও নৈরাশ্য জাগে। ধনিক প্রতিমুখ সন্ধিতে নাটকীয় প্রধান ফলের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট এই মিশ্র ভাবের উপর জোর দিয়েছেন।[১০০]

প্রতিমুখ সন্ধির বৈশিষ্ট্য হ'ল বিষয়বস্তুর সূচনা, প্রতিকূল বিষয়ের অবতারণা ও নাটীকয় বীজের লক্ষ্যালক্ষ্যতা। এই সন্ধির অর্থপ্রকৃতি হ'চ্ছে 'বিন্দু' এবং অবস্থা হ'ল 'প্রযত্ন'। ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকের প্রথম অঙ্কে হস্তিবৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ান্তর সূচিত হ'ল। নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক অনুরাগ যখন গভীরতর হ'য়ে উঠছিল, ঠিক সেই সময় ভীতচকিত হস্তীর আলোড়নে সব টলমল ও বিশৃংখল হ'য়ে গেল। অনুরাগ বীজটি চাপা পড়ল। নায়ক-নায়িকার মিলনের পথে হতাশা সৃষ্টি হ'ল। তারপর দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় যে মহারাজ মৃগয়া বন্ধ করলেন। এই বন্ধ কেবল বিদূষকের অনুরোধে নয়; মৃগয়াতেই রাজার যেন তেমন উৎসাহ নেই। কারণ মৃগশিকার করতে গেলেই মৃগনয়না শকুন্তলাকে তাঁর

মনে পড়ে। সুতরাং অদৃশ্য বীজটি যেন আবার কিঞ্চিৎ দৃশ্য হয়। কিন্তু 'রাক্ষসবৃত্তান্ত' রাজার শৃংগার চিন্তার পথে আবার বাধা হ'য়ে দাঁড়াল। রাজকর্তব্য প্রণয়ীর কর্তব্যের পথরোধ ক'রে দাঁড়াল। ঠিক এই সময়ে রাজার আর একটি কর্তব্যও উপস্থিত হল। এই কর্তব্যটি হ'ল পুত্র-কর্তব্য। মায়ের ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে তাঁকে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হ'তে হবে। তিনি মায়ের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য বিদূষককে প্রতিনিধিরূপে পাঠালেন। রাক্ষসবধের জন্য উদ্যোগী হ'য়ে রাজকর্তব্য পালন করলেন। এইভাবে যে মুখ্যপ্রসঙ্গটি চাপা পড়েছিল তা পুনরায় সূচিত হ'ল যখন বিদূষক বললেন — "অনবাপ্তচক্ষুঃ ফলোঽমি।" তাই এই উক্তি প্রতিমুখসন্ধির বিন্দু। আশুফলপ্রাপ্তির জন্য যে প্রচেষ্টা তাই 'প্রযত্ন'।

গর্ভসন্ধি — নাটকের তৃতীয় পর্ব হ'ল গর্ভসন্ধি। যে সন্ধি নাটকীয় ফলকে গর্ভে ধারণ ও পোষণ করে তারনাম হ'ল গর্ভসন্ধি।[১০১] মাতৃগর্ভের মধ্যে শিশু যেমন লুকিয়ে থাকে গর্ভসন্ধিতেও তেমনি নাটকের মুখ্য ফল লুকিয়ে থাকে। প্রতিমুখ সন্ধিতে নাটকের মুখ্য ফল কিছুটা ব্যক্ত হয়, আবার কিছুটা অনুমান ক'রে নিতে হয়। কিন্তু গর্ভসন্ধিতে নাটকীয় ফলের সম্যক প্রকাশ ঘটে। আচার্য-বিশ্বনাথ গর্ভসন্ধির লক্ষণ নির্দিষ্ট করতে গিয়ে বললেন যে প্রতিমুখ সন্ধিতে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত বীজটি যে পুনঃপুনঃ হ্রাস ও অন্বেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাকে বলে গর্ভসন্ধি।[১০২] নাট্যশাস্ত্রেও বলা হ'ল যে, যে সন্ধিতে বীজের উন্মেষ, প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি ঘটে এবং পুনরায় অন্বেষণ হয় তা গর্ভসন্ধি নামে কথিত।[১০৩]

রূপকের এই অংশে ঘটনাস্রোত বারংবার বাঁক নেয় এবং প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে বীজের আবির্ভাব হয়, পুনরায় তা অন্তর্হিত হয়। সেই দৃষ্ট-নষ্ট বীজের জন্য অন্বেষণ চলে। তাই এই গর্ভসন্ধি হ'ল বীজের হ্রাসবৃদ্ধি, বিনাশ ও বিকাশের মিলনভূমি। এই সন্ধিতে নায়ক-নায়িকার সামনে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে নায়ক-নায়িকার উদ্বেগ বৃদ্ধি পায় এবং দর্শকের নাটকীয় উৎকণ্ঠা (Dramatic Suspense) বৃদ্ধি পায়। এইভাবেই গর্ভসন্ধিতে বারে বারে বিঘ্নের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটতে থাকে। নাটকের মুখ্যফল অন্তর্হিত হয়েছে ব'লে মনে হ'লেও সাফল্যের সম্ভাবনা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট হয়। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এই সন্ধিতে প্রাপ্ত্যাশা নামক কার্যাবস্থা এবং 'পতাকা' নামক অর্থপ্রকৃতি থাকা কাম্য। তবে ধনঞ্জয়ের মতে 'পতাকা' এই সন্ধিতে অপরিহার্য নয়।[১০৪]

"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের গর্ভসন্ধি পর্বটি তৃতীয় অঙ্কের প্রথম থেকে শুরু হ'য়ে পঞ্চম অঙ্কে দুষ্যন্তের প্রতি শকুন্তলার "যা হোক, যদি সত্যই পরস্ত্রীশংকায় আপনি এরূপ করছেন, তবে এই অভিজ্ঞান দ্বারা আপনার শঙ্কা দূর করছি" — এই উক্তিতে শেষ হ'য়েছে।[১০৫]

আলোচ্য নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে রাক্ষসবৃত্তান্তে নাটকের বীজ নষ্টপ্রায় মনে হ'য়েছিল। কিন্তু সেই রাক্ষসবৃত্তান্তই নায়ককে আশ্রমে প্রবেশ ও অবস্থানের অধিকার দিয়ে নাটকীয় বীজের উদ্ভিন্ন হবার সুযোগ সৃষ্টি করল। তৃতীয় অঙ্কের গোড়াতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। রাক্ষস বিতাড়নের পর ঋষিগণ রাজাকে কিছুদিন আশ্রমে বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করেছেন। রাজাও কর্মহীন অবস্থায় আশ্রমে থেকে শকুন্তলার চিন্তায় মগ্ন হ'য়েছেন এবং শকুন্তলাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন। তাই নাটকীয় বীজটি আবার দেখা গেছে। দর্শকচিত্তেও আশা জেগেছে। পুনরায় শকুন্তলার অসুস্থতা নৈরাশ্য জাগিয়েছে। পরক্ষণেই রাজা যখন শুনেছেন যে শকুন্তলার অসুখ তাঁরই জন্য, তখন আবার আশার সঞ্চার হ'য়েছে। এরপর শকুন্তলাকে তিনি কাছে পেয়েছেন। কিন্তু গৌতমীর উপস্থিতিতে পুনরায় নায়ক-নায়িকার ব্যবধান তৈরী হ'য়েছে। তথাপি উভয়ের অনুরাগ পূর্ণমাত্রায় যখন প্রকাশ পায়, তখন ফলপ্রাপ্তির আশা সঞ্চারিত হয়। কিন্তু দুর্বাশার অভিশাপে সমস্ত আশা নিমেষে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। তবে একটু ভরসা পাওয়া যায় এইটুকু জেনে যে অভিজ্ঞান দর্শনে অভিশাপ দূরীভূত হবে। কারণ শকুন্তলার কাছে দুষ্যন্তের অঙ্গুরীয়ক আছে। সুতরাং ফলপ্রাপ্তির আশাও আছে। মহর্ষি কণ্ব দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গান্ধর্বমতে বিবাহ অনুমোদন করবেন কিনা সে বিষয়েও আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু মহর্ষি তা অনুমোদন করেছেন এবং আনন্দের সঙ্গে কন্যাকে পতিগৃহে পাঠানোর ব্যবস্থাও করেছেন। সুতরাং প্রণয়-আকাশের দুর্যোগ আবার কেটে যায়। শকুন্তলা রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন। রাজা বিবাহের কথা স্মরণ করতে পারেন না। শকুন্তলাকেও চিনতে পারেন না। তথাপি আশা আছে — অভিজ্ঞান দেখালেই রাজা চিনতে পারবেন। শকুন্তলা অঙ্গুরীয়ক দেখাতে উদ্যত হ'লেন। কিন্তু অঙ্গুরীয়ক নেই। অসহায় নায়িকার সঙ্গে দর্শকও অসহায় হয়। নাটকের মোড় ফেরে।

বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধি — নাটকের চতুর্থ সন্ধি হ'ল বিমর্ষ বা অমবর্ষ। বিমর্ষ শব্দের অর্থ বিশেষ চিন্তা বা হতাশা। এই সন্ধিতে নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণ বিশেষভাবে চিন্তান্বিত বা হতাশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েন। গর্ভসন্ধিতে নাটকের বীজটি যতটা উদ্ভাসিত হ'য়েছিল এই সন্ধিতে তা তদপেক্ষা আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। কিন্তু সেই প্রধান ফলটি অভিশাপ প্রভৃতি আকস্মিক উৎপাত বা অনর্থের ফলে অধিক পরিমাণে বিঘ্নিত হয়। মুখ্য ফললাভের পক্ষে এটাই অন্তিম বাধা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিঘ্ন দূরীভূত হয় এবং ফলপ্রাপ্তির পথ সুগম হয়। সাহিত্যদর্পণকার এপ্রসঙ্গে বলেন যে যেখানে মুখ্যফলের উপায় গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অধিক বিকশিত হয় এবং অভিশাপ প্রভৃতির দ্বারা সেই উপায় বিঘ্নিত হয় তাকেই বলে বিমর্ষসন্ধি।[১০৬] বিমর্ষ সম্পর্কে "নাটকলক্ষণরত্নকোশ" গ্রন্থে উল্লেখ্য কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে। মুখ্য কার্য যেখানে প্রায় সম্পন্ন হ'য়ে এসেছে অথচ কোন বিশেষ প্রসঙ্গে সে সম্পর্কে মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় তাকেই কেউ

কেউ বিমর্শ বলে জানেন।[১০৭] সাগরনন্দীর মতে বীজার্থের বিমর্শ ত্রিবিধ উপায়ে ঘটতে পারে – প্রলোভন থেকে উদ্ভূত, ক্রোধ থেকে জাত এবং বিপদ থেকে উৎপন্ন।[১০৮] রূপ গোস্বামী বিমর্শ সন্ধির লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন — যেখানে মুখ্যফলের উপায়টি অভ্যন্তর থেকে অধিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং শোভা, ভয়াদি দ্বারা ব্যবহিত হয় তার নাম বিমর্শ।[১০৯] দশরূপককার — 'বিমর্ষ' শব্দের স্থলে এই সন্ধির নামকরণ করেছেন অবমর্শ। প্রকরী নামক অর্থপ্রকৃতি এবং নিয়তাপ্তি নামক কার্যাবস্থার দ্বারা এই সন্ধি যুক্ত। তবে সমস্ত নাটকের অবমর্শ সন্ধিতে প্রকরী নামক অর্থপ্রকৃতি থাকে না, অন্যান্য সন্ধিতেও প্রকরীর উপস্থিতি দেখা যায়।

কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের পঞ্চম অঙ্কে "অঙ্গুরীয়ক-অন্তর্ধানের" সংবাদ থেকে ষষ্ঠ অঙ্কের শেষ পর্যন্ত বিমর্ষ সন্ধি বর্তমান। ফলপ্রাপ্তির শেষ ভরসা ছিল এই অঙ্গুরীয়ক। কিন্তু তার অন্তর্ধানই নাটকের অন্তিম বিঘ্ন হিসাবে দেখা দিল। এই অঙ্গুরীয়কের অভাবেই শকুন্তলা দুষ্যন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হন। তারপর ষষ্ঠ অঙ্কের আদিতে যখন অঙ্গুরীয়ক পাওয়া গেল তখন নায়কের স্মৃতি ফিরলেও নায়িকার অন্তর্ধান পরিলক্ষিত হ'ল। নায়ক অনুতপ্ত হ'লেন; বসন্তোৎসব বন্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু নায়কের অনুতাপের সংবাদ কে কিভাবেই বা নায়িকার কাছে পৌঁছে দেবে? সানুমতী সেই সংবাদ বহন করে আনলেন। তিনি জানালেন যে শকুন্তলা মারীচের আশ্রমে পুত্রসহ নিরাপদে আছেন এবং দেবতারাও শকুন্তলার স্বামীর সঙ্গে তাঁর মিলনের জন্য সচেষ্ট। তারপর ষষ্ঠ অঙ্কের শেষে দুষ্যন্তের স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ এল। দেবতারা অসুর নিধনের জন্য তাঁর সাহায্য চাইলেন। যে দেবতারা দুষ্যন্ত শকুন্তলার মিলনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা উপকৃত হ'লে নিশ্চয়ই আরও সচেষ্ট হবেন। ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে এই আশা জাগিয়েই ষষ্ঠ অঙ্কের পরিসমাপ্তি হয়। বিমর্ষ সন্ধিরও সমাপ্তি ঘটে।

নির্বহণ সন্ধি অথবা উপসংহৃতি বা উপসংহার সন্ধি — মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্ষ – এই চারটি সন্ধির কোনটিতেই নাটক তার মুখ্যফল লাভ করতে পারে না। নির্বহণ নামক সন্ধিতেই নাটকের এই চরম ফলপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। নাটকীয় ব্যাপার বা action এই সন্ধিতেই শেষ হয় ব'লে এর নাম নির্বহণ সন্ধি। এই সন্ধির অপর নাম উপসংহৃতি বা উপসংহার সন্ধি। এই সন্ধির লক্ষণ প্রসঙ্গে দশরূপককার বলেন যে মুখ প্রভৃতি সন্ধিতে প্রকীর্ণ বীজ যে স্থানে এসে সংহতভাবে এক নির্দিষ্ট অর্থে উপনীত হয় সেই সন্ধিকে বলে নির্বহন সন্ধি।[১১০] আচার্য বিশ্বনাথ এই সন্ধি সম্পর্কে ধনঞ্জয়কৃত লক্ষণেরই অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে যথাযথভাবে মুখাদি সন্ধিতে বিন্যস্ত বীজযুক্ত বিষয়সমূহ যখন একার্থে উপনীত হয়, তখন তাকে বলে নির্বহনসন্ধি।[১১১] 'নির্বহণ' শব্দটিকে ব্যাখ্যা ক'রে সাহিত্যদর্পণের টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

মহাশয় বললেন — "নির্বহতি মুখ্যফলং সম্পদ্যতে অস্মিন্নিতি নির্বহণম্।" "নাটকলক্ষণরত্নকোশে" মুখাদি সন্ধিচতুষ্টয়ে প্রস্তাবিত বীজাদি ব্যাপারের নিঃশেষে সমাপ্তিকে নির্বহণ সন্ধি বলা হ'য়েছে।[১১২] এই সন্ধির অর্থপ্রকৃতি 'কার্য' এবং অবস্থা 'ফলযোগ'।

"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের সমগ্র সপ্তম অঙ্কটিই নাটকের নির্বহণসন্ধি। একটি রাজচক্রবর্তী পুত্র লাভ কর'[১১৩] — একথা ব'লে নাটকের প্রথম অঙ্কে বৈখানসেরা রাজা দুষ্যন্তকে আশীর্বাদ ক'রেছিলেন। এটা নাটকের বীজ। বিভিন্ন সন্ধিতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নাট্যবীজটি রাজা দুষ্যন্তের স্ত্রী-পুত্রলাভের মাধ্যমে সার্থকতা পেয়েছে। এই সপ্তম অঙ্কে সব বিঘ্ন দূরীভূত হ'য়ে সমস্ত শক্তি সংহত হ'য়েছে এবং কার্যসিদ্ধি অর্থাৎ ভগবান কাশ্যপের আশ্রমে নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনের মধ্যে দিয়ে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

সন্ধ্যঙ্গ

মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ এবং নির্বহণ – এই পঞ্চসন্ধির আবার ৬৪ (চৌষট্টি) টি অঙ্গ আছে। এই ৬৪ প্রকার সন্ধ্যঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলে গবেষণাপত্রের কলেবর যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। তাই সংক্ষেপকরণের জন্য কেবলমাত্র সন্ধ্যঙ্গগুলির নাম উল্লেখ করা হ'ল।

মুখসন্ধির অঙ্গসংখ্যা — মুখসন্ধির অঙ্গসংখ্যা ১২টি। এ বিষয়ে সকল নাট্যশাস্ত্রকারগণই একমত। মুখসন্ধির এই বারোটি অঙ্গ হল —

১) উপক্ষেপ
২) পরিকর
৩) পরিন্যাস
৪) বিলোভন
৫) যুক্তি
৬) প্রাপ্তি
৭) সমাধান
৮) বিধান
৯) পরিভাবনা
১০) উদ্ভেদ
১১) করণ
১২) ভেদ[১১৪]

প্রতিমুখসন্ধির অঙ্গসংখ্যা ১৩টি। এই অঙ্গগুলি হ'ল —

১) বিলাস
২) পরিসর্গ
৩) বিধূত (বিধৃত)
৪) তাপন (তপন)
৫) নর্ম
৬) নর্মদ্যুতি

৭) প্রগমন

৮) বিরোধ

৯) পর্য্যুপাসন

১০) পুষ্প

১১) বজ্র

১২) উপন্যাস

১৩) বর্ণসংহার[১১৫]

গর্ভসন্ধির অঙ্গসমূহ — গর্ভসন্ধির অঙ্গসংখ্যা নিয়ে নাট্যতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে মতবৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। "নাট্যশাস্ত্র", "নাট্যদর্পণ", "নাটকলক্ষণরত্নকোশ" এবং "সাহিত্যদর্পণে" গর্ভসন্ধির তেরোটি অঙ্গ স্বীকৃত হ'য়েছে। যথা —

১) অভূতাহরণ

২) মার্গ

৩) রূপ

৪) উদাহরণ

৫) ক্রম

৬) সংগ্রহ

৭) অনুমান

৮) প্রার্থনা

৯) আক্ষিপ্ত

১০) তোটক

১১) অধিবল

১২) উদ্বেগ

১৩) বিদ্রব[১১৬]

ধনঞ্জয় 'প্রার্থনা' নামক সন্ধ্যঙ্গকে বাদ দিয়েছেন এবং গর্ভসন্ধির ১২টি অঙ্গ স্বীকার করেছেন।[১১৭] "নাট্যদর্পণের" মত দশরূপকের টীকাকার ধনিকও আক্ষিপ্ত, অধিবল, মার্গ, অভূতাহরণ এবং তোটক - এই পাঁচটি অঙ্গের প্রয়োগের উপর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।[১১৮]

বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধির অঙ্গসমূহ — প্রায় সমস্ত নাট্যতত্ত্ববিদ্ বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধির ১৩টি অঙ্গ স্বীকার করেছেন। কিন্তু অঙ্গগুলির নাম সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আচার্য ভরতের মতে এই সন্ধির তেরোটি অঙ্গ হ'ল —

১) অপবাদ
২) সংফেট
৩) অভিদ্রব
৪) শক্তি
৫) ব্যবসায়
৬) প্রসঙ্গ
৭) দ্রুত
৮) খেদ
৯) নিষেধন
১০) বিরোধন
১১) আদান
১২) সাদন
১৩) প্ররোচনা[১১৯]

দশরূপককার ধনঞ্জয় ভরতের দ্বারা কথিত খেদ, নিষেধন এবং ছাদন নামক সন্ধ্যঙ্গের পরিবর্তে দ্রব, ছলন এবং বিচলন নামক পৃথক তিনটি সন্ধ্যঙ্গ স্বীকার করেছেন।[১২০] নাট্যশাস্ত্রকার যাকে 'ছাদন' বলেছেন তাকেই ধনঞ্জয় বলেছেন 'ছলন'। আর 'দ্রব' এবং 'বিচলন' – এ দুটি দশরূপককারের স্বীয় সংযোজন। ''নাটকচন্দ্রিকা'' গ্রন্থে রূপগোস্বামী বিমর্ষ সন্ধির সন্ধ্যঙ্গ প্রসঙ্গে 'বিচলন' স্থানে 'বিবলন' বলেছেন।[১২১]

নির্বহণ সন্ধির অঙ্গসমূহ — পঞ্চসন্ধির শেষ সন্ধি হ'ল নির্বহণ। এটি সংহার বা উপসংহার নামেও কথিত। সমস্ত নাট্যতত্ত্ববিদ নির্বহণ সন্ধির চতুর্দশ অঙ্গ স্বীকার করেছেন। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে এই চতুর্দশ অঙ্গের নামকরণ করেছেন যথাক্রমে —

১) সন্ধি
২) বিবোধ

৩)　গ্রথন

৪)　নির্ণয়

৫)　পরিভাষণ

৬)　কৃতি

৭)　প্রসাদ

৮)　আনন্দ

৯)　সময়

১০)　অপগূহণ (উপগূহণ)

১১)　ভাষণ

১২)　পূর্ববাক্য

১৩)　কাব্যসংহার

১৪)　প্রশস্তি[১২২]

এই চতুর্দশ সন্ধ্যঙ্গের নামকরণ নিয়ে নাট্যাচার্যগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিশ্বনাথ যাকে কৃতি বলেছেন, মহর্ষির মতে তার নাম ধৃতি। বিশ্বনাথ যার নাম দিয়েছেন কাব্যসংহার ধনঞ্জয়ের মতে তা উপসংহার। আবার বিশ্বনাথ যাকে পূর্ববাক্য বলেছেন ধনঞ্জয় ও রূপগোস্বামী তাকেই বলেছেন পূর্বভাব।

সন্ধ্যঙ্গগুলির নাম ও লক্ষণ সম্পর্কে ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের বিভিন্ন গ্রন্থে যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকলেও সর্বত্র একবাক্যে স্বীকার করা হ'য়েছে যে মোট সন্ধ্যঙ্গের সংখ্যা হ'ল চতুঃষষ্টি। অবশ্য নাট্যশাস্ত্রে ৬৫টি সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণ পাওয়া যায় যদিও ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য ক'রেছেন পণ্ডিতেরা ৬৪ প্রকার সন্ধ্যঙ্গ স্বীকার করেছেন।[১২৩]

উক্ত ৬৪টি অঙ্গ প্রত্যেকটি নাটকে থাকে না। আবার সব অঙ্গগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণও নয়। এদের মধ্যে মুখ্য-গৌণ বা প্রধান-অপ্রধান ভেদ আছে। সাহিত্যদর্পণকার অভিমত প্রকাশ করেন যে কারো কারো মতে মুখসন্ধির ১২টি অঙ্গের মধ্যে উপক্ষেপ, পরিকর, পরিত্যাগ, যুক্তি, উদ্ভেদ ও সমাধান নামক অঙ্গগুলি প্রধান। আর বাকি অঙ্গগুলি অপ্রধান। এইভাবে প্রতিমুখ সন্ধির ১৩টি অঙ্গের মধ্যে পরিসর্পণ, প্রগমন, বজ্র, উপন্যাস ও পুষ্প নামক অঙ্গগুলি প্রধান এবং বাকি অঙ্গগুলি অপ্রধান। গর্ভসন্ধির ১২টি

অঙ্গের মধ্যে অভূতাহরণ, মার্গ, ত্রোটক, অধিবল এবং ক্ষেপ নামক অঙ্গগুলি প্রধান। আর বাকি অঙ্গগুলি অপ্রধান। বিমর্ষ সন্ধির ১৩টি অঙ্গের মধ্যে অপবাদ, শক্তি, ব্যবসায়, প্ররোচনা ও আদান নামক অঙ্গগুলি প্রধান এবং বাকিগুলি অপ্রধান। সন্ধির প্রধান অঙ্গগুলি নাটকে অবশ্যই থাকতে হবে। বাকি অপ্রধান অঙ্গগুলি নাট্যকার স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রহণ বর্জন করবেন।[১২৪] যাঁরা সন্ধ্যঙ্গগুলির এই প্রধান-অপ্রধান ভেদ মানেন আচার্য বিশ্বনাথ তাঁদের 'কেচিৎ' ব'লে উল্লেখ করেছেন। মিতভাষিণী টীকাকার বিশ্বনাথের কথাটিকে আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন যে এটি ধণিকের মত। কারণ ধণিক দশরূপকের টীকায় স্পষ্টভাবে এই নাট্যঙ্গগুলির মুখ্য-গৌণ ভেদ বিচার করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে সন্ধ্যঙ্গ বলতে সন্ধির অংশবিশেষকে বোঝায় না। প্রতিটি সন্ধির অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ নাট্যমুহূর্তকে সন্ধ্যঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। এই সন্ধ্যঙ্গগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সন্ধির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। পূর্ণাঙ্গ নাটকে সন্ধির সমস্ত অঙ্গ থাকবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এ বিষয়ে নাট্যকারের নিজস্ব স্বাধীনতা আছে।[১২৫] নাট্যশাস্ত্রকার আরও বললেন যে নিপুণ নাট্যকারগণ কর্তৃক রস ও ভাব বিবেচনা ক'রে রূপকে এই অঙ্গগুলি সন্ধি অনুসারে করণীয়।[১২৬] বিশ্বনাথের মতে রসের পরিপুষ্টি সাধনই সন্ধ্যঙ্গগুলির উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। রসের ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কোন বর্ণনা নাটকে কাম্য নয়। নাটকে রসের বা ভাবের যথাযথ প্রকাশ ঘটাতেই সন্ধ্যঙ্গগুলির প্রয়োগ হওয়া উচিত। কেবল শাস্ত্রের নিয়ম পালনের জন্য সন্ধ্যঙ্গগুলির সন্নিবেশ করা হয় না।[১২৭] আচার্য আনন্দবর্ধনও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ ক'রে বলেন যে কেবল শাস্ত্রের নির্দেশকে মান্য করার জন্য নয়, রসাভিব্যক্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই রূপকে সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গের সন্নিবেশ বাঞ্ছনীয়।[১২৮]

রুদ্রটের মতে যে সন্ধির যে অঙ্গ, সেই সন্ধিতেই সেই অঙ্গ প্রয়োগ করতে হবে। রুদ্রটের এই মত ভরতের মতেরই অনুকরণ বলে মনে হয়। কারণ ভরত রূপকে সন্ধি অনুসারে অঙ্গগুলি প্রয়োগ করার পক্ষপাতী।[১২৯] কিন্তু বিশ্বনাথ তাঁর অভিমত প্রকাশ ক'রে বলেন যে অনিয়ত স্থানেও অর্থাৎ যে সন্ধিতে যে অঙ্গ প্রয়োগ করার কথা, তা ছাড়া অন্য সন্ধিতেও এই অঙ্গগুলি প্রয়োগ করা যায়। তাঁর মতে রসই হ'ল প্রধান। তাই যদি দেখা যায় যে এক সন্ধির অঙ্গ অন্য সন্ধিতে প্রয়োগ করলে নাটকটি আরো রসসমৃদ্ধ হবে তাহলে তা করা যেতেই পারে।[১৩০] রূপ গোস্বামীও রসানুকূল্যের যুক্তিতে বিশ্বনাথকে সমর্থন করেছেন।[১৩১]

এখন একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে সন্ধ্যঙ্গগুলির প্রয়োজন কি? এর উত্তরে দশরূপককার বলেন যে ছয়প্রকার প্রয়োজনের কথা মনে রেখে এই সন্ধ্যঙ্গগুলির সন্নিবেশ করা হ'য়েছে। সেই প্রয়োজনগুলি

হ'ল —

১। ইষ্টার্থের রচনা বা নাট্যবস্তুর যথাযথ বিন্যাস,

২। গোপনীয় বিষয়কে গোপন করা বা প্রকাশ করা,

৩। বস্তুকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা,

৪। রাগাদির সন্নিবেশ অর্থাৎ অভিনয়ে যথাযথ ভাব, আবেগ প্রভৃতি সঞ্চারের প্রতি লক্ষ্য রাখা,

৫। প্রয়োগকে আশ্চর্যমণ্ডিত ক'রে তোলা এবং

৬। ইতিবৃত্তের চমৎকারিত্বকে বিনষ্ট না করা।[১৩২]

সাহিত্যদর্পণকারও সন্ধ্যঙ্গগুলির এ ছয়প্রকার প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেছেন।[১৩৩]

সন্ধ্যঙ্গগুলি দৃশ্যকাব্যে না থাকলে রূপক অভিনয়ের অনুপযোগী হ'য়ে পড়ে। তাই নাটককে প্রয়োগ উপযোগী হ'তে গেলে অবশ্যই এই অঙ্গগুলি থাকতে হবে। নাট্যশাস্ত্রকার বিষয়টিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি একটি উপমা দিয়ে বলেছেন যে — অঙ্গহীন ব্যক্তি যেমন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে অক্ষম হয়, তেমনি সন্ধ্যঙ্গহীন দৃশ্যকাব্যও অভিনয়যোগ্য হয় না।[১৩৪] তিনি আরও বলেন যে, যে দৃশ্যকাব্যের বিষয়বস্তু নিকৃষ্ট, তাও যদি যথাযথরূপে অঙ্গযুক্ত হয় তাহলে তা অভিনয়ের দীপ্তিহেতু নিঃসন্দেহে সুন্দর হয়।[১৩৫]

যে কোন নাটকীয় পাত্র-পাত্রী সন্ধ্যঙ্গগুলিকে উপস্থাপিত করতে পারে কিনা এ বিষয়ে নাট্যাচার্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। রূপ গোস্বামী মনে করেন যে নায়ক, নায়িকা এবং প্রতিনায়ক সন্ধ্যঙ্গ স্থাপনের প্রথম অধিকারী। কারণ তিনি মনে করেন যে রূপকে এরাই মুখ্য। অপরপক্ষে বিশ্বনাথের মতে উপক্ষেপ, পরিকর এবং পরিন্যাস নামক মুখসন্ধির তিনটি অঙ্গ যে কোন পাত্র-পাত্রী উপস্থাপিত করতে পারে। আর অন্যত্র রূপকের মুখ্য চরিত্র নায়ক ও প্রতিনায়কই সন্ধ্যঙ্গ স্থাপনের প্রথম অধিকারী।[১৩৬] তাঁর মতে প্রধান পাত্রের দ্বারাই অধিকাংশ সন্ধ্যঙ্গ সম্পাদিত হবে। বিশ্বনাথের এরূপ ভাবার কারণ মনে হয় তিনি পুরুষপ্রধান ধীরোদাত্ত নায়কের কথা মাথায় রেখে রূপকের বিচার করেছেন। তাই তাঁর মতে প্রধান চরিত্র নায়ক বা প্রতিনায়ক সন্ধ্যঙ্গকে উপস্থাপিত করার অধিকারী। তাদের অভাবে পতাকা অংশ নায়িকা, প্রতিনায়িকা প্রভৃতি উপস্থাপিত করবেন।

নিয়মানুসারে নাটক পঞ্চসন্ধি সমন্বিত হওয়াই বিধেয়। তবে অনেক নাটকে পাঁচটি সন্ধির সন্নিবেশ

পরিলক্ষিত হয় না। তাই নাটক যদি পূর্ণসন্ধি না হয় তবে তা হীনসন্ধিও হ'তে পারে।[১৩৭] সেকারণে নাট্যশাস্ত্রে বলা হ'য়েছে যে নাটক একটি সন্ধিবর্জিত হ'লে চতুর্থ বা বিমর্শ সন্ধিই বর্জনীয়। অনুরূপভাবে দুটি সন্ধি বর্জিত হলে তৃতীয় বা চতুর্থ সন্ধি অর্থাৎ গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধির লোপ বিধেয়। আর তিনটি সন্ধি বর্জনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সন্ধির অর্থাৎ প্রতিমুখ, গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধির লোপ অভিপ্রেত।[১৩৮]

বাস্তবে দেখা যায় যে দশপ্রকার রূপকের মধ্যে কেবল নাটক ও প্রকরণই পঞ্চসন্ধিসমন্বিত। ডিম ও সমবকার চতুঃসন্ধিবিশিষ্ট, ব্যায়োগ এবং ঈহামৃগ ত্রিসন্ধিযুক্ত এবং প্রহসন, বীথী, অংক এবং ভাণ দ্বিসন্ধিসমন্বিত।[১৩৯] নাট্যশাস্ত্রের এটাই বিধান। তাই শুধু 'মুখ' ও 'নির্বহণ' সন্ধি নিয়েই দৃশ্যকাব্য হ'তে পারে। তবে সে দৃশ্যকাব্য যথার্থ রূপক হবে না। যেখানে ঘটনার গ্রন্থি বা জটিলতা নেই, নাটকের চলার পথে কোন বাধা বা বিঘ্ন নেই, তা প্রকৃত নাটক পদবাচ্য নয়। প্রতিমুখ, গর্ভ ও বিমর্শ — এই তিন সন্ধিতেই নাটকের যথার্থ action বা গতিবেগ সৃষ্টি হয়। এই গতিবেগই নাটককে যথার্থ শক্তি দেয় ও দর্শকচিত্তে প্রবল আলোড়ন ও আগ্রহ সৃষ্টি করে।

এপ্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে যে আধিকারিক বৃত্তেরই সন্ধি থাকে। প্রাসঙ্গিক বৃত্তের সন্ধি থাকে না। কারণ প্রাসঙ্গিক বৃত্ত সুসংবদ্ধ স্বতন্ত্র একটা প্লট নয়। তাছাড়া এই বৃত্তে ঘটনার ক্রমপরিণতিও নেই। আধিকারিক বৃত্তের সহায়তাতেই এর সার্থকতা। পরার্থেই প্রাসঙ্গিকের উদ্ভব। এতে সন্ধির নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণ নেই।[১৪০]

কোন কোন সমালোচক দৃশ্যকাব্যের সন্ধ্যাত্মক বিভাগকে স্বাভাবিক এবং অঙ্কাত্মক বিভাগকে কৃত্রিম বিভাগ ব'লে মনে করেন। কারণ সংস্কৃত রূপকে যেমন একই অঙ্কে দুই বা ততোধিক সন্ধির উপস্থিতি দেখা যায়, তেমনি আবার একটি সন্ধির ব্যাপ্তি একাধিক অঙ্কেও দেখা যায়। তবে পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যকাব্যের ঘটনা যেহেতু নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় সেহেতু নাটকীয় কথাবস্তুর ক্রমপরিণতির ক্ষেত্রে মুখ-প্রতিমুখ ইত্যাদি পঞ্চসন্ধির উপযোগিতা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

পাশ্চাত্য নাটকেও ঘটনার এই গতিপ্রকৃতিগত বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য নাটকের এই বিভাগগুলি হ'ল যথাক্রমে —

১। Introduction বা Exposition

২। Rising Action বা Growth

৩। Climax, Crisis বা Turning point

৪। Falling Action, Resolution বা Denouncement

৫। Conclusion বা Catastrophe

প্রথম বিভাগ অর্থাৎ Introduction মুখসন্ধির অন্তর্ভুক্ত; Rising Action প্রতিমুখ সন্ধির অন্তর্গত; Climax গর্ভসন্ধির অন্তর্ভুক্ত; Falling Action বিমর্শসন্ধির অন্তর্গত এবং Conclusion নির্বহণ সন্ধির অনুরূপ। কোন কোন পাশ্চাত্য আলংকারিক দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে দুটি স্তর স্বীকার করেছেন। যথা Rising Action এবং Initial Incident। এই মত মেনে নিলে নাটকীয় ঘটনার ক্রমবিকাশের ছয়টি স্তর স্বীকার করতে হয়।

যাই হোক্, দৃশ্যকাব্যে মুখ্য ফললাভে মুখ্য উপায়ের এভাবেই প্রকাশ, বিকাশ ও পরিণতি ঘটে। প্রথমে বীজ, পরে অঙ্কুর। তারপর অঙ্কুরের ঈষৎ প্রকাশ ও পরে পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। অতঃপর প্রকাশিত অঙ্কুর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই বৃদ্ধির পথ সহজ, সরল, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এই বৃদ্ধির পথে মাঝে মাঝেই বাধা সৃষ্টি হয় এবং সবশেষে ফললাভ ঘটে। সমস্ত দেশের নাট্যরচনার এটাই গতিপ্রকৃতি।

দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রে সন্ধির প্রাসঙ্গিকতা নিঃসংশয়ে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। কারণ আলংকারিকগণ সন্ধি নামক এই বিশেষ প্রয়োগকৌশলটিকে যদি রূপক রচনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ক'রে না দিতেন তাহলে নাট্যরচয়িতাগণ আপন খেয়াল খুশী অনুযায়ী নাট্যরচনা করতেন। ফলে রূপক হ'য়ে উঠত বাঁধন ছাড়া, লাগামহীন ঘোড়ার মত। নিয়মের নিগড়ে নিবদ্ধ থাকার ফলেই রূপক এত সংহত রূপ লাভ করেছে।

সন্ধি রূপককে আকর্ষণীয় ও মনোরঞ্জক করতে সাহায্য করেছে। ধাপে ধাপে তার যে অগ্রগতি, চলার পথে স্রোতস্বিনীর মত তার যে বঙ্কিম গতিপ্রকৃতি দর্শককে তা বিশেষভাবে আগ্রহী ও কৌতূহলী ক'রে তুলেছে। Dramatic Suspense বা নাটকীয় দ্বন্দ্ব তৈরী ক'রে সন্ধি নাট্যপ্রেক্ষককে মাঝে মাঝেই ধন্দে ফেলেছে। কাহিনীর একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিয়ে দর্শককে এক বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দিয়েছে এই সন্ধি। দোলাচলচিত্ততার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে অন্তিম পর্বে দর্শক এক অদ্ভুত তৃপ্তির স্বাদ পেয়েছে। রূপক তার কাছে হয়ে উঠেছে গ্রহণযোগ্য ও আস্বাদনীয়। উপরন্তু বীজাদি অর্থপ্রকৃতির সঙ্গে প্রারম্ভাদি পঞ্চ অবস্থার সংযোগে নাটকীয় ইতিবৃত্ত যে একটি সুসমঞ্জস পরিণতি লাভ করে দর্শকের কাছে এই ধারণাও পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।

দৃশ্যকাব্যে সন্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও দৃশ্যকাব্যের শোভাবৃদ্ধির জন্য রূপকে লক্ষণ, অলংকার প্রভৃতির প্রয়োগের কথা আলংকারিকগণ উল্লেখ করেন। রসের আনুকূল্য বিচার ক'রে এগুলিকে যথাসম্ভব রূপকে প্রয়োগ করতে হয়। তবে এগুলির প্রয়োগবিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম নেই।

নাট্যলক্ষণ

নাট্যলক্ষণ শব্দের অর্থ হ'ল যার দ্বারা নাটকের যথার্থস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়।[১৪১] লক্ষণগুলি নাটকের গতিবেগ বৃদ্ধি করে, কখনো নাট্যদর্শনে উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং প্রেরণা যোগায়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'ল ভাষা ও ভাবের বৈচিত্র্যময় রমণীয়তা সৃষ্টি করা।

রূপগোস্বামী লক্ষণকে বলেছেন ভূষণ।[১৪২] নাট্যশাস্ত্রকারের মতে নাটকের কাব্যবন্ধে ছত্রিশটি লক্ষণ কর্তব্য।[১৪৩] এই লক্ষণগুলি হল —

১। ভূষণ
২। অক্ষরসংঘাত
৩। শোভা
৪। উদাহরণ
৫। হেতু
৬। সংশয়
৭। দৃষ্টান্ত
৮। তুল্যতর্ক
৯। পদোচ্চয়
১০। নিদর্শন
১১। অভিপ্রায়
১২। জ্ঞপ্তি
১৩। বিচার
১৪। দিষ্ট
১৫। উপদিষ্ট
১৬। গুণাতিপাত
১৭। গুণাতিশয়
১৮। বিশেষণ
১৯। নিরুক্তি
২০। সিদ্ধি

২১। ভ্রংশ

২২। বিপর্যয়

২৩। দাক্ষিণ্য

২৪। অনুনয়

২৫। মালা

২৬। অর্থাপত্তি

২৭। গর্হণ

২৮। পৃচ্ছা

২৯। প্রসিদ্ধি

৩০। সারুপ্য

৩১। সংক্ষেপ

৩২। গুণকীর্তন

৩৩। লেশ

৩৪। মনোরথ

৩৫। অনুক্তসিদ্ধি

৩৬। প্রিয়বচ[১৪৪]

লক্ষণগুলির নামকরণের ব্যাপারে শাস্ত্রকারদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন বিশ্বনাথ যাকে 'নিরুক্তি ও 'সংক্ষেপ' বলেছেন নাট্যশাস্ত্রকারের মতে তা 'নিরুক্ত' এবং 'সংক্ষোভ'। আবার রূপগোস্বামী বিশ্বনাথের 'সংক্ষেপ'কে বলেছেন 'ক্ষোভ'। উক্ত নাট্যলক্ষণাবলী নাটকের আবশ্যিক অঙ্গ বা আঙ্গিক নয় বলে এক্ষেত্রে কেবল সেগুলির নাম উল্লেখ করা হ'ল। তবে এদের প্রকৃতি প্রদর্শনের জন্য দু একটি লক্ষণের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

উপদিষ্ট —

'উপদিষ্ট' একপ্রকার নাট্যলক্ষণ। শাস্ত্রনির্দেশকে অবলম্বন ক'রে মনোহর বাক্যকে বলে উপদেশ।[১৪৫] নাট্যশাস্ত্রকারের মতে শাস্ত্রার্থ অবলম্বন ক'রে বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জক এবং শোভন সমাপ্তিযুক্ত যে বাক্য বলা হয় তা উপদিষ্ট সংজ্ঞক হয়।[১৪৬] প্রায় অনুরূপভাবে রূপ গোস্বামী বলেন যে শাস্ত্রানুযায়ী যে বাক্য

তাই উপদিষ্ট।[১৪৭]

"অভিানশকুন্তলম্" নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকালে মহর্ষি কণ্বের উপদেশকে উপদিষ্ট নাট্যলক্ষণের উদাহরণ বলা যায়।[১৪৮] এখানে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার প্রতি বলেছেন গুরুজনের সেবা করবে, সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীর ভাব দেখাবে; তিরস্কৃত হ'লেও স্বামীর প্রতিকূলে যাবে না; পরিজনদের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য পরায়ণা হবে; ঐশ্বর্য্যে গর্বরহিত থাকবে। এইরূপ ব্যবহারের দ্বারাই যুবতীরা গৃহিণীর মর্যাদা লাভ করে। যারা এর বিরুদ্ধ আচরণ করে তারা সংসারে যন্ত্রণার কারণ হয়। সদ্যবিবাহিতা কুলবধূর প্রতি এই উপদেশাবলী শাস্ত্রসম্মত এবং মনোহারী। তাই এখানে উপদিষ্ট নাট্যলক্ষণ হ'য়েছে।

পদোচ্চয় ঃ– "পদোচ্চয়" অপর একটি নাট্যলক্ষণ। পদোচ্চয় শব্দের অর্থ পদসমূহের একত্রীকরণ। আর একটু সহজভাবে বললে এরকম বলা যেতে পারে যে অর্থানুসারে পদাবলীর বিন্যাসকে বলে পদোচ্চয়।[১৪৯] কোন কোমল ভাব প্রকাশ করার জন্য কবি যখন কোমল শব্দ ব্যবহার করেন এবং যখন কোন কঠোর ভাব প্রকাশ করার জন্য কঠোর শব্দ ব্যবহার করেন তখনই সেখানে পদোচ্চয় নামক নাট্যলক্ষণ হয়। বিশ্বনাথ পদোচ্চয়ের যে লক্ষণ করেছেন নাট্যশাস্ত্রকারের সঙ্গে তা মেলে না। কারণ আচার্য ভরতের মতে একই উদ্দেশ্যে বহু শব্দ অপর বহু শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত হ'লে পদোচ্চয় হয়।[১৫০]

বিশ্বনাথ "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটক থেকে এই সুকুমার বা কোমলভাব প্রকাশক শব্দার্থের উদাহরণ দিয়েছেন।[১৫১] এই নাটকের প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার যৌবনলাবণ্যে মুগ্ধ মহারাজ দুষ্যন্ত বলছেন যে এর (শকুন্তলার) অধর কিশলয়ের মত রক্তিম, বাহুযুগল কোমল দুটি শাখার মত এবং দেহে আবির্ভূত নবযৌবন পুষ্পের মত লোভনীয়। কালিদাসবর্ণিত এই শ্লোকে কোমল ভাবানুযায়ী কোমল শব্দের বিন্যাস করা হ'য়েছে ব'লে যথার্থ হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছে। এখানে পদ এবং পদার্থ সৌকুমার্যের প্রকাশক হ'য়েছে।

নাট্যালংকার

নাটকের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন যে নাটক হবে ছত্রিশটি লক্ষণযুক্ত, গুণ ও অলংকারে ভূষিত।[১৫২] তিনি অলংকার বলতে উপমা, রূপক, দীপক ও যমক — এই চারটি কাব্যালংকারের কথা বলেছেন।[১৫৩] দৃশ্যকাব্যের সাধারণ সুষমা বৃদ্ধি করাই এদের কাজ।[১৫৪] তাই শোভাবৃদ্ধি এই ব্যাপক অর্থে এগুলি সত্যই অলংকার। বস্তুতঃ নাট্যলক্ষণের মত নাট্যালংকারের প্রয়োগ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। দর্পণকার এদেরকে 'নাট্যভূষণহেতু' বলেছেন।[১৫৫] সাহিত্যদর্পণে তেত্রিশটি নাট্যালংকারের কথা বলা হয়েছে। এই নাট্যালংকারগুলি হ'ল —

১। আশীঃ

২। আক্রন্দ

৩। কপট

৪। অক্ষমা

৫। গর্ব

৬। উদ্যম

৭। আশ্রয়

৮। উৎপ্রাসন

৯। স্পৃহা

১০। ক্ষোভ

১১। পশ্চাত্তাপ

১২। উপপত্তি

১৩। আশংসা

১৪। অধ্যবসায়

১৫। বিসর্প

১৬। উল্লেখ

১৭। উত্তেজন

১৮। পরিবাদ

১৯। নীতি

২০। অর্থবিশেষণ

২১। প্রোৎসাহন

২২। সাহায্য

২৩। অভিমান

২৪। অনুবর্ত্তন

২৫। উৎকীর্ত্তন

২৬। যাচ্ঞা

২৭। পরিহার

২৮। নিবেদন

২৯। প্রবর্ত্তন

৩০। আখ্যান

৩১। যুক্তি

৩২। প্রহর্ষ

৩৩। উপদেশন[১৫৬]

তেত্রিশ প্রকার নাট্যালংকারের মধ্যে প্রথমটির নাম 'আশীঃ'। 'আশীঃ' শব্দের অর্থ আশীর্বাদ। কিছু পাওয়ার জন্য অভীপ্সিত ব্যক্তির আশংসা বা শুভ কামনাকে আশীঃ বলে। ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার শুভ কামনা করে আশীর্বাদ ক'রে বলেছেন —শর্মিষ্ঠা যেমন যযাতির আদরিণী হ'য়েছিলেন, তুমিও তেমনি স্বামীর আদরিনী হও। তিনি যেমন পুরুকে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন, তেমনি তুমিও সার্বভৌম পুত্র লাভ কর।[১৫৭] এখানে শকুন্তলার পুত্রলাভ, স্বামীর আদরিণী হওয়া ইত্যাদি শুভকামনা বর্ণিত হ'য়েছে। তাই এস্থানে আশীঃ নামক নাট্যালংকার হ'য়েছে।

অক্ষমা চতুর্থ প্রকারের নাট্যালংকার। যেখানে সামান্যতম অপমানও সহ্য করা হয় না, সেখানে অক্ষমা নামক নাট্যালংকার হয়।[১৫৮] ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটক থেকে এর উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আলোচ্য নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দেখা যায় যে রাজা দুষ্যন্ত দুর্বাসার শাপে শকুন্তলাকে চিনতে পারছেন না। সেজন্য রাজাকে প্রতারক বলা হয়েছে। তখন রাজা শার্ঙ্গরবকে বললেন — ''ওগো সত্যবাদিন্, যা বললেন তা স্বীকার করি। কিন্তু একে বঞ্চিত ক'রে লাভ কি?'' শার্ঙ্গরব অক্ষমা দেখিয়ে বললেন লাভ নরক।[১৫৯] শার্ঙ্গরব ক্রুদ্ধ হ'য়ে এই অসহ উক্তি ক'রেছেন ব'লে এতে অক্ষমা নামক নাট্যালংকার হ'য়েছে।

পঞ্চম প্রকার নাট্যালংকারের নাম গর্ব। সাহিত্যদর্পণকার গর্বের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে অহংকারজনিত বাক্যই হ'ল গর্ব।[১৬০] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটক থেকে আচার্য বিশ্বনাথ গর্বের উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। আলোচ্য নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে যখন প্রতিহারী রাজা দুষ্যন্তকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেছেন যে তাঁর বয়স্য সঙ্কটাপন্ন; কোনও অদৃশ্য প্রাণী তাকে অভিভূত ক'রে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের শিখরে তুলে নিয়েছে, তখন রাজা মন্তব্য করেন যে — ''আমার গৃহও প্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হয়?[১৬১]

অন্যলোকের গৃহ আক্রান্ত হ'তে পারে কিন্তু যিনি নৃপতি, যিনি প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী, যিনি এত শক্তিশালী তাঁর গৃহ আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি ভাবাই যায় না। এখানেই রাজার গর্ব এবং অহংকার প্রকাশিত হ'য়েছে এবং 'মমাপি' শব্দের দ্বারা সেই গর্ব ব্যক্ত হ'য়েছে। সুতরাং আলোচ্য অংশে অহংকার প্রকাশিত হওয়ার জন্য 'গর্ব' নামক নাট্যালংকার হ'য়েছে।

বিশ্বনাথের মতে 'ভূষণ' প্রভৃতি নাট্য লক্ষণের সঙ্গে আশীঃ প্রভৃতি নাট্যালংকারের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই।[১৬২] প্রাচীনকাল থেকে বরাবর একটি ভেদ কল্পিত ও অনুসৃত হ'য়ে আসছে মাত্র।[১৬৩] রসের আনুকূল্যের জন্য দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের রচয়িতারা গুণ, অলংকার, ভাব ও সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ করেন। তবে এগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যলক্ষণ ও নাট্যালংকারগুলির প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়। এখানে নাটক বলতে যে কোন রূপককেই বোঝানো হ'য়েছে। কারণ গুণ, অলংকার, ভাব, সন্ধ্যঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে নাট্যভূষণ ও নাট্যালংকারগুলির অন্তর্ভাব হ'য়ে গেছে। সেকারণেই ভূষণের লক্ষণ হিসাবে বলা হ'য়েছে ভূষণ হ'ল গুণ ও অলংকারের যোগ।[১৬৪] প্রসাদ, মাধুর্য্য ইত্যাদি গুণের মধ্যে এবং অনুপ্রাস, শ্লেষ প্রভৃতি অলংকারের মধ্যে ভূষণ অন্তর্গত হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আমরা আগেই বলেছি রূপগোস্বামী লক্ষণকে ভূষণ বলেছেন।

নাট্যালংকার বিষয়টিকে নিয়ে নাট্যসমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হ'য়েছে। আচার্য বিশ্বনাথ মনে করেন যে নাট্যালংকারকে ভরত স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। কারণ ভরতোক্ত ''ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষণোপেতং গুণাঽলঙ্কারভূষিতম্'' বাক্যাংশে অলংকার শব্দের অর্থ নাট্যালংকার ব'লে বিশ্বনাথ মনে করেন। অপরপক্ষে ''নাটকচন্দ্রিকা'' গ্রন্থে রূপগোস্বামী অভিমত প্রকাশ করেন যে নাট্যালংকারগুলি ভরতমুনি সম্মত নয়। তাই সেগুলি উপেক্ষণীয়।[১৬৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বনাথ নাট্যালংকারগুলিকে ভরতমুনি সম্মত ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং রূপগোস্বামী সেগুলিকে ভরতসম্মত নয় ব'লে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমাদের মনে হয় ভরতনাট্যশাস্ত্র পাঠের গণ্ডগোলের জন্যই এই বিরোধ সৃষ্টি হ'য়েছে। আবার দশরূপকে নাট্যলক্ষণ ও সন্ধ্যন্তরের নাম থাকলেও নাটকীয় চরিত্রগুলির বিকাশ ও অলঙ্করণে নাট্যলক্ষণ ও নাট্যালংকারগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

লাস্যাঙ্গ

নাচের দুটি ভেদ — একটি নৃত্য এবং অপরটি নৃত্ত। এই দুটিই নাটকের ক্ষেত্রে উপযোগী।[১৬৬] নৃত্যের দুটি ভাগ — একটি মধুর এবং অন্যটি উদ্ধত। তাদের আবার লাস্য এবং তাণ্ডব নামক দুরকমের ভাগ। সুকুমার ও মধুর নৃত্যকে বলে লাস্য। আর তাণ্ডব হ'ল উদ্ধত নৃত্য। লাস্য এবং তাণ্ডব নৃত্য উভয়েই নাটকের ক্ষেত্রে উপকারক।[১৬৭] ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও লাস্যাঙ্গগুলিকে নাটকের উপকারক বলা হ'য়েছে।[১৬৮]

নাট্যশাস্ত্রবিদ্‌গণ ১০ প্রকার লাস্যাঙ্গের কথা বলেছেন। আচার্য বিশ্বনাথের মতে লাস্যাঙ্গগুলি হ'ল —

১। গেয়পদ
২। স্থিতপাঠ্য
৩। আসীন
৪। পুষ্পগণ্ডিকা
৫। প্রচ্ছেদক
৬। ত্রিগূঢ়
৭। সৈন্ধব
৮। দ্বিগূঢ়
৯। উত্তমোত্তমক
১০। উক্তপ্রত্যুক্ত[১৬৯]

মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার লাস্যাঙ্গের কথা বলেছেন। সেখানে 'বিচিত্রপদ' এবং 'ভাব' নামক দুটি অতিরিক্ত লাস্যাঙ্গের উল্লেখ রয়েছে যা সাহিত্যদর্পণে নেই।[১৭০] তবে নাট্যশাস্ত্রে আবার এমনও বলা হ'য়েছে যে এর (লাস্যাঙ্গের) ভেদ দশটি এবং তাদের বর্ণনা করা হ'চ্ছে।[১৭১] পরে আরো বলা হ'য়েছে যে লাস্যভেদ সংক্ষেপে দশসংখ্যক। এখন তাদের প্রয়োগ ও লক্ষণ বলব।[১৭২]

গেয়পদ — গেয়পদ শব্দের অর্থ গীতিযোগ্য পদ। তন্ত্রীভাণ্ড বা তুরুম্ববীণা সামনে রেখে কোন আসনে ব'সে শুদ্ধ অথবা নৃত্যাদিবর্জিত যে গান করা হয় তাকেই বলা হয় গেয়পদ নামক লাস্যাঙ্গ।[১৭৩] সাহিত্যদর্পণকার শ্রীহর্ষরচিত "নাগানন্দ" নামক দৃশ্যকাব্য থেকে এর উদাহরণ দিয়েছেন। "নাগানন্দের"

নায়িকা মলয়াবতী গৌরীগৃহে ব'সে বীণাবাদন করতে করতে যে গান গেয়েছে তা গেয়পদ নামক লাস্যাঙ্গ।

স্থিতপাঠ্য — কামপীড়িতা কোন রমণী যখন কোন স্থানে স্থিতা হয়ে অর্থাৎ অবস্থান ক'রে প্রাকৃত ভাষায় কোন শ্লোক পাঠ করেন তখন তাকে বলে স্থিতপাঠ্য নামক লাস্যাঙ্গ।[১৭৪] মদনসন্তাপিত বা ক্রোধোন্মত্ত কোনও পুরুষও যদি কোন স্থানে স্থিত হ'য়ে প্রাকৃত ভাষায় কোন শ্লোক পাঠ করেন তাহলেও তাকে স্থিতপাঠ্য বলা হবে। নাট্যশাস্ত্রের কোন কোন সংস্করণে 'স্থিতিপাঠ্য' এরকম পাঠ আছে। আচার্য বিশ্বনাথ স্থিতপাঠ্য নামক লাস্যাঙ্গের কোন উদাহরণ দেননি। সাহিত্যদর্পণের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটক থেকে দুষ্যন্তকে লেখা শকুন্তলার প্রেমপত্রটিকে স্থিতপাঠ্যের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন। মদনসন্তাপিতা শকুন্তলা প্রাকৃত ভাষায় লেখা ঐ পত্রে বলেছেন — "ওহে নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয় জানি না, কিন্তু তোমাতে মন সমর্পণ ক'রেছি ব'লে মদন দিবানিশি আমার শরীর নিরতিশয় তাপিত করছে।[১৭৫]

আসীন — আসীন হ'ল তৃতীয় লাস্যাঙ্গ। যেখানে শোকাভিভূত ও চিন্তান্বিতা রমনী অলংকৃত দেহে প্রসাধন বর্জন ক'রে এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না ক'রে উপবিষ্টা হ'য়ে গান করে সেখানে আসীন নামক লাস্যাঙ্গ হয়।[১৭৬] আসলে আসীন একপ্রকার বিরহসংগীত। নায়কের বিরহে নায়িকা সমস্তরকম বেশভূষা বর্জন ক'রে বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই এই গান করে। আসীন বা উপবেশন করে গান করা হয় বলেই বোধহয় একে বলা হয় আসীন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অপ্রসাধিত গাত্র হ'য়ে শোকচিন্তাকুলা রমণীর উপবেশনকেই আসীন বলা হ'য়েছে।[১৭৭] সাহিত্যদর্পণকার এই লাস্যাঙ্গের উদাহরণ দেননি। মিতভাষিণী টীকায় জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" কাব্য থেকে এর উদাহরণ প্রদর্শিত হ'য়েছে। সেখানে শ্রীমতী রাধা নির্জন লতাকুঞ্জে ব'সে সখীকে বলছেন — হে সখি! যাঁর সুধাময় অধরফুৎকারে মোহনবংশী মধুর ধ্বনিতে মুখরিত, যাঁর মুকুট কটাক্ষবিক্ষেপে চঞ্চল এবং কুণ্ডল কপোলদেশে দোদুল্যমান, সেই হরি আমাকে ত্যাগ ক'রে বিলাসে রত হ'য়েছেন।[১৭৮]

পুষ্পগণ্ডিকা — চতুর্থ লাস্যাঙ্গ হ'ল পুষ্পগণ্ডিকা। আচার্য বিশ্বনাথ বাদ্যযন্ত্রসমবায়ে গান, নানা ছন্দে রচিত আবৃত্তি এবং স্ত্রীপুরুষের বিপরীত আচরণকে পুষ্পগণ্ডিকা বলেছেন।[১৭৯] এখানে বিপরীত আচরণ বলতে নারীর পুরুষের মত ব্যবহার এবং পুরুষের নারীর মত ব্যবহারকে বোঝানো হ'য়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে তাই বলা হ'য়েছে যে সখীদের মনোরঞ্জনের জন্য নারী নরবেশে সংস্কৃত পাঠ করে।[১৮০]

প্রচ্ছেদক — প্রচ্ছেদক হ'চ্ছে পঞ্চম লাস্যাঙ্গ। প্রচ্ছেদক হ'ল প্রেমের বিচ্ছেদে গীত সংগীত।[১৮১] পতিকে অন্য নারীতে আসক্ত ভেবে প্রেমবিচ্ছেদজনিত কাতরতায় কোন স্ত্রী যদি বীণা বাদন ক'রে নিজের দুঃখ প্রকাশ ক'রে গান গায় তাহলে তাকে প্রচ্ছেদক লাস্যাঙ্গ বলা হয়।[১৮২] নাট্যশাস্ত্রে প্রচ্ছেদক নামক লাস্যাঙ্গের লক্ষণ একটু অন্যভাবে দেওয়া হ'য়েছে। সেখানে বলা হ'য়েছে যে অপ্রিয় আচরণ করা সত্ত্বেও প্রিয় ব্যক্তিদের প্রতি জ্যোৎস্নাপুলকিত স্ত্রীলোকদের লগ্ন হওয়াকে প্রচ্ছেদক বলা হয়।[১৮৩] সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে এই লাস্যাঙ্গের উদাহরণ দেওয়া হয়নি। তবে মিতভাষিণী টীকায় "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটক থেকে এর উদাহরণ প্রদর্শিত হ'য়েছে। উক্ত নাটকের পঞ্চম অঙ্কের শুরুতে নেপথ্যে হংসপদিকার যে সংগীত পরিবেশিত হ'য়েছে তা প্রচ্ছেদক লাস্যাঙ্গের উদাহরণ। সেখানে আকাশে গীত হ'য়েছে — ওগো মধুকর, তুমি নূতন মধু ভালোবাসো; তবে চূতমঞ্জরীকে তেমনভাবে চুম্বন ক'রে কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ, তা কেমন ক'রে ভুলে গেলে?[১৮৪]

ত্রিগূঢ়ক — ত্রিগূঢ়ক ষষ্ঠপ্রকার লাস্যাঙ্গ। নাটকের কোন পুরুষপাত্র যদি স্ত্রীবেশ ধারণ করে অল্পমাত্র বা নিপুণ অভিনয় করে তাহলে তাকে বলে ত্রিগূঢ়ক নামক লাস্যাঙ্গ।[১৮৫] বাক্য, বেশভূষা ও আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে তিনভাবে নিজেকে প্রচ্ছন্ন ক'রে পুরুষ ব্যক্তি স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে ব'লে এর নাম ত্রিগূঢ়ক। ভরতের মতে অনিষ্ঠুর, সংক্ষিপ্ত,সমবৃত্তে রচিত পুরুষভাবপ্রধান নাট্য ত্রিগূঢ়ক নামে পরিচিত।[১৮৬] দর্পণকার যাকে বলেছেন ত্রিগূঢ়ক, নাট্যশাস্ত্রকার তাকেই বলেছেন ত্রিমূঢ়ক। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে "মালতীমাধব" থেকে ত্রিগূঢ়কের উদাহরণ দেওয়া হ'য়েছে। দৃশ্যকাব্যের নায়ক মাধবের বন্ধু মকরন্দ নায়িকা মালতীর বেশ ধারণ করেছিলেন। রাজা যার সঙ্গে মালতীর বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন, স্ত্রীবেশে মকরন্দ তার কাছে উপস্থিত হ'য়েছেন। সেক্ষেত্রে মকরন্দের উদ্দেশ্য ছিল মালতীর পাণিপ্রার্থীকে ঠকানো। মকরন্দ সেখানে নৈপুণ্যের সঙ্গে বলেছেন — 'এষোঽস্মি মালতীসংবৃত্তঃ'' অর্থাৎ এই আমি, মালতী হলাম।

সৈন্ধব — সংকেতস্থানে নায়িকাকে না আসতে দেখে যখন নায়ক করণ অর্থাৎ বীণাবাদনাদি দ্বারা প্রাকৃত বাক্য বলে তখন সৈন্ধব নামক লাস্যাঙ্গ হয়।[১৮৭] এটি সপ্তম লাস্যাঙ্গ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এই লাস্যাঙ্গকে সৈন্ধব বলা হ'য়েছে।[১৮৮]

দ্বিগূঢ় — যে সংগীত চতুষ্পাদযুক্ত, যা রস ও ভাবের দ্বারা সমন্বিত এবং যা মুখ বা প্রতিমুখ সন্ধিতে অবস্থান করে তাকেই বলা হয় দ্বিগূঢ় নামক লাস্যাঙ্গ। রস ও ভাব ব্যঙ্গ হ'য়ে গোপনে এখানে অবস্থান করে ব'লে এর নাম দ্বিগূঢ়।[১৮৯] দ্বিগূঢ় নামক লাস্যাঙ্গের স্বরূপ নিয়ে সাহিত্যদর্পণকারের সঙ্গে ভরতের মতভেদ

লক্ষ্য করা যায়। কারণ ভরত মুখ বা প্রতিমুখ সন্ধিতে এর অবস্থানের কথা বলেননি।[১৯০] "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের প্রস্তাবনা অংশে গীত নটীর গানকে দ্বিগূঢ়ের উদাহরণ বলা যায়।[১৯১]

উত্তমোত্তক — উত্তমোত্তমক শব্দের অর্থ উত্তমের থেকে আরো উত্তম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যদর্পণকারের মতে কোপবশত উচ্চারিত ভর্ৎসনাবহুল বাক্য অথবা প্রসন্নতাবশত উচ্চারিত বাক্য রসব্যঞ্জক হ'লে তাকে বলা হয় উত্তমোত্তমক নামক লাস্যাঙ্গ।[১৯২] ভরতের মতে তাকে উত্তমোত্তমক ব'লে জানবে, যাতে অনেক রস ও বিচিত্র শ্লোক থাকে এবং যা হেলাভাবে ভূষিত হয়।[১৯৩]

উক্তপ্রত্যুক্ত — যে লাস্যাঙ্গের হাব ও হেলা নামক ভাব থাকে, যা বিচিত্র শ্লোকবন্ধের দ্বারা মনোরম, যা মিথ্যা তিরস্কারযুক্ত, বিলাসযুক্ত ও উক্তিপ্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত এমন রসসমৃদ্ধ সংগীতকে উক্তপ্রত্যুক্ত নামক লাস্যাঙ্গ বলে।[১৯৪] কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকারের মতে যা গীতার্থযোজিত তা উক্তপ্রত্যুক্ত।[১৯৫] এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে ভরত নির্দিষ্ট উত্তমোত্তমক সাহিত্যদর্পণে উক্তপ্রত্যুক্ত হিসাবে গণ্য হ'য়েছে।

দশটি লাস্যাঙ্গ মূলতঃ বাচিক অভিনয়প্রধান। তবে আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের গুরুত্বও কম নয়। এই লাস্যাঙ্গগুলির মধ্যে গেয়পদ, আসীন, দ্বিগূঢ়, প্রচ্ছেদক এবং বিশ্বনাথ কথিত উক্তপ্রত্যুক্ত গান; স্থিতপাঠ্য, পুষ্পগণ্ডিকা, সৈন্ধব এবং বিশ্বনাথ কথিত উত্তমোত্তমক পাঠ বা আবৃত্তি; আর ত্রিগূঢ়ক পাঠনিরপেক্ষ এবং গীতিনিরপেক্ষ অভিনয়। লাস্যের সঙ্গে এদের যোগ ও গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

ঃঃ পাদটীকা ঃঃ

১। শরীরং নাটকাদীনামিতিবৃত্তং প্রচক্ষতে। —অগ্নিপুরাণ – ৩৩৮/১৭

২। ইতিবৃত্তং দ্বিধা চৈব বুধস্তু পরিকল্পয়েৎ।
আধিকারিকমেকং তু প্রাসঙ্গিকমথাপরম্।। —নাট্যশাস্ত্র – ২১/২

৩। — বস্তু চ দ্বিধা।
তত্রাধিকারিকং মুখ্যমঙ্গং প্রাসঙ্গিকং বিদুঃ।। —দশরূপক – ১/১১

৪। কারণাৎ ফলযোগস্য বৃত্তং স্যাদাধিকারিকম্। —নাট্যশাস্ত্র – ২১/৫ (ক)

৫। কারণাৎ ফলযোগস্য বৃত্তং স্যাদাধিকারিকম্।
পরোপকরণার্থং তু কীর্ত্যতে হ্যানুষঙ্গিকম্।। —নাট্যশাস্ত্র – ২১/৫

৬। নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্। —সাহিত্যদর্পণ – ৬/৭ (ক)

৭। অভিগম্যগুণৈর্যুক্তো ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।।
কীর্তিকামো মহোৎসাহস্ত্রয্যাস্ত্রাতা মহীপতিঃ।
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্দিব্যো বা যত্র নায়কঃ।।
তৎপ্রখ্যাতং বিধাতব্যং বৃত্তমত্রাধিকারিকম্। —দশরূপক – ৩/২২ (খ) - ২৪ (ক)

৮। প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নায়কো মতঃ।। —সাহিত্যদর্পণ – ৬/৯

৯। ইদং পুনর্বস্তুবুধৈর্দ্বিবিধং পরিকল্প্যতে।
আধিকারিকভেদং স্যাৎ প্রাসঙ্গিকমথাপরম্।। —সাহিত্যদর্পণ – ৬/৪২

১০। সানুবন্ধং পতাকাখ্যং প্রকরী চ প্রদেশভাক্। —দশরূপক – ১/১৩ (খ)

১১। প্রখ্যাতোৎপাদ্যমিশ্রত্বভেদাৎ ত্রেধাপি তৎ ত্রিধা। —দশরূপক – ১/১৫ (ক)

১২। প্রখ্যাতমিতিহাসাদেরুৎপাদ্যং কবিকল্পিতম্।।
মিশ্রং চ সঙ্করাত্তাভ্যাং দিব্যমর্ত্যাদিভেদতঃ। —দশরূপক – ১/১৫ (খ)-১৬ (ক)

১৩। অতিরিক্ত পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৪। যত্রার্থে চিন্ত্যমানেঽপি তল্লিঙ্গার্থঃ প্রযুজ্যতে।
আগন্তুকেন ভাবেন পতাকাস্থানকং তু তৎ।। —নাট্যশাস্ত্র – ২১/৩০

১৫। চতুষ্পতাকাপরমং নাটকে কাব্যমিষ্যতে। —নাট্যশাস্ত্র – ২১/৩৫ (ক)

১৬। সহসৈবার্থসংপত্তির্গুণবত্যুপচারতঃ।
পতাকাস্থানকমিদং প্রথমং পরিকীর্ত্তিতম্।। —সাহিত্যদর্পণ – ৬/৪৬

১৩। অতিরিক্ত পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট-২

নাট্যবস্তু বিভাগ

[DIVISION OF DRAMATIC PLOT]
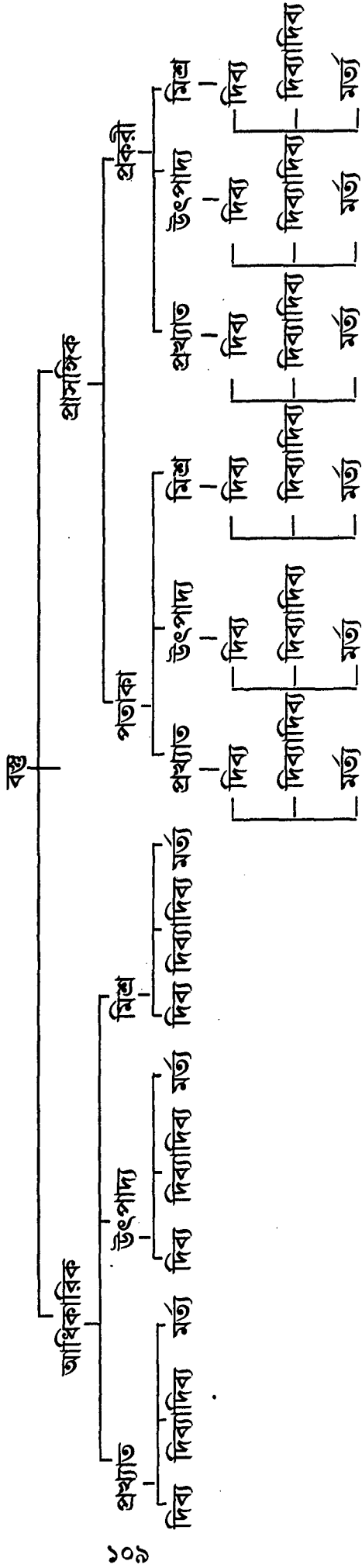
১৭। যথা রত্নাবল্যাম্ — 'বাসবদত্তেয়ম্' ইতি যদা রাজা তৎকন্ঠপাশং মোচয়তি তদা তদুক্ত্যা 'সাগরিকেয়ম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞায় 'কথং প্রিয়া মে সাগরিকা?' — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৪৬ বৃত্তি

১৮। বচঃ সাতিশয়ং শ্লিষ্টং নানাবন্ধসমাশ্রয়ম্।
পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৪৭

১৯। রক্তপ্রসাধিতভুবঃ ক্ষতবিগ্রহাশ্চ
স্বস্থা ভবন্তু কুরুরাজসুতাঃ সভৃত্যাঃ। —বেণীসংহার — ১/৭ (খ)

২০। অর্থোপক্ষেপকং যত্ত লীনং সবিনয়ং ভবেৎ।
শ্লিষ্টপ্রত্যুত্তরোপেতং তৃতীয়মিদমুচ্যতে।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৪৮

২১। খঞ্চুকী - দেব! ভগ্নং ভগ্নম্। রাজা - কেন? কঞ্চুকী-ভীমেন। রাজা-কস্য? — বেণীসংহার - দ্বিতীয় অঙ্ক

২২। দ্ব্যর্থো বচন-বিন্যাসঃ সুশ্লিষ্টঃ কাব্যযোজিতঃ।
প্রধানার্থান্তরাক্ষেপী পতাকাস্থানকং পরম্।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৪৯

২৩। উদ্দামোৎকলিকাং বিপাণ্ডুররুচং প্রারব্ধজৃম্ভাং ক্ষণাদায়াসং শ্বসনোদ্গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মনঃ। অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাং ধ্রুবং পশ্যন্ কোপবিপাটলদ্যুতিমুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহম্।। — রত্নাবলী — ২/৪

২৪। প্রস্তুতাগন্তুভাবস্য বস্তুনো২ন্যোক্তিসূচকম্।
পতাকাস্থানকং তুল্যসংবিধানবিশেষণম্।। — দশরূপক — ১/১৪

২৫। যাতো২স্মি পদ্মনয়নে সময়ো মমৈষ
সুপ্তা ময়ৈব ভবতী প্রতিবোধনীয়া।
প্রত্যায়নাময়মিতীব সরোরুহিণ্যাঃ
সূর্যোহস্তমস্তকনিবিষ্টকরঃ করোতি।। — রত্নাবলী — ৩/৬

২৬। কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ।। — উত্তরচরিতম্ — ১/৩৮ (খ)

২৭। সানুবন্ধং পতাকাখ্যং প্রকরী চ প্রদেশভাক্।। — দশরূপক — ১/১৩ (খ)

২৮। ফলং সংকল্প্যতে সদ্ভিঃ পরার্থং যস্য কেবলম্।
অনুবন্ধেন হীনস্য প্রকরীং তাং বিনির্দিশেৎ।। — নাট্যশাস্ত্র — ২১/২৫

২৯। প্রাসঙ্গিকং প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৬৮

৩০। দ্বেধা বিভাগঃ কর্তব্য সর্বস্যাপীহ বস্তুনঃ।
সূচ্যমেব ভবেৎ কিঞ্চিদ্ দৃশ্যশ্রব্যমথাপরম্।। — দশরূপক — ১/৫৬

৩১। নীরসো২নুচিতস্তত্র সংসূচ্যো বস্তুবিস্তরঃ। — দশরূপক – ১/৫৭ (ক)

৩২। অর্থোপক্ষেপকা অর্থপ্রতিপাদকাঃ। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ -

(ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত পৃষ্ঠা-৪৩)

৩৩। ক্রোধপ্রসাদশোকাঃ শাপোৎসর্গো২থ বিদ্রবোদ্বাহৌ।

অদ্ভুতসংশ্রয়দর্শনমঙ্কে (২) প্রত্যক্ষজানি স্যুঃ।।

যুদ্ধং রাজ্যভ্রংশো মরণং নগররোপধনঞ্চৈব।

অপ্রত্যক্ষকৃতানি প্রবেশকৈঃ সংবিধেয়ানি।। — নাট্যশাস্ত্র - ২০/১৯-২০

৩৪। দিনাবসানে কার্যং যদ্দিনে নৈবোপপদ্যতে।

অর্থোপক্ষেপকৈর্বাচ্যমঙ্কচ্ছেদং বিধায় তৎ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৫৩

৩৫। অর্থোপক্ষেপকাঃ পঞ্চ বিষ্কম্ভকপ্রবেশকৌ।

চূলিকাঙ্কবতারো২থ স্যাদঙ্কমুখমিত্যপি।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৫৪।

৩৬। বৃত্তবর্তিষ্যমানানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।

সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবংকস্য দর্শিতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৫৫

৩৭। বিষ্কম্ভাতি মধ্যমভাগপূরণেন পূর্বাপরাঙ্গগতবৃত্তান্তমুপপাদয়তীতি বিষ্কম্ভঃ। – সাহিত্যদর্পণ

– ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – বিষ্কম্ভক প্রসঙ্গে টীকাকার হরিদাস

সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত "কুসুম প্রতিমা" টীকা।

৩৮। শুদ্ধঃ সঙ্কীর্ণো বা দ্বিবিধো বিষ্কম্ভকস্তু বিজ্ঞেয়ঃ।

মধ্যমপাত্রৈঃ শুদ্ধঃ সঙ্কীর্ণো নীচমধ্যমৈঃ কৃতঃ।। – নাট্যশাস্ত্র – ২১/১০৮

৩৯। মধ্যমপুরুষনিযোজ্যো নাটকমুখসন্ধিবস্তুসঞ্চারঃ।

বিষ্কম্ভকস্তু কার্যঃ পুরোহিতামাত্যকঞ্চুকিভিঃ।। – নাট্যশাস্ত্র – ২১/১০৭

৪০। প্রবেশয়তি পরবর্ত্তিপাত্রপ্রবেশং সূচয়তীতি প্রবেশকঃ। – সাহিত্যদর্পণ - ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ –

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত কুসুমপ্রতিমা

টীকা (প্রবেশক প্রসঙ্গে)

৪১। প্রবেশকো২নুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।

অঙ্কদ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৫৭

৪২। অঙ্কান্তরাধিকারী সংক্ষেপার্থমধিকৃত্য (সন্ধী) নাম্।

প্রকরণনাটকবিষয়ে প্রবেশকো নাম বিজ্ঞেয়ঃ।। – নাট্যশাস্ত্র – ২১/১১০

৪৩। প্রবেশো২ঙ্কদ্বয়স্যান্তঃ শেষার্থস্যোপসূচকঃ। — দশরূপক – ১/৬১ (ক)

৪৪। অন্তর্জবনিকাসংস্থৈশ্চূলিকার্থস্য সূচনা।। — দশরূপক – ১/৬১ (খ)

৪৫। অন্তর্যবনিকাসংস্থৈরুত্তমাধমমধ্যমৈঃ।
অর্থোপক্ষেপণং যত্র ক্রিয়তে সা হি চূলিকা।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/১০৯

৪৬। পাত্রৈর্যবনিকান্তঃস্থৈরদৃশ্যৈর্যাতু নির্মিতা।
আদাবঙ্কস্য মধ্যে বা চূলিকা নাম সা ভবেৎ।। — নাটকচন্দ্রিকা-৫৭৮

৪৭। অঙ্কান্তে সূচিতঃ পাত্রৈস্তদঙ্কস্যাবিভাগতঃ।
যত্রাঙ্কোঽবতরত্যেষোঽঙ্কাবতার ইতি স্মৃতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৫৮

৪৮। অঙ্কাবতারস্ত্বঙ্কান্তে পাতোঽঙ্কস্যাবিভাগতঃ।।
এভিঃ সংসূচয়েৎ সূচ্যং দৃশ্যমঙ্কৈঃ প্রদর্শয়েৎ। — দশরূপক - ১/৬২ (খ) – ৬৩ (ক)

৪৯। যত্র স্যাদঙ্ক একস্মিন্নঙ্কানাং সূচনাঽখিলা।
তদঙ্কমুখমিত্যাহুর্বীজার্থখ্যাপকং চ তৎ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৫৯

৫০। অঙ্কান্তপাত্রৈরঙ্কাস্যং ছিন্নাঙ্কস্যার্থসূচনাৎ। — দশরূপক – ১/৬২ (ক)

৫১। এতত্তু ধণিকমতানুসারেণোক্তম্। অন্যে তু "অঙ্কাবতরণৈনৈবেদং গতার্থম্" – ইত্যাহুঃ
— সাহিত্যদর্পণ – ৬/৬০ (বৃত্তি)

৫২। প্রক্রিয়তে প্রয়োজনং সাধ্যতে আভিরিতি প্রকৃতয়ঃ কারণানি। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/৬৪ -
কুসুমপ্রতিমা টীকা (অর্থপ্রকৃতি প্রসঙ্গে)

৫৩। অর্থপ্রকৃতয়ঃ প্রয়োজনসিদ্ধিহেতবঃ। — দশরূপক – ১/১৮ (বৃত্তি)

৫৪। বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরী কার্যমেব চ।
অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি — নাট্যশাস্ত্র – ২১/২১

৫৫। অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যদ্ বিসর্পতি।
ফলস্য প্রথমো হেতুর্বীজং তদভিধীয়তে।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৬৫

৫৬। অল্পমাত্রং সমুৎসৃষ্টং বহুধা যৎ প্রসর্পতি।
ফলাবসানং যচ্চৈব বীজং তদভিধীয়তে।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/২২

৫৭। দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ।। — রত্নাবলী – (১/৭)

৫৮। অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্। — দশরূপক – ১/১৭ (খ)

৫৯। প্রয়োজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণম্।
যাবৎসমাপ্তির্বন্ধস্য স বিন্দুরিতি সংজ্ঞিতঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/২৩

৬০। বিন্দুঃ জলে তৈলবিন্দুবৎ প্রসারিত্বাৎ — দশরূপক – ১/১৭ – বৃত্তি

৬১। ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভীধীয়তে।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/৬৬ (খ)

৬২। যদ্বৃত্তং হি পরার্থং স্যাৎ প্রধানস্যোপকারকম্।
প্রধানবচ্চ কল্প্যতে সা পতাকেতি কীর্তিতা।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/২৪

৬৩। প্রাসঙ্গিকং প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/৬৮ (ক)

৬৪। প্রকরীনায়কস্য স্যান্ন স্বকীয়ং ফলান্তরম্।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৬৮ (খ)

৬৫। ফলং সংকল্প্যতে সদ্ভিঃ পরার্থং যস্য কেবলম্।
অনুবন্ধেন হীনস্য প্রকরীং তাং বিনির্দিশেৎ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/২৫

৬৬। অপেক্ষিতন্তু যৎসাধ্যমারম্ভো যন্নিবন্ধনঃ।
সমাপনন্তু যৎসিদ্ধে তৎকার্য্যমিতি সংমতম্।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৬৯

৬৭। যদাধিকারিকং বস্তু সম্যক্ প্রাজ্ঞৈঃ প্রযুজ্যতে।
তদর্থো যঃ সমারম্ভস্তৎকার্যং সমুদাহৃতম্।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/২৬

৬৮। কার্যং ত্রিবর্গস্তচ্ছুদ্ধমেকানেকানুবন্ধি চ।। — দশরূপক – ১/১৬ (খ)

৬৯। অবস্থাঃ পঞ্চ কার্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ।
আরম্ভ-যত্ন-প্রাপ্ত্যাশা-নিয়তাপ্তি-ফলাগমাঃ।। — দশরূপক – ১/১৯

৭০। সংসাধ্যে ফলযোগে তু ব্যাপারঃ সাধকস্য যঃ।
তস্যানুপূর্ব্যা বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চাবস্থাঃ প্রযোক্তৃভিঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/৬

৭১। ঔৎসুক্যমাত্রমারম্ভঃ ফললাভায় ভূয়সে। — দশরূপক – ১/২০ (ক)

৭২। ভবেদারম্ভ ঔৎসুক্যং যন্মুখ্যফলসিদ্ধয়ে। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৭১

৭৩। ঔৎসুক্যমাত্রবন্ধস্তু যদ্বীজস্য নিবধ্যতে।
মহতঃ ফলযোগস্য স খল্বারম্ভ ইষ্যতে।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/৯

৭৪। তত্র বীজস্যোৎসুক্যমাত্রবন্ধ আরম্ভঃ। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ –
(ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অনূদিত– পৃষ্ঠা-৮)

৭৫। ইদমহং সম্পাদয়ামীত্যধ্যবসায়মাত্রমারম্ভ ইত্যুচ্যতে। — দশরূপক – ১/২০ – বৃত্তি

৭৬। অপশ্যতঃ ফলপ্রাপ্তিং ব্যাপারো যঃ ফলং প্রতি।
পরং চৌৎসুক্যগমনং স প্রযত্নঃ প্রকীর্তিতঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/১০

৭৭। প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্তৌ ব্যাপারোঽতিত্বরান্বিতঃ। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৭২ (ক)

৭৮। ফলযোগমপশ্যত এব তত্র ব্যাপারঃ প্রযত্নঃ। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ –
(ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অনূদিত – পৃষ্ঠা-৮)

৭৯। প্রযত্নস্তু তদপ্রাপ্তৌ ব্যাপারোঽতিত্বরান্বিতঃ।। — দশরূপক — ১/২০ (খ)

৮০। উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবঃ। — দশরূপক — ১/২১ (ক)

৮১। ঈষৎপ্রাপ্তিশ্চ যা কাচিদ্ অর্থস্য পরিকল্পতে।
ভাবমাত্রেণ স জ্ঞেয়ো বিধিজ্ঞৈঃ প্রাপ্তিসম্ভবঃ।। — নাট্যশাস্ত্র — ২১/১১

৮২। ভাবমাত্রেণ ফলস্য যা প্রাপ্তিঃ সা প্রাপ্তিসম্ভবঃ। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ
(ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অনূদিত — পৃ–৮)

৮৩। অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিঃ সুনিশ্চিতা।। — দশরূপক — ১/২১ (খ)

৮৪। নিয়তাং চ ফলপ্রাপ্তিং যত্র ভাবেন পশ্যতি।
নিয়তাং তাং ফলপ্রাপ্তিং সগুণাং পরিচক্ষতে।। — নাট্যশাস্ত্র — ২১/১২

৮৫। নিয়তাপ্তিরবিঘ্নেন কার্যসংসিদ্ধিনিশ্চয়ঃ। — নাটকচন্দ্রিকা — ৬৮

৮৬। অভিপ্রেতং সমগ্রং চ প্রতিরূপং ক্রিয়াফলম্।
যদ্ দৃশ্যতে নিবৃত্তে তু ফলযোগঃ স উচ্যতে।। — নাট্যশাস্ত্র — ২১/১৩

৮৭। সমগ্রফলসম্পত্তিঃ ফলযোগো যথোচিতঃ। — দশরূপক — ১/২২ (ক)

৮৮। নিজাভীষ্টফলাবাপ্তির্ভবেদেব ফলাগমঃ।। — নাটকচন্দ্রিকা — ৭০

৮৯। সর্বস্যৈব হি কার্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ।
যথানুক্রমশো হ্যেতাঃ পঞ্চাবস্থা ভবন্তি হি।। — নাট্যশাস্ত্র — ২১/১৪

৯০। পতাকায়াস্ত্ববস্থানং ক্বচিদস্তি ন বা ক্বচিৎ।
পতাকয়া বিহীনে তু বীজবিন্দূ নিবেশয়েৎ।। — নাটকচন্দ্রিকা — ৭২

৯১। সন্ধিঃ পরস্পরকথার্থানাং সংঘটনম্। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ
(ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অনূদিত — পৃঃ-৫৯)

৯২। অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ পঞ্চাবস্থাসমন্বিতাঃ।
যথাসংখ্যেন জায়ন্তে মুখাদ্যাঃ পঞ্চসন্ধয়ঃ।। — দশরূপক — ১/২২(খ), ২৩(ক)

৯৩। যথাসংখ্যমবস্থাভিরাভির্যোগাত্তু পঞ্চভিঃ।
পঞ্চধৈবেতিবৃত্তস্য ভাগাঃ স্যুঃ পঞ্চসন্ধয়ঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৭৪

৯৪। মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহৃতি।
ইতি পঞ্চাস্য ভেদাঃ স্যুঃ ক্রমাল্লক্ষণমুচ্যতে।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৭৫

৯৫। যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
প্রারম্ভেন সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্ত্তিতম্।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৭৬

৯৬। যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
কাব্যে শরীরানুগতং তন্মুখং পরিকীর্তিতম্।। — নাট্যশাস্ত্র — ২১/৩৮

৯৭। বীজস্যোদ্ঘাটনং যত্তু দৃষ্টনষ্টমিব ক্বচিৎ।
মুখেন্যস্তস্য সর্বত্র তদ্বৈ প্রতিমুখং ভবেৎ।। — নাট্যশাস্ত্র — ২১/৩৯

৯৮। ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ।
লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখং চ তৎ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৭৭

৯৯। ভবেৎ প্রতিমুখং দৃশ্যাদৃশ্যবীজপ্রকাশনম্। — নাটকচন্দ্রিকা — ১২২ (ক)

১০০। তস্য বীজস্য কিঞ্চিল্লখ্যঃ কিঞ্চিদলক্ষ্য ইবোদ্ভেদঃ
প্রকাশনং তৎ প্রতিমুখম্। — দশরূপক — ১/৩০ - বৃত্তি -

১০১। ফলস্য গর্ভীকরণাদ্ গর্ভঃ। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৭৮ - বৃত্তি

১০২। ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।
গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্মুহুঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৭৮

১০৩। উদ্ভেদস্তস্য বীজস্য প্রাপ্তিরপ্রাপ্তিরেব বা।
পুনশ্চান্বেষণং যত্র স গর্ভ ইতি সংজ্ঞিতঃ।। — নাট্যশাস্ত্র — ২১/৪০

১০৪। গর্ভস্তু দৃষ্টনষ্টস্য বীজস্যান্বেষণং মুহুঃ।
দ্বাদশাঙ্গঃ পতাকা স্যান্ন বা স্যাৎ প্রাপ্তিসম্ভবঃ।। — দশরূপক — ১/৩৬

১০৫। ভবতু, যদি পরমার্থতঃ পরপরিগ্রহশঙ্কিনা ত্বয়া এবং
প্রবৃত্তং তদাভিজ্ঞানেন তব আশঙ্কামপনেষ্যামি। — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ — ৫ম অঙ্ক

১০৬। যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ।
শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/৭৯

১০৭। সম্পন্নরূপং যৎ কার্যং প্রস্তাবেনেহ কশ্চন।
মনস্যায়াতি সন্দেহো বিমর্শং কেঽপি তং বিদুঃ।। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ —
(ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অনূদিত - পৃ—১০৪)

১০৮। অস্য বিমর্শস্ত্রিধা ভবতি, বিলোভনসমুদ্ভবঃ, ক্রোধজঃ, ব্যসনজশ্চ।
— নাটকলক্ষণরত্নকোশ —
(ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অনূদিত — পৃ—১০৪)

১০৯। যত্র প্রলোভনক্রোধব্যসনাদ্যৈর্বিমৃশ্যতে।
বীজবান্ গর্ভনির্ভিন্নঃ স বিমর্শ ইতীর্য্যতে।। — নাটকচন্দ্রিকা — ২১৫

১১০। বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।
ঐকার্থ্যমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ।। — দশরূপক – ১/৪৮ (খ) – ৪৯ (ক)

১১১। বীববন্তো মুখাদ্যার্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।
একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৮০

১১২। পূর্বং প্রস্তাবিতানাং বীজাদীনামর্থানাং যত্র
নিব্যূঢ়তয়া সমাপনং তন্নির্বহণমিত্যর্থঃ। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ –
(ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অনূদিত পৃ–১১৩)

১১৩। পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি।। — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – ১/১২ (খ)

১১৪। উপক্ষেপঃ পরিকরঃ পরিন্যাসো বিলোভনম্।।
যুক্তিঃ প্রাপ্তিঃ সমাধানং বিধানং পরিভাবনা।
উদ্‌ভেদঃ করণং ভেদ এতান্যঙ্গানি বৈ মুখে।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৮১ (খ) – ৮২

১১৫। বিলাসঃ পরিসর্পশ্চ বিধূতং তাপনং তথা।
নর্ম নর্মদ্যুতিশ্চৈব তথা প্রগমনং পুনঃ।।
বিরোধশ্চ প্রতিমুখে তথা স্যাৎ পর্য্যুপাসনম্।
পুষ্পং বজ্রমুপন্যাসো বর্ণসংহার ইত্যপি।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/৮৭-৮৮

১১৬। অভূতাহরণং মার্গো রূপোদাহরণে ক্রমঃ।।
সংগ্রহশ্চানুমানং চ প্রার্থনাক্ষিপ্তমেব চ।
তোটকাধিবলে চৈব হ্যদ্বেগো বিদ্রবস্তথা।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/৬২ (খ) - ৬৩

১১৭। অভূতাহরণং মার্গো রূপোদাহরণে ক্রমঃ।
সংগ্রহশ্চানুমানং চ তোটকাধিবলে তথা।।
উদ্বেগসম্ভ্রমাক্ষেপাঃ লক্ষণং চ প্রণীয়তে। — দশরূপক – ১/৩৭-৩৮ (ক)

১১৮। এষাং চ মধ্যেঽভূতাহরণমার্গতোটকাধিবলাক্ষেপাণাং প্রাধান্যম্ ইতরেষাং যথাসম্ভবং প্রয়োগ
ইতি। — দশরূপক – ১/৪২ - বৃত্তি

১১৯। অপবাদোঽথ সংফেটোঽভিদ্রবঃ শক্তিরেব চ।।
ব্যবসায়ঃ প্রসঙ্গশ্চ (দ্রু) তিঃ খেদো নিষেধনম্।
বিরোধনমথাদানং সাদনং চ প্ররোচনা।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/৬৪(খ)-৬৫

১২০। তত্রাপবাদসম্ফেটৌ বিদ্রবদ্রবশক্তয়ঃ।
দ্যুতিঃ প্রসঙ্গশ্ছলনং ব্যবসায়ো বিরোধনম্।।

প্ররোচনা বিচলনমাদানং চ ত্রয়োদশঃ। — দশরূপক – ১/৪৪-৪৫ (ক)

১২১। প্ররোচনা বিবলনমাদানং স্যুস্ত্রয়োদশ। — নাটকচন্দ্রিকা – ২১৯

১২২। সন্ধির্বিবোধো গ্রথনং নির্ণয়ঃ পরিভাষণম্।।
কৃতিঃ প্রসাদশ্চানন্দঃ সময়ো হ্যপগূহনম্।
ভাষণং পূর্ববাক্যং চ কাব্যসংহার এব চ।।
প্রশস্তিরিতি চাঙ্গানি কুর্যান্নির্বহণে বুধঃ। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/৬৬ (খ) - ৬৮ (ক)

১২৩। চতুঃষষ্টির্বুধৈর্জ্ঞেয়ান্যেতান্যঙ্গানি সন্ধিষু।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/৬৮ (খ)

১২৪। ইহ চ মুখসন্ধৌ উপক্ষেপপরিকরপরিন্যাসযুক্ত্যুদ্ভেদসমাধানানাং প্রতিমুখে চ পরিসর্পণপ্রগমনবজ্রোপন্যাস- -পুষ্পানাং, গর্ভেঽভূতাহরণমার্গত্রো (তো)টকাধিবলক্ষেপানাং বিমর্ষেঽপবাদশক্তিব্যবসায় - প্ররোচনাদানানাং প্রাধান্যম্।
অন্যেষাং চ যথাসম্ভবং স্থিতিঃ — ইতি কেচিৎ। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১১৩ - বৃত্তি

১২৫। সর্বাঙ্গানি কদাচিত্তু দ্বিত্রিযোগেন বা পুনঃ।
জ্ঞাত্বা কার্যমবস্থাং চ যোজ্যান্যঙ্গানি সন্ধিষু।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/১০৫

১২৬। ইত্যেতানি যথাসন্ধিঃ কার্যান্যঙ্গানি রূপকে।
কবিভিঃ কাব্যকুশলৈঃ রসভাবানবেক্ষ্য তু।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/১০৪

১২৭। রসব্যক্তিমপেক্ষ্যৈষামঙ্গানাং সন্নিবেশনম্।
ন তু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতিসংপাদনেচ্ছয়া।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১২০

১২৮। সন্ধিসন্ধ্যঙ্গঘটনং রসাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া।
ন তু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া।। — ধ্বন্যালোক – ৩/১২

১২৯। ইত্যেতানি যথাসন্ধিঃ কার্যান্যঙ্গানি রূপকে। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/১০৪ (ক)

১৩০। কুর্য্যাদনিয়তে তস্য সন্ধাবপি নিবেশনম্।
রসানুগুণতাং বীক্ষ্য রসস্যৈব হি মুখ্যতা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১১৫

১৩১। রসভাবানুরোধেন প্রয়োজনমবেক্ষ্য চ।
সাফল্যং কার্য্যমঙ্গানামিত্যাচার্য্যাঃ প্রচক্ষতে।। — নাটকচন্দ্রিকা – ৩৩৭

১৩২। ইষ্টস্যার্থস্য রচনা গোপ্যগুপ্তিঃ প্রকাশনম্।
রাগঃ প্রয়োগস্যাশ্চর্যং বৃত্তান্তস্যানুপক্ষয়ঃ।। — দশরূপক – ১/৫৫

১৩৩। ইষ্টার্থরচনাশ্চর্য্যলাভো বৃত্তান্তবিস্তরঃ।
রাগপ্রাপ্তিঃ প্রয়োগস্য গোপ্যানাং গোপনং তথা।।

প্রকাশনং প্রকাশ্যানামঙ্গানাং ষড়্‌বিধং ফলম্। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১১৬-১১৭ (ক)

১৩৪। অঙ্গহীনো নরো যদ্বদ্দুদ্ধারম্ভেঽক্ষমো ভবেৎ।

অঙ্গহীনং তথা কাব্যং ন প্রয়োগক্ষমো ভবেৎ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/৫৪

১৩৫। কাব্যং যদপি হীনার্থং সম্যগঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।

দীপ্তত্বাত্তু প্রয়োগস্য শোভামেতি ন সংশয়ঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/৫৫

১৩৬। প্রায়েণ প্রধানপুরুষপ্রযোজ্যানি সন্ধ্যঙ্গানি ভবন্তি। কিন্তুপক্ষেপাদিত্রয়ং

বীজস্যাল্পমাত্রসমুদ্দিষ্টত্বাদপ্রধানপুরুষপ্রযোজিতমেব সাধু। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১১৯ - বৃত্তি

১৩৭। পূর্ণসন্ধি চ তৎকার্যং হীনসন্ধ্যপি বা পুনঃ।

নিয়মাৎ পূর্ণসন্ধিঃ স্যাদ্ধীনসন্ধিস্তু কারণাৎ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/১৭

১৩৮। একলোপে চতুর্থস্য দ্বিলোপে ত্রিচতুর্থয়োঃ।

দ্বিতীয়ত্রিচতুর্থানাং ত্রিলোপে লোপ ইষ্যতে।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/১৮

১৩৯। ব্যায়োগেহামৃগৌ চাপি ত্রিসন্ধী পরিকীর্তিতৌ।

ন তয়োরবমর্শস্তু কর্তব্যঃ কবিভিঃ সদা।।

ডিমঃ সমবকারশ্চ চতুঃসন্ধী প্রকীর্তিতৌ।

গর্ভাবমর্শৌ ন স্যাতাং ন চ বৃত্তিস্তু কৈশিকী।।

দ্বিসন্ধিতু প্রহসনং বীথ্যঙ্কো ভাণ এব চ।

মুখনির্বহণে স্যাতাং তেষাং বৃত্তিশ্চ ভারতী।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/৪৪-৪৬

১৪০। প্রাসঙ্গিকে পরার্থত্বান্ন হ্যেষ নিয়মো ভবেৎ।

যদ্বৃত্তং তু ভবেত্তত্র সংযোজ্যমবিরোধতঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/১৯

১৪১। লক্ষ্যতে নাট্যস্বরূপং জ্ঞায়তে এভিরিতি। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৭৪

(হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত কুসুমপ্রতিমা টীকা)

১৪২। এবমঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চ সুশ্লিষ্টং রূপকশ্রিয়ঃ।

শরীরং বস্ত্বলঙ্কুর্য্যাৎ ষট্‌ত্রিংশদ্ভূষণৈঃ স্ফুটম্।। — নাট্যকচন্দ্রিকা – ৪১৭

১৪৩। বৃত্তৈরেবং তু বিবিধৈর্নানাচ্ছন্দঃ সমুদ্ভবৈঃ।

কাব্যবন্ধাস্তু কর্তব্যাঃ ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষণান্বিতাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৬/১৭২

১৪৪। ভূষণাক্ষরসংঘাতৌ শোভোদাহরণং তথা।

হেতুসংশয়দৃষ্টান্তাস্তুল্যতর্কঃ পদোচ্চয়ঃ।।

নিদর্শনাভিপ্রায়ৌ চ প্রাপ্তির্বিচার এব চ।

দিষ্টোপদিষ্টে চ গুণাতিপাতাতিশয়ৌ তথা।।

বিশেষণনিরুক্তী চ সিদ্ধির্ভ্রংশ বিপর্য্যয়ৌ।

দাক্ষিণ্যানুনয়ৌ মালার্থাপত্তির্গর্হণং তথা।।

পৃচ্ছা প্রসিদ্ধিঃ সারূপ্যং সংক্ষেপো গুণকীর্ত্তণম্।

লেশো মনোরথোঽনুক্তসিদ্ধিঃ প্রিয়বচস্তথা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৭১-১৭৪

১৪৫। উপদিষ্টং মনোহারি বাক্যং শাস্ত্রানুসারতঃ। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৮৪ (ক)

১৪৬। পরিগৃহ্য চ শাস্ত্রার্থং যদ্বাক্যমভিধীয়তে।

বিদ্বন্মনোহরং স্বন্তমুপদিষ্টং তদুচ্যতে।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৭/২৪

১৪৭। শাস্ত্রানুসারি যদ্বাক্যমুপদিষ্টং তদুচ্যতে। — নাটকচন্দ্রিকা – ৫৫৩

১৪৮। শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে

ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।

ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী

যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলাস্যাধয়ঃ।। — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – ৪/১৮

১৪৯। সংচয়োঽর্থানুরূপো যঃ পদানাং স পদোচ্চয়ঃ। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৮০

১৫০। বহূনাং চ প্রযুক্তানাং পদানাং বহুভিঃ পদৈঃ।

উচ্চয়ঃ সদৃশার্থো যঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পদোচ্চয়ঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৭/২২

১৫১। অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।

কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।। — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – ১/১৯

১৫২। সন্ধ্যন্তরৈকবিংশত্যা চতুঃষষ্ট্যঙ্গসংযুতম্।

ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষণোপেতং গুহাঽলঙ্কারভূষিতম্।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/১১৪

১৫৩। উপমা দীপকং চৈব রূপকং যমকং তথা।

কাব্যসৈতে হ্যলংকারাশ্চত্বারঃ পরিকীর্তিতাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৭/৪৩

১৫৪। নাটকালঙ্কারা নাট্যশোভাং জনয়ন্তোঽলঙ্কারা ইতি ব্যপদিশ্যন্তে।

— নাটকলক্ষণরত্নকোশ –

(ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অনূদিত - পৃ-২০৬)

১৫৫। ইতি নাট্যালংকৃতয়ো নাট্যভূষণহেতবঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৯৮ (খ)

১৫৬। আশীরাক্রন্দকপটাক্ষমাগর্বোদ্যমাশ্রয়াঃ।

উৎপ্রাসনস্পৃহাক্ষোভপশ্চাত্তাপোপপত্তয়ঃ।।

আশংসাধ্যবসায়ৌ চ বিসর্পাল্লেখসংজ্ঞিতৌ।
উত্তেজনং পরিবাদো নীতিরর্থবিশেষণম্।।
প্রোৎসাহনং চ সাহায্যমভিমানোঽনুবর্ত্তনম্।
উৎকীর্ত্তনং তথা যাচঞা পরিহারো নিবেদনম্।।
প্রবর্ত্তনাখ্যানযুক্তিপ্রহর্ষাশ্চোপদেশনম্।
ইতি নাট্যালংকৃতয়ো নাট্যভূষণহেতবঃ।। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৯৫-১৯৮

১৫৭। যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব।
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি।। – অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ –৪/৭

১৫৮। অক্ষমা সা পরিভবঃ স্বল্পোঽপি ন বিসহ্যতে। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/২০০

১৫৯। রাজা – ভোঃ সত্যবাদিন্, অভ্যুপগতং তাবদস্মাভিরেবং কিং পুনরিমামতিসন্ধায় লভ্যতে।
শার্ঙ্গরবঃ - বিনিপাতঃ। – অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – পঞ্চম অঙ্ক

১৬০। গর্বোঽবলেপজং বাক্যম্। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/২০০

১৬১। মমাপি সত্ত্বৈরভিভূয়ন্তে গৃহাঃ – অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – ষষ্ঠ অঙ্ক

১৬২। এতেন বস্তুতো লক্ষণনাট্যালংকারাণামভেদ এবেতি সূচিতম্। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/২১০
(হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত "কুসুমপ্রতিমা" টীকা)

১৬৩। এষাঞ্চ লক্ষণনাট্যালংকারাণাং সামান্যত একরূপত্বেঽপি ভেদেন ব্যপদেশো গড্ডলিকাপ্রবাহেণ।
– সাহিত্যদর্পণ – ৬/২১০ – বৃত্তি

১৬৪। লক্ষণানি গুণৈঃ সালংকারৈর্যোগস্তু ভূষণম্। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৭৫

১৬৫। প্রোচ্যতেঽন্যত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যং কৈশ্চিদ্বিভূষণম্।
মুনেরসম্মতত্বেন তত্তু সর্ব্বমুপেক্ষিতম্।। – নাটকচন্দ্রিকা – ৫৫৯

১৬৬। নৃত্যস্য ক্বচিদবান্তরপদার্থাভিনয়েন
নৃত্তস্য চ শোভাহেতুত্বেন নাটকাদাবুপযোগ ইতি। – দশরূপক – ১/১০ – বৃত্তি

১৬৭। মধুরোদ্ধতভেদেন তদ্ স্বয়ং দ্বিবিধং পুনঃ।
লাস্যতাণ্ডবরূপেণ নাটকাদ্যুপকারকম্।। – দশরূপক – ১/১০

১৬৮। অন্যানি চ লাস্যবিধাবঙ্গানি তু নাটকে প্রযুক্তানি। – নাট্যশাস্ত্র – ২০/১৩২ (ক)

১৬৯। গেয়পদং স্থিতপাঠ্যমাসীনং পুষ্পগণ্ডিকা।
প্রচ্ছেদকস্ত্রিগূঢ়ং চ সৈন্ধবাখ্যং দ্বিগূঢ়কম্।।
উত্তমোত্তমকং চান্যদুক্তপ্রত্যুক্তমেব চ।

লাস্যে দশবিধে হ্যেতদঙ্গমুক্তং মনীষিভিঃ।। —সাহিত্যদর্পণ – ৬/২১২-২১৩

১৭০। গেয়পদং স্থিতপাঠ্যমাসীনং পুষ্পগণ্ডিকা।
প্রচ্ছেদকস্ত্রিমূঢ়ং চ সৈন্ধবাখ্যং দ্বিমূঢ়কম্।।
উত্তমোত্তমকং চৈব বিচিত্রপদমেব চ।
উক্তপ্রত্যুক্তভাবঞ্চ লাস্যাঙ্গানি প্রকীর্তিতাঃ।। —নাট্যশাস্ত্র – ৩১/৪৩০-৪৩১

১৭১। অঙ্গানি দশ চৈবাস্য তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।। —নাট্যশাস্ত্র – ৩১/৪২৯

১৭২। অঙ্গান্যেতানি লাস্যে স্যুর্দশোক্তানি সমাসতঃ।। —নাট্যশাস্ত্র – ৩১/৪৩৪ (খ)

১৭৩। তন্ত্রীভাণ্ডং পুরস্কৃত্যোপবিষ্টস্যাসনে পুরঃ।
শুদ্ধং গানং গেয়পদম্।। —সাহিত্যদর্পণ – ৬/২১৪

১৭৪। স্থিতপাঠ্যং তদুচ্যতে।
মদনোত্তাপিতা যত্র পঠতি প্রাকৃতং স্থিতা।। —সাহিত্যদর্পণ – ৬/২১৫

১৭৫। তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবাবি রত্তিম্পি।
নিগ্ঘিণ তবই বলীঅং তুই বুত্তমনোরহাইং অঙ্গাইং।। —অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – ৩/১৫

১৭৬। নিখিলাতোদ্যরহিতং শোকচিন্তান্বিতাবলা।
অপ্রসাধিতগাত্রং যদাসীনাসীনমেব তৎ।। —সাহিত্যদর্পণ – ৬/২১৬

১৭৭। আসীনমাস্যতে যত্র চিন্তাশোকসমন্বিতম্।
অপ্রসাধিতগাত্রং চ জিহ্মদৃষ্টিনিরীক্ষিতম্।। —নাট্যশাস্ত্র – ২০/১৩৯

১৭৮। সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্।
বলিততদগঞ্চলচঞ্চলং মৌলিকপোলবিলোলবতংসম্।। —গীতগোবিন্দ – ২/২

১৭৯। আতোদ্যমিশ্রিতং গেয়ং ছন্দাংসি বিবিধানি চ।
স্ত্রীপুংসয়োর্বিপর্য্যাসচেষ্টিতং পুষ্পগণ্ডিকা।। —সাহিত্যদর্পণ – ৬/২১৭

১৮০। যত্র স্ত্রী নরবেষেণ ললিতং সংস্কৃতং পঠেৎ।
সখীনাং তু বিনোদায় সা জ্ঞেয়া পুষ্পগণ্ডিকা।। —নাট্যশাস্ত্র – ২০/১৪০

১৮১। প্রেমপ্রচ্ছেদপ্রযোজ্যত্বাত্ প্রচ্ছেদকো ইতি নাম —সাহিত্যদর্পণ – ৬/২১৮
— মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত কুকুমপ্রতিমা টীকা।

১৮২। অন্যাসক্তং পতিং মত্বা প্রেমবিচ্ছেদমন্যুনা।
বীণাপুরঃসরং গানং স্ত্রিয়াঃ প্রচ্ছেদকো মতঃ।। —সাহিত্যদর্পণ – ৬/২১৮

১৮৩। প্রচ্ছেদকঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্র চন্দ্রাতপাহতাঃ।

স্ত্রিয়ঃ প্রিয়েষু সজ্জন্তে হ্যপি বিপ্রিয়কারিষু।। — নাট্যশাস্ত্র ২০/১৪১

১৮৪। অহিণবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিসুমরিদোসি ণং কহং।। — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – ৫/১

১৮৫। স্ত্রীবেশধারিণাং পুংসাং নাট্যং শ্লক্ষ্ণং ত্রিগূঢ়কম্।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২১৮

১৮৬। অনিষ্ঠুরং স্বল্পপদং সমবৃত্তৈরলংকৃতম্।
নাট্যং পুরুষভাবাঢ্যম্ ত্রিমূঢ়কমুদাহৃতম্।। — নাট্যশাস্ত্র – ২০/১৪২

১৮৭। কশ্চন ভ্রষ্টসংকেতঃ সুব্যক্তকরণান্বিতঃ।
প্রাকৃতং বচনং ব্যক্তি যত্র তৎ সৈন্ধবং মতম্।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২১৯

১৮৮। পাত্রং বিস্মৃতসঙ্কেতং সুব্যক্তকরণান্বিতম্।
প্রাকৃতৈর্বচনৈর্যুক্তং বিদুঃ সৈন্ধবকং বুধাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ২০/১৪৩

১৮৯। চতুরস্রপদং গীতং মুখপ্রতিমুখান্বিতম্।।
দ্বিগূঢ়ং রসভাবাঢ্যং — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২২০

১৯০। শুভার্থগীতাভিনয়ং চতুরস্রপদক্রমম্।
স্পষ্টবাবরসোপেতং ব্যাজচেষ্টং দ্বিগূঢ়কম্।। — নাট্যশাস্ত্র – ২০/১৪৪

১৯১। ঈসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।
ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাইং।। — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – প্রস্তাবনা - ৪

১৯২। উত্তমোত্তমকং পুনঃ।।
কোপপ্রসাদজমধিক্ষেপযুক্তং রসোত্তরম্।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২২১

১৯৩। উত্তমোত্তমকং বিদ্যাদনেকরসসংশ্রয়ম্।
বিচিত্রৈঃ শ্লোকবন্ধৈশ্চ হেলাভাববিভূষিতম্।। — নাট্যশাস্ত্র – ২০/১৪৫

১৯৪। হাবহেলান্বিতং চিত্রশ্লোকবন্ধমনোহরম্।।
উক্তিপ্রত্যুক্তিসংযুক্তং সোপালম্ভমলীকবৎ।
বিলাসান্বিতগীতার্থমুক্তপ্রত্যুক্তমুচ্যতে।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/২২১ (খ) - ২২২

১৯৫। কোপপ্রসাদজনিতং সাধিক্ষেপপদাশ্রয়ম্।
উক্তপ্রত্যুক্তমেব স্যাচ্চিত্রগীতার্থযোজিতম্।। — নাট্যশাস্ত্র – ২০/১৪৭

:: তৃতীয় অধ্যায় ::

সংস্কৃত নাটকে নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রচিত্রণ

ইতিবৃত্ত বা plot বিকশিত হয় চরিত্রকে কেন্দ্র করেই। তাই দৃশ্যকাব্যে চরিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনও ভাবা হয় যে চরিত্রই ইতিবৃত্তের স্রষ্টা। চরিত্রের একাত্মতায় পাঠক ও দর্শকচিত্তে রস উপলব্ধ হয়। সেজন্য বিশ্বনাথ অভিমত দিলেন যে নায়কাদি আলম্বন বিভাব; কারণ তাকে আশ্রয় করেই রসোদগম হয়।[১]

নাটকীয় চরিত্র সাধারণতঃ নাট্যে বর্ণিত সমাজ তথা সামাজিক অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। সেকারণে তার বিভিন্ন দিক নাট্যসাহিত্যের অনুসন্ধানের পথকে উন্মোচিত করে। প্রধান রসের পরিপুষ্টির জন্য সংস্কৃত রূপকে বাস্তবানুগ বিবিধ চরিত্রের সন্নিবেশ করা হয়। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে নায়কই ফলভোক্তা বলে তিনি হলেন অধিকারী।[২] তাই নায়ক বা অধিকারীর বৃত্তান্তই রূপকের আদ্যন্ত প্রতিপাদিত স্থায়ী বিষয়।

বিভিন্ন ধরণের নায়কচরিত্র বিবিধ গুণসম্পন্ন ও বিবিধ মানসিকতাবিশিষ্ট মানুষকে চিত্রিত করে। সেই কারণে আলংকারিকগণ বিভিন্ন ধরণের চরিত্রের স্বাভাবিক বিশিষ্টতাসমূহ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন এবং সর্বোপরি একজন নায়কের ব্যক্তিগত গুণাগুণ সংজ্ঞায়িত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নায়ক ও নায়কের গুণাবলী

দৃশ্যকাব্যে যে চরিত্র প্রধান, যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনা আবর্তিত হয়, নাট্যফলের যে অধিকারী সেই নায়ক। অর্থাৎ নায়ক হবেন সমস্ত গুণের আধার। নাট্যশাস্ত্রকার এ প্রসঙ্গে বললেন যে নাট্যে বহু পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে যে দুর্ভাগ্যহত বা বিপন্ন ব্যক্তি অবশেষে উন্নতি লাভ করে তাকে বলা হয় নায়ক; তিনি প্রধান।[৩]

নায়কের মধ্যে কি কি গুণ থাকবে সেকথা বলতে গিয়ে ধনঞ্জয় অভিমত প্রকাশ করলেন যে নায়ক বা নেতা হবেন বিনীত, মধুর, ত্যাগী, দক্ষ, প্রিয়ভাষী, লোকপ্রিয়, শুচি, বাগ্মী, প্রখ্যাতকুলোদ্ভব, স্থির এবং যুবক। নায়ক হবেন বুদ্ধিমান, উৎসাহী, স্মৃতিমান, প্রজ্ঞাশালী, কলাসমন্বিত, বীর, দৃঢ়,তেজস্বী, শাস্ত্রানুসারী এবং ধার্মিক।[৪] প্রায় একইরকমভাবে বিশ্বনাথ বললেন যে ত্যাগী, কৃতী, কুলীন,বুদ্ধিমান, রূপবান, তরুণ, উৎসাহী, অনলস, লোকানুরক্ত, তেজ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিই নায়ক।[৫]

বিনীত নায়ক বলতে বোঝানো হয় সেই নায়ককে যিনি বিনয় গুণের অধিকারী। ভবভূতি রচিত "মহাবীরচরিত" নাটকের চতুর্থ অঙ্কের একবিংশতি শ্লোকে রামচন্দ্র যেখানে বলছেন – "ব্রহ্মজ্ঞরা যাঁর চরণ বন্দনা করেন, যিনি বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতের আধার এবং যিনি তপস্বীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ – এরকম আপনার প্রতি আমি একান্ত আকস্মিকভাবে যে বিনয় লঙ্ঘন করেছি সেবিষয়ে আপনি প্রসন্ন হোন। আপনাকে আমি করজোড়ে প্রণাম করছি"[৬] – সেখানে রামের এই উক্তি নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রের বিনয় গুণকে প্রকাশ করছে।

মধুর শব্দের অর্থ প্রিয়দর্শন বা সুদর্শন। কিন্তু এই সৌন্দর্য কেবলমাত্র বাহ্যিক রূপের সৌন্দর্য নয়; চিন্তা-ভাবনা, আচরণও যার সুন্দর তেমন ব্যক্তিকেই মধুর শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। "মহাবীরচরিত" এর দ্বিতীয় অঙ্কে জামদগ্ন্যর উক্তিতে রামের সর্বতোমুখী সৌন্দর্য যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ সেখানে বলা হয়েছে – হে রাম। হে রাম। হৃদয়ের অভিপ্রায়ের তুল্য দৃষ্টিনন্দনতা ধারণ করে অচিন্ত্য গুণরাজিতে রমণীয় তুমি আমার কাছে সব দিক দিয়েই আমার অন্তরে স্থানলাভ করেছ।[৭]

নায়কের অপর গুণ ত্যাগ। ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ইত্যাদি সাংসারিক বস্তুর প্রতি নায়কের অনাগ্রহ থাকবে। ভবভূতির – "উত্তররামচরিত" নাটকে নায়ক রামচন্দ্র যেখানে বলছেন – প্রজানুরঞ্জনের জন্য

স্নেহ, দয়া, সুখ, এমনকি জানকীকেও যদি ত্যাগ করতে হয় তাহলে আমার দুঃখ নেই – সেখানে রামচন্দ্রের ত্যাগশীলতার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।[৮]

দক্ষতা বা ক্ষিপ্রকারিতা নায়কের অপর একটি গুণ। ''মহাবীরচরিত''-এর নায়ক রামচন্দ্র যখন জ্যা আরোপণমাত্র ধনুর্ভঙ্গ করছেন তখন তাঁর নায়কোচিত ক্ষিপ্রকারিতা ও দক্ষতা প্রকাশিত হয়েছে।[৯]

নায়কের অপর গুণ প্রিয়ভাষিত্ব। ''মহাবীরচরিত''- এর দ্বিতীয় অঙ্কে যেখানে অতিশয় ক্রুদ্ধ পরশুরামকে অত্যন্ত প্রিয় ও মধুর বাক্যের দ্বারা রামচন্দ্র শান্ত করার চেষ্টা করছেন সেখানে নায়ক রামের প্রিয়ভাষিত্ব গুণ প্রকাশিত হয়েছে।[১০]

নায়ক হবেন রক্তলোক অর্থাৎ লোকপ্রিয়। শুচিতাও তাঁর অন্যতম গুণ বলে বিবেচিত হয়। শুচি বলতে বোঝানো হয়েছে যাঁর অন্তর কামাদি দোষ বর্জিত এবং নিষ্কলুষ। বাগ্মিতাও তাঁর অপর একটি গুণ। এছাড়াও নায়ক হবেন প্রসিদ্ধ বংশোদ্ভূত। অর্থাৎ নায়ককে প্রসিদ্ধ কোন বংশের সন্তান বা উচ্চকুলজাত হতে হবে।

স্থির অর্থাৎ বাক্য, মন ও ক্রিয়ায় অচঞ্চল ব্যক্তি হবেন নায়ক। ''মহাবীরচরিত'' এর তৃতীয় অঙ্কে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ্য করে জামদগ্ন্য যেখানে বলছেন – পূজনীয় আপনাদের বাক্য লঙ্ঘন করার জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করব কিন্তু শস্ত্রগ্রহণের মহাব্রতকে কিছুতেই কলুষিত করতে পারব না [১১]– সেখানে নায়কের স্থিরচিত্ততা প্রকাশিত হয়েছে।

নায়ককে হতে হবে অবশ্যই যুবক। বিশেষতঃ শৃংগার-রস-প্রধান রূপকে যুবা নায়কই অভিপ্রেত। সেই যুবকের থাকবে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা।বৃত্তিকার ধনিকের মতে 'বুদ্ধি' হল জ্ঞানসামান্য আর প্রজ্ঞা হল বিশিষ্ট জ্ঞান।[১২] বীরত্ব, দৃঢ়চিত্ততা, তেজস্বিতা, শাস্ত্রজ্ঞতা, ধার্মিকতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হবেন নায়ক। দৃশ্যকাব্যের বিভিন্ন নায়কের মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ যে রূপকের নায়ক রামচন্দ্র সেই রূপকে রামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে উক্ত গুণাবলী অনায়াসেই দৃষ্ট হয়।

নায়কের মধ্যে যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ দেখা যায় তার মধ্যে সত্ত্বগুণোৎপন্ন গুণসমূহকে বলা হয় সাত্ত্বিক গুণ। পৌরুষযুক্ত সাত্ত্বিক গুণগুলি সংখ্যায় আটটি।

যথা –

১. শোভা
২. বিলাস
৩. মাধুর্য
৪. গাম্ভীর্য
৫. স্থৈর্য
৬. তেজ
৭. লালিত্য
৮. ঔদার্য[১৩]

"নাটকলক্ষণরত্নকোশ" গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সাগরনন্দী নায়কের আটটি মহাগুণ থাকার কথা বলেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে শোভা, বিলাস, মাধুর্য, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য,ললিত, ঔদার্য এবং তেজ – পুরুষের এই আটটি মহাগুণ নায়ক-চরিত্রে দেখাতে হয়।[১৪] সাহিত্যদর্পণেও শোভাদি আটটিকে নায়কোচিত গুণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।[১৫]

নায়কের উক্ত গুণাবলী 'উদ্ধত' নায়কে তো নেই-ই। 'ধীরোদ্ধত' চরিত্রেও এই গুণগুলির সমাবেশ নিতান্তই দুর্লভ। কিন্তু 'নায়ক' সম্বন্ধে নাট্যকারগণের এই অনুভূতি ও ধারণা একদিনে হয়নি। ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়েই আদর্শচরিত্র ব্যক্তি নায়কত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। নায়কের এই সব আদর্শ গুণাবলীর অভিব্যক্তি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 'নাটক' ও 'প্রকরণ' জাতীয় রূপকের মধ্যেই দেখা যায়। যে চরিত্রে প্রচন্ড শক্তি, প্রচন্ড গতি, প্রবল বিজিগীষা, নিষ্ঠুর জিঘাংসা, যেখানে সকলেই নত, সকলেই ভীত; দুষ্ট ও ভ্রষ্ট হ'লেও তাই একসময় ছিল দৃশ্যকাব্যের নায়ক। হয়তো এইসব ভয়াবহ চরিত্র এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা ও উত্তেজনাই লোকপ্রিয় ছিল। দর্শকমণ্ডলী হয়তো এইসব দৃশ্য দেখেই তৃপ্তি বোধ করত। এছাড়াও সেযুগ ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। সবকিছুর উপরই রাজশক্তি ও রাজার আদর্শের প্রভাব পড়ত। তাই ধর্ম-দর্শন-শিল্প-সাহিত্য-কোন কিছুই এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। রাজার অনুগ্রহপুষ্ট রাজকবিগণ অনেকসময় রাজার আদর্শ ও রাজমহিমা প্রচারের জন্য সাহিত্য রচনা করতেন বা করতে বাধ্য হতেন। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেযুগের সাহিত্য রাজার চিত্ত-বিনোদনের জন্যই রচিত হত। রাজচরিত্রের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শেরও উত্থান-পতন ঘটত। নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই উত্থান-পতন ও পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কারণ মানুষকে শিক্ষিত, দীক্ষিত, প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করতে নাট্যসাহিত্যই শ্রেষ্ঠমাধ্যম। একারণেই রাজাদের সংগীতশালা ও অভিনয়মঞ্চ থাকত। এইসব রঙ্গমঞ্চে একদিকে যেমন রাজা,

রাজপরিবার ও ধনিক গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন হত, অন্যদিকে তেমনি রাজার রুচি ও আদর্শ অনুসারে রাজ্যের প্রজাদের চিত্তসংস্কার ঘটত।

কিন্তু মানুষ প্রগতিশীল জীব। তাই সে এক জায়গায় একটি আদর্শে স্থির থাকতে পারে না। পরিবর্তনশীল জগতে অন্য সব কিছুর মতই নাট্যসাহিত্যেরও ধারা বদলেছে এবং সেই পরিবর্তনের স্রোতে একদা দৃশ্যকাব্যের নায়ক 'দেবতা' থেকে 'মানুষে' নেমে এসেছে। তারপর সেই মানুষেরও নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর রূপ ক্রমশঃ কদর্যতা ও সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে সংস্কৃতি-সুন্দর ও মনুষ্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

নায়কের শ্রেণীবিভাগ

দৃশ্যকাব্যের নায়ককে নাট্যশাস্ত্রানুসারে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা –

১। ধীরোদ্ধত

২। ধীরললিত

৩। ধীরোদাত্ত

৪। ধীরপ্রশান্ত[১৬]

প্রায় একইরকমভাবে সাহিত্যদর্পণকার নায়কের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে বললেন যে ধীরোদাও, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত এবং ধীরপ্রশান্ত ভেদে নায়ক চারপ্রকার।[১৭] ধনঞ্জয় নায়কের শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে একটু অন্যরকমভাবে মত প্রকাশ করলেন যে নায়কের ভেদ চারপ্রকার। যথা –

১। ললিত

২। শান্ত

৩। উদাত্ত

৪। উদ্ধত[১৮]

অবশ্য নায়কের লক্ষণ দিতে গিয়ে পরবর্তী কারিকাগুলিতে ধনঞ্জয় নায়ককে ধীরোদাত্ত ইত্যাদি রূপেই উল্লেখ করেছেন। আসলে নায়কের চরিত্রে ধৈর্য বা ধীরতা একান্ত আবশ্যক ব'লেই মনে হয় নায়কের বিভিন্ন ভেদের পূর্বে 'ধীর' কথাটি যুক্ত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কেবল দৃশ্যকাব্যেই নয়, মহাকাব্যের ক্ষেত্রেও নায়কের এই চারপ্রকার ভেদ সর্ববাদীসম্মত।

ধীরোদাত্ত ঃ-

দর্পণকারের মতে ধীরোদাও নায়কের লক্ষণ হল - আত্মশ্লাঘাহীন, ক্ষমাশীল, অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির, সুখ-দুঃখে অবিচল, স্থির, অন্তর্নিহিত গর্বকে যিনি বিনয়ে আবৃত করে রাখেন এবং যিনি প্রতিশ্রুতিপালনে দৃঢ় এমন নায়ককে বলা হয় ধীরোদাত্ত নায়ক।[১৯] ধীরোদাত্ত নায়ক প্রসঙ্গে দশরপকারের অভিমতও সাহিত্যদর্পণকারের অনুরূপ।[২০] উদাত্ততা ধীরোদাত্ত নায়কের অন্যতম গুণ। অপরের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়ার নামই উদাত্ততা। নায়কের সামান্য গুণাবলী অধিকমাত্রায় ধীরোদাও নায়কের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। রাম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এই শ্রেণীর নায়ক। ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্''- নাটকের নায়ক দুষ্যন্তকে ধীরোদাত্ত নায়করূপে বিবেচনা করা যায়। নাটক, সমবকার, উল্লাপ্য ইত্যাদি জাতীয় নাট্যরচনায় ধীরোদাত্ত

চরিত্র নায়ক হিসাবে উপস্থিত হয়।

ধীরোদ্ধত ঃ-

আচার্য ধনঞ্জয়ের মতে মাত্রাতিরিক্ত দর্প ও মাৎসর্যসমন্বিত, মায়া ও বঞ্চনাপরায়ন, অহংকারী, চঞ্চল, চণ্ডস্বভাব ও আত্মপ্রশংসাপরায়ণ ব্যক্তিই ধীরোদ্ধত নায়ক।[২১] আচার্য বিশ্বনাথের মতও এ প্রসঙ্গে অনুরূপ। তাঁর মতে প্রতারক, উগ্রস্বভাব, চঞ্চলপ্রকৃতি, অহংকার-দর্পপূর্ণ, আত্মশ্লাঘাকারী নায়কই ধীরোদ্ধত নায়ক।[২২] ভীমসেন, রাবণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর নায়ক। ''মহাবীরচরিত'' নাটকের নায়ক পরশুরাম ধীরোদ্ধত নায়কের উদাহরণ।

ধীরললিত ঃ-

নিশ্চিন্ত, নৃত্যগীতাদি সুকুমারকলায় আসক্ত, সুখী এবং মৃদু স্বভাবসম্পন্ন নায়ক হলেন ধীরললিত।[২৩] রাজ্যের অর্থাগম, অর্থের সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের ভার মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতির উপর ন্যস্ত করে নায়ক নিশ্চিন্ত থাকেন এবং নিশ্চিন্ত থেকে নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যায় তিনি মনোনিবেশ করেন। এই শ্রেণীর নায়কের মধ্যে শৃংগার রসের প্রাধান্য থাকায় তিনি কোমল স্বভাববিশিষ্ট ও সুখী হন। আচার্য বিশ্বনাথও দশরূপকের অনুকরণেই ধীরললিত নায়কের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।[২৪] রত্নাবলী নাটিকার নায়ক বৎসরাজ উদয়ন এই শ্রেণীভুক্ত নায়ক।

ধীরপ্রশান্ত ঃ-

সামান্য গুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে ধীরপ্রশান্ত নায়ক বলা হয়।[২৫] বিনয় প্রভৃতি গুণকে সামান্য গুণরূপে বিবেচনা করা হয়। ধনঞ্জয় সামান্য গুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে ধীরশান্ত বা ধীরপ্রশান্ত নায়করূপে অভিহিত করলেও বৃত্তিকার ধনিক বিনয়াদি গুণযুক্ত বিপ্র, বণিক্, অমাত্যপুত্র প্রভৃতিকেও ধীরপ্রশান্ত নায়করূপে গণ্য করেছেন। ধনিকের মতে প্রকরণের নায়কমাত্রই ধীরপ্রশান্ত।[২৬] সাহিত্যদর্পণকারও একইরকমভাবে ধীরপ্রশান্ত নায়কের লক্ষণ নির্দিষ্ট করেছেন।[২৭] মালতীমাধবের মন্ত্রীপুত্র মাধব, মৃচ্ছকটিকের বণিক্ চারুদত্ত এই শ্রেণীভুক্ত নায়ক।

একই নায়ক অবস্থাভেদে ধীরোদ্ধত, ধীরোদাত্ত ইত্যাদি রূপে পরিচিত হতে পারেন। যেমন ''মহাবীরচরিত'' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ষোড়শ শ্লোকে যেখানে পরশুরাম রাবণের পরাভবকরণ এবং কার্তবীর্যার্জুনের নিধন প্রভৃতি আপন শক্তিমত্তার অহংকার প্রকাশ করেছেন সেখানে তাঁকে নিঃসন্দেহে

ধীরোদ্ধত নায়ক বলা চলে।[২৮] আবার এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে মাল্যবানের প্রতি প্রেরিত পত্রের উক্তির মধ্যে রাবণের প্রতি তাঁর ধীরোদ্ধত আচরণ পরিস্ফুট হয়েছে যখন পরশুরাম বলছেন যে ব্রাহ্মণদের অবমাননা থেকে বিরত থাকা আপনাদেরই মঙ্গলের কারণ; অন্যথায় আপনাদের বন্ধু পরশুরাম দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হবেন।[২৯] পুনরায় চতুর্থ অঙ্কে রামের নিকট পরাজিত হয়ে পরশুরাম যখন বলছেন — হে বৎস! তুমি ব্রাহ্মণবৎসল, আমার প্রিয়তর, আমার কল্যাণের জন্যই সেই অহংকারব্যাধি তুমি দূরীভূত করেছ[৩০] — তখন পরশুরামের ধীরললিত চরিত্রবৈশিষ্ট্য অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

এভাবে একই ব্যক্তির বিভিন্ন নায়কোচিত গুণে সমন্বিত হয়ে উপস্থাপিত হওয়া কোন দোষের নয়। কিন্তু এই জাতীয় উপস্থাপনা শুধুমাত্র অপ্রধান চরিত্রের ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়। প্রধান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সবসময় অক্ষুন্ন থাকাই কাম্য। সেজন্য ধীরোদাও গুণসম্পন্ন প্রধান নায়কচরিত্র রাম যখন ধীরোদ্ধত নায়কের মত কপটতা অবলম্বন করে বালিকে বধ করেন তখন তিনি নিন্দিত হন।

নায়িকার প্রতি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করেই ধীরোদাও, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরোদ্ধত - এই চারপ্রকার নায়ককে আবার চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা –

১। অনুকূল
২। দক্ষিণ
৩। শঠ
৪। ধৃষ্ট

সুতরাং সর্বমোট নায়ক ১৬ প্রকার। সাহিত্যদর্পণেও এই চারপ্রকার ভেদ স্বীকার করে মোট ১৬ প্রকার নায়কভেদ উল্লিখিত হয়েছে।[৩১]

<u>অনুকূল</u> ঃ-

যে নায়ক একজন নায়িকার প্রতি আসক্ত তিনি হলেন অনুকূল নায়ক।[৩২] এরূপ নায়ক স্বপ্নেও অন্য নায়িকাকে মনে স্থান দেননি। সাহিত্যদর্পণকারও অনুরূপ অভিমত পোষণ করে বলেন যে একটিমাত্র নায়িকাতে অনুরক্ত নায়কই অনুকূল নায়ক।[৩৩] ভবভূতি রচিত "উত্তররামচরিত" নাটকের নায়ক রামচন্দ্র অনুকূল নায়ক। উক্ত নাটকে রামচন্দ্রের সীতাগতপ্রাণতা ও পত্নীপ্রেমৈকনিষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে।

দক্ষিণ ঃ-

নবীনা নায়িকার প্রতি অনুরক্ত হয়েও যিনি জ্যেষ্ঠা নায়িকার প্রতি সহৃদয় থাকেন তাঁকেই বলা হয় দক্ষিণ নায়ক।[৩৪] এরূপ নায়ক পূর্বের নায়িকার প্রতি কখনই উদাসীন হন না। এমনকি তাঁর নবীন প্রণয়ের কথা পূর্বের নায়িকাকে বুঝতেও দেন না। আচার্য বিশ্বনাথের মতে বহু মহিলাতে যে নায়কের সমান অনুরাগ থাকে তাকে বলা হয় দক্ষিণ নায়ক।[৩৫]

শঠ ঃ-

প্রচ্ছন্নভাবে অপ্রিয় আচরণকারী নায়ক হলেন শঠ।[৩৬] এরূপ নায়ক জ্যেষ্ঠা নায়িকার ভয়ে নবীনা নায়িকার প্রতি অনুরাগের কথা গোপন করার চেষ্টা করেন। দক্ষিণ এবং শঠ - এই উভয় নায়কই অন্যের প্রতি আসক্ত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল – দক্ষিণ নায়কের হৃদয়ে জ্যেষ্ঠা নায়িকার প্রতি সহৃদয়তা ও দাক্ষিণ্য থাকে। কিন্তু শঠ নায়কের মধ্যে জেষ্ঠ্যা নায়িকার প্রতি সহৃদয়তা থাকে না। বাহ্যিকভাবে জ্যেষ্ঠা নায়িকার প্রতি সাধুতা প্রদর্শন করলেও আন্তরিকভাবে তাঁর সঙ্গে তিনি কৃত্রিম ব্যবহারই করে থাকেন। সেকারণেই বোধহয় এরূপ নায়ককে শঠ বলা হয়। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকারের অভিমত হল – যে নায়ক এক নায়িকার প্রতি অনুরাগযুক্ত অথচ অন্য নায়িকার প্রতি বাহ্যিক অনুরাগ প্রদর্শন করে গূঢ়ভাবে তাঁর অপ্রিয় কার্য করেন, তাকে বলা হয় শঠ নায়ক।[৩৭]

ধৃষ্ট ঃ-

যে নায়ক অপরাধ সত্ত্বেও নিঃশঙ্ক, তিরস্কার সত্ত্বেও লজ্জাহীন এবং দোষপ্রকাশ সত্ত্বেও মিথ্যা ভাষণ করেন সেই নায়ককে বলা হয় ধৃষ্ট নায়ক।[৩৮]

এখন প্রশ্ন ওঠে যে যদি কোন নায়কের মধ্যে অনুকূল, দক্ষিণ ইত্যাদি একাধিক লক্ষণ দেখা যায় তাহলে তাকে কোন্ শ্রেণীর নায়ক বলে বিবেচনা করা যাবে? যেমন ''রত্নাবলী'' নাটিকার নায়ক উদয়নের মধ্যে কখনও অনুকূলত্ব, কখনও দক্ষিণত্ব, কখনও শঠত্ব, আবার কখনও ধৃষ্টত্ব লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

এর উত্তরে বলা যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত উদয়নের দ্বিতীয়া নায়িকার প্রতি প্রেমভাব প্রকাশিত হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অনুকূল নায়ক। অর্থাৎ কামদেবের অর্চনা পর্যন্ত বৎসরাজ উদয়ন অনুকূল নায়ক। তারপর সাগরিকার প্রতি তাঁর আসক্তি জন্মাবার পর তিনি দক্ষিণ নায়ক।

কারও মনে এখনও সংশয় জাগতে পারে যে উদয়ন গোপনে সাগরিকার প্রেমে আবিষ্ট হয়েছে এবং বাসবদত্তাও যখন সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে ফেলেছে, তখন উদয়নের চাতুর্য্য ধরা পড়েছে। তাহলে উদয়নকে শঠ বা ধৃষ্ট নায়কও তো বলা যেতে পারে?

এর উত্তরে বলা যায় যে বৎসরাজ উদয়ন সাগরিকার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে অপরাধ করেছেন ঠিকই কিন্তু সমগ্র নাটিকাতে জ্যেষ্ঠা নায়িকার প্রতি উদয়নের ব্যবহার যথেষ্ট সহৃদয়তাপূর্ণ। সুতরাং তাঁকে সঙ্গতভাবেই দক্ষিণ নায়ক বলা যাবে। এ প্রসঙ্গে দশরূপকের কারিকায় ধনিক মন্তব্য করেন যে উভয় নায়িকার প্রতি স্নেহ বা প্রেমের প্রকাশে কোন বিরোধ নেই।[৩৯] সেজন্যই মহাকবিদের রচনায় সমস্ত নায়িকার সঙ্গে দক্ষিণ নায়কের অন্যের প্রতি পক্ষপাতশূন্য প্রেমচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

পূর্বোক্ত ১৬ (ষোল) প্রকার নায়ককে আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে নায়কের মোট ভেদ ১৬ X ৩ =৪৮ (আটচল্লিশ) প্রকার।[৪০]

আচার্য ভরত বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিশেষ শ্রেণীর নায়করূপে চিহ্নিত করেছেন। নাট্যশাস্ত্রকারের মতে নায়ক দেবতা হলে 'ধীরোদ্ধত', নৃপতি হলে 'ধীরললিত', সেনাপতি বা অমাত্য হলে 'ধীরোদাত্ত' এবং ব্রাহ্মণ ও বণিক্ হলে 'ধীরপ্রশান্ত' হবে।[৪১] অবশ্য এই শ্রেণীভেদ 'নাটকের' ক্ষেত্রেই উক্ত হয়েছে।

কিন্তু এই শ্রেণীভেদে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। কারণ নিয়মিত নাটকের নায়ক হবেন 'রাজর্ষি' এবং তিনি হবেন ধীরোদাও। অথচ উক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে যে নায়ক নৃপতি হলে 'ধীরললিত' হবে। কিন্তু দেবচরিত্রই 'ধীরোদ্ধত' হতে পারে, মনুষ্যচরিত্র নয়। কিন্তু যেহেতু এটি নাটক সম্বন্ধে বিধেয়, সেজন্য 'ব্যায়োগ' ও 'ঈহামৃগ'-এই দুই রূপকে মানুষ নায়ক হলেও তার উদ্ধত চরিত্রে কোন বাধা নেই। তবে ব্যায়োগে নায়ক উদ্ধত এবং ঈহামৃগে ধীরোদ্ধত। উদ্ধত নায়ক ধীরোদ্ধত অপেক্ষা নিকৃষ্ট, নৃশংস এবং ভীষণ – এটাই হয়তো 'ধীর' শব্দের ব্যঞ্জনা।

অনুনায়ক (নায়কের সহায়ক) ও প্রতিনায়ক

সহকারীর সাহায্য ব্যতীত সংস্কৃত রূপকের প্রধান চরিত্র বা নায়ক তাঁর ভূমিকায় সফল হতে পারেন না। নায়ককে নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। সেকারণে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নায়কের বিভিন্ন ধরণের সহকারী থাকে এবং দৃশ্যকাব্যে এই সহকারীদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে আধিকারিক বস্তুর নায়কই প্রধান নায়ক। প্রধান নায়কের কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেন তাঁরা অনুনায়ক নামে পরিচিত। পতাকা ও প্রকরীয় নায়ক অনুনায়কের মর্যাদা পায়। মূল নায়ককে সাহায্য করাতেই তাদের সার্থকতা। অপরপক্ষে নায়কের বিরুদ্ধাচরণ করাই প্রতিনায়কের কাজ। শৃংগার ও বীররসে প্রতিনায়কের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপর্ণ।

নায়কের সহযোগী হিসাবে দৃশ্যকাব্যে যাঁদের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের মধ্যে পীঠমর্দ, বিট, চেট, বিদূষক প্রভৃতিদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পতাকা নামক প্রাসঙ্গিক কথাবস্তুর নায়ককে বলা হয় পীঠর্মদ। তিনি বিচক্ষণ, নায়কের অনুচর ও ভক্ত এবং নায়ক অপেক্ষা কম গুণসম্পন্ন।[৪২] সাহিত্যপর্দণেও পীঠমর্দকে প্রধান নায়কের কার্যসিদ্ধির সহায় এবং নায়ক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কমগুণসম্পন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৩]

পীঠমর্দকে উত্তম শ্রেণীর সহায়ক বলে গণ্য করা হয়। "মালতীমাধব" নাটকে মকরন্দ এবং রামায়নে সুগ্রীব হলেন পীঠমর্দ। তাঁরা যথাক্রমে নায়ক মাধবের এবং রামচন্দ্রের কার্যসিদ্ধির সহায়ক। এঁরা উভয়েই বিচক্ষণ এবং নায়কের একান্ত অনুগত। তাছাড়া তাঁরা নায়ক অপেক্ষা কম গুণবান।

পতাকা নায়ক পীঠমর্দ ছাড়া নায়কের সহায়ক হিসাবে যিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন তিনি হলেন বিট। সম্ভোগের জন্য ধনহীন, ধূর্ত, বিভিন্ন কলাবিদ্যায় অংশত অভিজ্ঞ, বেশ রচনায় দক্ষ, বাগ্মী, লোকপ্রিয় এবং সভাস্থলে সমাদৃত সহায়ককে বলে বিট।[৪৪] নাট্যশাস্ত্রকারের মতে বিট হবেন নাট্য প্রয়োগ সম্বন্ধে সূত্রধারের সকল গুণবিশিষ্ট, গণিকাগণের সঙ্গে ব্যবহারে বিশেষজ্ঞ, মধুরভাষী, পক্ষপাতহীন, কবিভাবাপন্ন, শাস্ত্রার্থ ও গণিকা সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন, ঊহাপোহ – অর্থাৎ ইতি ও নেতিবাচক যুক্তিসম্পন্ন, বাগ্মী ও চতুর।[৪৫] মৃচ্ছকটিক নাটকে শকারের সহায়ক হলেন বিট। অবশ্য তিনি বুদ্ধি, রুচিবোধ, সৌজন্য ও কবিদৃষ্টির গুণে প্রীতির পাত্র হয়েছেন।

নায়কের অপর সহায়ক চেট। কলহপ্রিয়, মুখর, কুৎসিত, দাসরূপে সেবাকারী, সম্মাননীয় এবং অসম্মাননীয় ব্যক্তির মধ্যে প্রভেদকারী ব্যক্তি হল চেট।[৪৬]

বিদূষক ঃ-

বিদূষক নায়কের এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। ইনি নায়কের মধ্যমশ্রেণীর সহায়ক। ক্রিয়াকলাপ, দেহভঙ্গী, পোষাক, বাক্য ইত্যাদির সাহায্যে বিদূষক হাস্য উদ্রেক করেন। তিনি বিবাদপ্রিয় এবং ভোজনরসিক। পুষ্প, বসন্ত ইত্যাদি নামে তিনি পরিচিত।[৪৭] ধনঞ্জয় বিদূষককে কেবল হাস্যকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৮] ধনিক মনে করেন যে বিদূষকের আজব চেহারা এবং অদ্ভুত বেশভূষা হাস্যোদ্রেকের সহায়ক।[৪৯] নাট্যশাস্ত্রকার বিদূষককে বলেছেন বামনাকৃতি, বৃহৎদন্তযুক্ত, কুব্জপৃষ্ঠ, দ্বিজিহ্ব, টাকমাথা ও পিঙ্গলচক্ষু ব্যক্তি।[৫০] আচার্য ভরত বিদূষককে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা – ১) সন্ন্যাসী, ২) ব্রাহ্মণ, ৩) অন্যান্য দ্বিজ এবং ৪) শিষ্য। দেবতাদের ক্ষেত্রে বিদূষক হলেন সন্ন্যাসী, রাজার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, অমাত্যদের ক্ষেত্রে অন্যান্য দ্বিজ এবং ব্রাহ্মণগণের ক্ষেত্রে শিষ্য। এঁরা প্রিয়ার বিরহে নায়কের সখা ও বাক্‌পটু হবেন।[৫১]

রাজপ্রাসাদে যাতায়াতে বিদূষকের অবাধ অধিকার। তিনি নায়কের সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা বলেন এবং নায়কের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মত আচরণ করেন। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের মাধব্য, "বিক্রমোর্বশীয়ম্" এর মানবক, "মৃচ্ছকটিকম্" প্রকরণের মৈত্রেয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বিদূষক চরিত্র। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"-এর বিদূষক মাধব্য এবং "মৃচ্ছকটিকম্" প্রকরণের মৈত্রেয় নায়কের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে নিজ নিজ চরিত্রগুণে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে।

দৃশ্যকাব্যের কোন নায়ক রাজা হলে সেই রাজার নিজের রাজ্য এবং অপরের রাজ্য সম্বন্ধে যিনি কর্তব্য অকর্তব্য চিন্তা করে থাকেন তিনি হলেন মন্ত্রীরূপ সহায়।[৫২] মন্ত্রী প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে তাঁরাই হবেন পুরোধা ও মন্ত্রী যাঁরা উচ্চ বংশজাত, বুদ্ধিমান, শ্রুতি ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞ, রাজার স্বদেশবাসী, রাজার অনুরক্ত, শুদ্ধ ও ধর্মনিষ্ঠ।[৫৩]

অন্তঃপুরে নায়কের সহায়করূপে যাঁরা থাকেন তাঁরা হলেন বামন, ক্লীব,ব্যাধ, ম্লেচ্ছ, গোপালক, শকার, কুব্জ প্রভৃতি। এদের মধ্যে শকার হল মদ, মূর্খতা ও অহংকারযুক্ত, নীচবংশসম্ভূত, অবিবাহিতার ভাই রাজার শ্যালক বিশেষ।[৫৪] আচার্য ভরতের মতে উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ও অলংকার পরিহিত, বিনাকারণে

ক্রোধপরায়ন ও প্রসন্ন, অধম চরিত্র, মাগধী প্রাকৃতভাষী এবং বহু বিকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি শকার।[৫৫]

এঁরা ছাড়াও নায়কের সহায়রূপে যাঁদের উপস্থিতি লক্ষিত হয় তাঁরা হলেন বন্ধুপুত্র, বনেচর, সামন্তরাজা, সৈনিক প্রভৃতি দণ্ডসহায়[৫৬] এবং ঋত্বিক, পুরোহিত, ব্রহ্মবিদ্, তাপস প্রভৃতি ধর্মসহায়।[৫৭]

ধর্ম-অর্থ-কাম- এই ত্রিবর্গসাধনই মানুষের লক্ষ্য। সুতরাং নায়কের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম থাকে না। ত্রিবর্গসাধন এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ধর্মীয় সহায়রূপে নায়ককে সাহায্য করেন মুনি, ঋষি এবং ধর্মীয় পুরোহিতগণ। আভ্যন্তরীণ শান্তি, সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ইত্যাদির উপর কোন দেশের যে সাফল্য নির্ভর করে সে বিষয়ে নায়ককে সহায়তা করে মন্ত্রীসভা। আবার বহিরাক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করা, শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানো, অপরাধী বা আইনভঙ্গকারীকে শাস্তিদান প্রভৃতির উপরেও রাজ্যের শান্তি, শৃংখলা, সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। এ ব্যাপারে নায়ককে সহায়তা করেন তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন ও সৈন্যসামন্তগণ। এতদ্ব্যতীত নায়কের সহায়রূপে অলৌকিক শক্তি ও দেবদেবীর কথাও বলা যায়। কারণ কালিদাস ও ভাসের নাটকে নায়কেরা তাঁদের নিদারুণ প্রয়োজনে স্বর্গীয় শক্তির সহায়তা লাভ করেছেন। নায়কের এই সমস্ত সহায়দিগের মধ্যে পীঠমর্দ, মন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতি উত্তম সহায়। বিট ও বিদূষক রাজার মধ্যম সহায়। শকার, চেট, তাম্বুলিক, গান্ধিক প্রভৃতি রাজার অধম সহায়।[৫৮]

প্রতিনায়ক ঃ-

প্রতিনায়ক হল নায়কের প্রতিপক্ষ। তার কাজ হল নায়কের বিরুদ্ধাচরণ করা। নায়কের ফলপ্রাপ্তিতে যে বিঘ্ন উপস্থিত হয় কোন কোন রূপকে সেই বিঘ্নের কারণ হল প্রতিনায়ক। পাশ্চাত্য নাটকে প্রতিনায়ক Villain নামে অভিহিত। লোভ, ঔদ্ধত্য, পাপ,ব্যসনাসক্তি, একগুঁয়েমি – এই চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য।[৫৯] সাহিত্যদর্পণকারের মতে প্রতিনায়ক হল ধীরোদ্ধত, পাপাচারী এবং ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি।[৬০] রাবণ এবং দুর্যোধন যথাক্রমে রাম এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতিনায়ক।

নায়িকা

দৃশ্যকাব্যে নায়কের মতই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল নায়িকা। বিশেষতঃ শৃঙ্গাররসাত্মক রূপকে নায়িকা নিঃসন্দেহে এক আবশ্যিক অঙ্গ। নায়িকা-চরিত্র সৃজনের উপর অনেকাংশে নাট্যকলার সাফল্য নির্ভর করে। নায়কের প্রধান প্রধান গুণগুলি নায়িকাতেও থাকা বাঞ্ছনীয়।[৬১] সেই গুণের ভিত্তিতে নায়িকাকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় বলে মনে করেন দশরূপককার। যথা –

১। স্বীয়া বা নিজের স্ত্রী।

২। অন্যা বা পরস্ত্রী।

৩। সাধারণী স্ত্রী[৬২]।

সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থেও নায়িকার এই তিনপ্রকার প্রাথমিক ভেদের কথা বলা হয়েছে।[৬৩]

স্বীয়া ঃ-

বিনয়, সরলতা প্রভৃতি গুণযুক্তা, গৃহকর্মনিপুণা পতিব্রতা স্ত্রীকে বলা হয় স্বীয়া নায়িকা।[৬৪] দশরপককারের মতে স্বীয়া হল শীল, লজ্জা প্রভৃতি গুণযুক্তা নায়িকা।[৬৫] এই নায়িকা সদাচারযুক্তা, পতিব্রতা, অকুটিলা, লজ্জাশীলা এবং পতির প্রতি ব্যবহারে নিপুণ।[৬৬] ভবভূতি রচিত "উত্তররামচরিত" এর সীতা স্বীয়া নায়িকা।

স্বীয়া নায়িকা আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা –

১। মুগ্ধা

২। মধ্যা

৩। প্রগল্ভা[৬৭]

স্বীয়া নায়িকার এই ত্রিবিধ ভেদ সম্পর্কে ধনঞ্জয়ও সহমত পোষণ করেছেন।[৬৮]

মুগ্ধা ঃ-

নব বয়ঃপ্রাপ্তা, রতিবিমুখ এবং ক্রোধে মৃদুস্বভাবা নায়িকাকে বলা হয় মুগ্ধা।[৬৯] অর্থাৎ যার মধ্যে তারুণ্য ও প্রেমভাব সদ্য উন্মেষিত হয়েছে, যে রতিবিষয়ে বিমুখ এবং যাকে অনায়াসে প্রসন্ন করা যায় সে মুগ্ধা নায়িকা। সুতরাং ধনঞ্জয়ের মতে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মুগ্ধা নায়িকা চারপ্রকার। যথা – ১) বয়োমুগ্ধা, ২) কামমুগ্ধা, ৩) রতিবামা এবং ৪) মৃদুকোপা।

সাহিত্যদর্পণকারের মতে প্রথমাবতীর্ণযৌবনা অর্থাৎ সদ্য যৌবনবতী, প্রথমাবতীর্ণমদনবিকারা, রতিবিষয়ে প্রতিকূল, মৃদু মানবতী এবং অত্যন্ত লজ্জাশীলা নায়িকাকে বলে মুগ্ধা।[৭০] সুতরাং বিশ্বনাথের দেওয়া মুগ্ধা নায়িকার সামান্য লক্ষণ থেকে এই নায়িকার পাঁচপ্রকার ভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যথা – ১) প্রথমাবতীর্ণযৌবনা, ২) প্রথমাবতীর্ণমদনবিকারা ৩) রতিবামা, ৪) মৃদু মানবতী এবং ৫) অধিক লজ্জাশীলা।

মধ্যা ঃ-

স্বীয়া নায়িকার দ্বিতীয় ভেদ হল মধ্যা। উদ্যতযৌবনা, উদ্ভিন্নকামা এবং মোহান্ত পর্যন্ত সুরতসক্ষমা রমণীই মধ্যা নায়িকা।[৭১] অর্থাৎ মধ্যা নায়িকা যৌবন ও কাম – উভয় দিক দিয়েই পরিণতা। এই নায়িকা মোহগ্রস্ত হওয়া পর্যন্ত রতি ক্রীড়ায় সমর্থ। মধ্যা নায়িকার লক্ষণ অনুসারে ধনঞ্জয় এই নায়িকাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা – ১) যৌবনবতী, ২) কামবতী এবং ৩) মোহান্তসুরতসক্ষমা।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে বিচিত্রসুরতা, কামনিপুণা, পূর্ণযৌবনা, ঈষৎ-প্রগলভবচনা, মধ্যমব্রীড়িতা বা ঈষৎ লজ্জাশীলা রমণীই মধ্যা নায়িকা।[৭২] সাহিত্যদর্পণকারের দেওয়া মধ্যা নায়িকার এই লক্ষণ থেকে এর পাঁচপ্রকার ভেদ প্রকাশিত হয়। যথা – ১) বিচিত্রসুরতা, ২) প্ররূঢ়স্মরা, ৩) প্ররূঢ়যৌবনা, ৪) ঈষৎপ্রগল্‌ভবচনা এবং ৫) মধ্যমব্রীড়িতা।

প্রগল্‌ভা ঃ-

কামান্ধা, পূর্ণযৌবনা, সমস্তরতিক্রীড়া পারদর্শিনী, ভাবোন্নতা, স্বল্পলজ্জা এবং আক্রান্তনায়ক রমণীকে বলা হয় প্রগল্‌ভা।[৭৩] ধনঞ্জয়ও প্রায় একই রকমভাবে বললেন যে যৌবনান্ধা, প্রেমোন্মত্তা, দয়িতলগ্না, সুরতক্রীড়া আরম্ভের আনন্দাতিশয্যে অচেতনপ্রায় নায়িকা হল প্রগলভা।[৭৪] প্রকৃতপক্ষে প্রগল্‌ভা নায়িকার মধ্যে লজ্জা প্রায় থাকে না বললেই চলে। এই ধরনের নায়িকা সমস্ত ছলাকলায় পটু, হাব-ভাব-বিলাসে নিপুণা এবং রতিক্রীড়াকালে নায়কের দেহের সঙ্গে আবদ্ধ থাকতে অভিলাষ প্রকাশ করে।

নায়ক অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত হলে মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকা নায়কের এই আচরণ দেখে ক্রোধ প্রকাশ করে। ক্রোধ প্রকাশের ভিন্নতা অনুসারে মধ্যা এবং প্রগলভা – এই উভয় নায়িকা ধীরা, অধীরা, এবং ধীরাধীরা ভেদে তিনপ্রকার তিনপ্রকার করে ৬ (ছয়) প্রকার।[৭৫] অর্থাৎ মধ্যা নায়িকার তিনটি ভেদ হল–

১। মধ্যা ধীরা

২। মধ্যা অধীরা

৩। মধ্যা ধীরাধীরা

আবার প্রগল্‌ভা নায়িকার তিনটি ভেদ যথা –

১। ধীরা প্রগল্‌ভা

২। অধীরা প্রগল্‌ভা

৩। ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা

নায়ক অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত হয়েছে অথবা নায়ক প্রণয়ঘটিত কোন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে এমন বিষয় জানতে পারলে মধ্যা ধীরা নায়িকা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং নায়ককে বাক্যবাণে জর্জরিত করে। মধ্যা অধীরা নায়িকা নায়ককে কটুবাক্য বলে তিরস্কার করে। আর মধ্যা ধীরাধীরা নায়িকা অশ্রুপাতের দ্বারা নিজের ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে।[৭৬] সুতরাং নায়কের প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ, বক্রোক্তি বাক্যে নায়ককে বিদ্ধ করা মধ্যা নায়িকার বৈশিষ্ট্য।

ধীরা প্রগল্‌ভা দুভাবে নিজের কোপ প্রকাশ করে। ১) ক্রোধ গোপন রেখে নায়ককে অতিরিক্ত আদরের দ্বারা লজ্জিত করে। ২) রতিবিষয়ে উদাসীন থেকে সুরতক্রীড়ায় নায়কের সঙ্গে অসহযোগিতা করে। অধীরা প্রগল্‌ভা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নায়ককে ভর্ৎসনা করে, এমনকি নায়কের উপর শারীরিক নির্যাতনও করে। আর ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা নায়িকা নায়ককে বক্রোক্তিপূর্ণ বাক্যে জর্জরিত করে।[৭৭] এ বিষয়ে সাহিত্যদর্পণকারের অভিমতও একইরকম। বিশ্বনাথের মতে ধীরা প্রগল্‌ভা নায়িকা ক্রোধকে প্রচ্ছন্ন রাখে এবং পতিকে বাহ্যিক আদর দেখিয়ে রতিক্রীড়ায় উদাসীন থাকে।[৭৮] ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা আপাত মধুরবাক্যে নায়ককে কষ্ট দেয়[৭৯] এবং অধীরা প্রগল্‌ভা নায়ককে ভর্ৎসনা ও প্রহার করে।[৮০]

মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকাকে ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ভেদে যে ছয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাদের আবার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভেদে দুভাগে ভাগ করা যায়।[৮১] এভাবে মধ্যা ও প্রগলভা নায়িকার বারোটি ভেদ। আর মুগ্ধা নায়িকা একশ্রেণীর। সুতরাং সবমিলিয়ে স্বীয়া নায়িকার তেরোটি ভেদ স্বীকার করা হয়।[৮২] একনজরে বিষয়টি বোঝার জন্য নীচে একটা ছক দেওয়া হল।
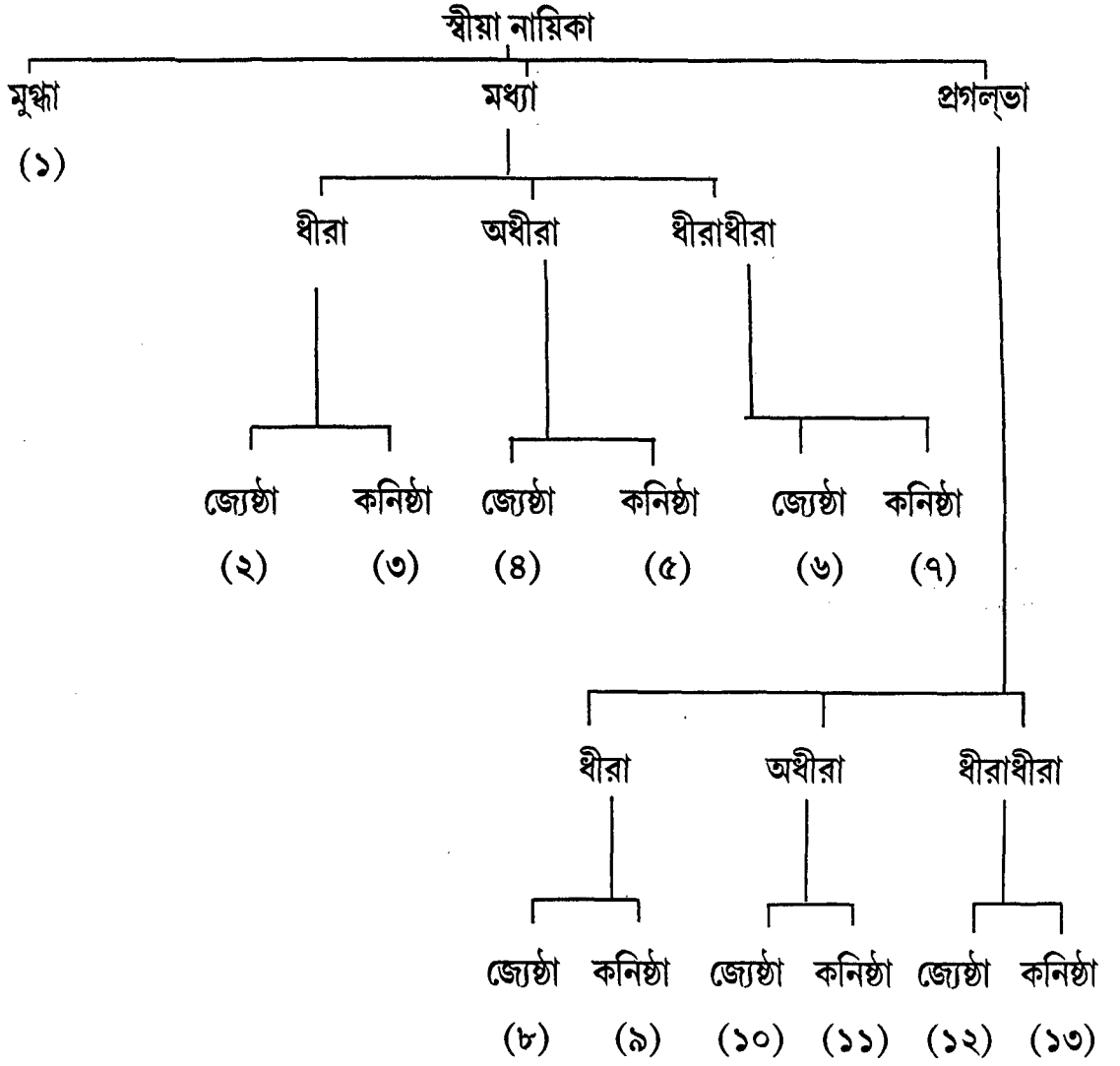
<u>অন্যস্ত্রী বা পরকীয়া নায়িকা</u> ঃ-

কন্যা (অবিবাহিতা) ও পরস্ত্রী (বিবাহিতা) ভেদে অন্যস্ত্রী বা পরকীয়া নায়িকাকে দুভাগে ভাগ করা যায়।৮৩ অর্থাৎ অন্যস্ত্রী বা পরকীয়া নায়িকা দুপ্রকার। যথা –

১। কন্যা বা অবিবাহিতা

২। পরস্ত্রী বা বিবাহিতা

নবযৌবনা, লজ্জাশীলা, অবিবাহিতা নায়িকাকে কন্যা বলা হয়।[৮৪] কন্যা বা অবিবাহিতা নায়িকা পিতার অধীনে থাকে বলে অপরিণীতা হওয়া সত্ত্বেও তাকে পরকীয়া বলা হয়। কন্যার পিতা-মাতা ইত্যাদি গুরুজনদের ভয়ে নায়ক গোপনে তার সঙ্গে প্রেম করে। তাই এই নায়িকা যেমন পরবশা অর্থাৎ পিত্রাদি

গুরুজনের আজ্ঞাধীন, নায়কও তেমনি পরিণীতা জ্যেষ্ঠা নায়িকার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে সদাই আতঙ্কিত থাকে। সেকারণেই অবিবাহিতা কন্যার সঙ্গে প্রণয়কে পরকীয়া বলে বিবেচনা করা হয়। মালতীমাধব নাটকে মালতীর প্রতি মাধবের প্রেম এবং রত্নাবলী নাটিকায় সাগরিকার প্রতি উদয়নের আসক্তি পরকীয়া প্রেমের উদাহরণ। পরকীয়া কন্যার সঙ্গে এরূপ প্রণয় বৃত্তান্তকে কবি নিজের ইচ্ছানুসারে প্রধান বা অপ্রধানরূপে মৌল রসের বিষয়ীভূত করে উপস্থাপিত করতে পারেন।[৮৫]

বিবাহিতা স্ত্রীও কখনও কখনও উপনায়কের প্রতি আসক্ত হয়। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় মর্যাদার দৃষ্টিতে এই পরকীয়া প্রেম অবাঞ্ছিত ও অনুচিত। সেহেতু অঙ্গীরসের আলম্বন বিভাবরূপে এরূপ নায়িকার চিত্রণ অসমীচীন। কিন্তু বাস্তবে এরূপ পরকীয়া প্রেম সংঘটিত হয় বলে রসশাস্ত্রে এর দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

আর একপ্রকার নায়িকা হল সাধারণী স্ত্রী বা সামান্যনায়িকা। সাধারণতঃ গণিকাকেই সাধারণী স্ত্রী বলা হয়। গণিকা হলেও তার মধ্যে নায়িকাসুলভ কিছু গুণ যথা কলাবিদ্যায় নৈপুণ্য, প্রগল্‌ভতা ইত্যাদি থাকে।[৮৬] সাহিত্যদর্পণকারের মতে শিক্ষিতা ও কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী বারবনিতাই সামান্যনায়িকা।[৮৭] প্রকরণ নামক রূপকে কুলস্ত্রী ও গণিকা – এই উভয়শ্রেণীর নায়িকার উপস্থিতি দেখা যায়। যথা – মৃচ্ছকটিক প্রকরণে চারুদত্তের স্ত্রী ধূতাদেবী কুলস্ত্রী এবং বারবনিতা বসন্তসেনা সামান্য-নায়িকা। এই বসন্তসেনা শিক্ষিতা, প্রগল্‌ভা ও কলানিপুণা।

সুতরাং স্বীয়া নায়িকার তেরোটি ভেদ; কন্যা (অবিবাহিতা) ও পরস্ত্রী (বিবাহিতা) রূপে পরকীয়া নায়িকার দুটি ভেদ এবং সাধারণী স্ত্রী – এভাবে নায়িকার সংখ্যা ১৬ (ষোল) বলে গণ্য করা হয়। এই নায়িকারা আবার অবস্থাভেদে আটপ্রকার।[৮৮] যথা –

১। স্বাধীনভর্তৃকা
২। খণ্ডিতা
৩। অভিসারিকা
৪। কলহান্তরিতা
৫। বিপ্রলবদ্ধা
৬। প্রোষিতভর্তৃকা
৭। বাসকসজ্জা

৮। বিরহোৎকন্ঠিতা[৮৯]

স্বাধীনভর্ত্তৃকা ঃ-

রতিগুণে আকৃষ্ট হয়ে যে নায়িকার সান্নিধ্য পতি ত্যাগ করতে পারে না এবং যে নায়িকা নানাবিধ বিলাসে আসক্তা তাকেই বলা হয় স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকা।[৯০] দশরূপককারের মতে যে নায়িকা প্রিয়তমের কাছে থেকে প্রসন্ন হয় তাকে বলে স্বাধীনভর্ত্তৃকা।[৯১]

খণ্ডিতা ঃ-

যার প্রিয় অন্য নায়িকার সম্ভোগচিহ্ন ধারণ ক'রে নায়িকার নিকট আসে সেই ঈর্ষাকাতর নায়িকার নাম খণ্ডিতা।[৯২] নায়িকা যখন জানতে পারে যে নায়ক অপর নায়িকার সঙ্গসুখ উপভোগ করে এসেছে এবং তার শরীরে নানা সম্ভোগচিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয়েছে তখন নায়িকা ক্রোধে ও ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়ে। সেজন্য ধনঞ্জয় এ প্রসঙ্গে বলেন যে অন্য নায়িকার সম্ভোগচিহ্ন নায়কের অঙ্গে দেখে যে নায়িকা ঈর্ষাপরবশ হয়ে ক্রুদ্ধ হয় তাকেই বলে খণ্ডিতা নায়িকা।[৯৩]

অভিসারিকা ঃ-

অভিসারিকা বলতে বোঝায় যে অভিসারণ করে বা অভিসারণ করায়। তাই যে নায়িকা কামবশে প্রিয়কে অভিসার করায় বা স্বয়ং অভিসার করে তাকে বলে অভিসারিকা।[৯৪] অনুরূপভাবে দশরূপককারও বললেন যে কামপরবশ হয়ে যে নায়িকা নায়কের কাছে গমন করে অথবা তাকে কাছে আহ্বান করে তাকে অভিসারিকা বলে।[৯৫] সুতরাং এক শ্রেণীর অভিসারিকা নিজেই অভিসারে প্রবৃত্ত হয় এবং অপর শ্রেণীর অভিসারিকা নায়ককে অভিসারণে প্রবৃত্ত করে।

কোন ধরনের অভিসারিকা নায়িকা কেমনভাবে এবং কেমন স্থানে অভিসার করবে অলংকার শাস্ত্রে তারও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন কুলজা বা কুলবধূ অভিসারিকা অভিসারের সময় সংকুচিত গাত্রী ও অবগুন্ঠনে আচ্ছাদিতা হবে এবং যাতে অলংকারের কোন শব্দ না হয় সেবিষয়ে বিশেষ সাবধান হবে।[৯৬] আবার অভিসারিকা যদি বেশ্যা হয় তাহলে তার বেশ হবে বিচিত্র ও উজ্জ্বল, তার নূপুর ও কঙ্কণের শব্দ হবে এবং আনন্দে তার মুখ হবে উজ্জ্বল।[৯৭] আর অভিসারিকা যদি দাসী হয় তাহলে বিলাসবশতঃ তার নয়ন দুটি উৎফুল্ল হয়, কামের উত্তেজনায় তার আলাপ বিকৃত হয় এবং চলতে চলতে তার বারংবার পদস্খলন হতে থাকে।[৯৮] এ প্রসঙ্গে কুলটা অভিসারিকার অভিসারের আটটি স্থানের কথাও

উল্লিখিত হয়েছে সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে। এই আটটি অভিসারের স্থান হল – শস্যক্ষেত্র, নির্জনবাস্তুস্থান, ভগ্নদেবালয়, দূতীগৃহ, বন, উপবন, শ্মশান এবং নদীতট। এছাড়াও অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন কোন স্থানেও কুলটা অভিসারিকাগণ অভিসার করে থাকে।[৯৯]

কলহান্তরিতা ঃ-

কোপবশতঃ যে নায়িকা নায়ককে তিরস্কার করে কিন্তু পরে নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয় এমন নয়িকাকে বলে কলহান্তরিতা।[১০০] এই নায়িকা সম্পর্কে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন বিশ্বনাথ। তাই তিনিও বলেন, যে নায়িকা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রিয়ভাষী নায়ককে পরিত্যাগ করে পরে অনুতপ্ত হয় সে কলহান্তরিতা।[১০১] খণ্ডিতা নায়িকার সঙ্গে কলহান্তরিতা নায়িকার মূলগত প্রভেদ হল — কলহান্তরিতা নায়িকা প্রিয়তমের প্রতি নিষ্করুণ ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়। কিন্তু খণ্ডিতা নায়িকার মধ্যে পশ্চাত্তাপ অনুতাপ থাকে না।

বিপ্রলব্ধা ঃ-

নায়ক কথা দিয়েছিল নায়িকার সঙ্গে মিলিত হবে। কিন্তু কথা দেওয়া সত্ত্বেও সে যথা সময়ে সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হয়নি। ফলে নায়িকা হয়েছে প্রতারিতা ও অপমানিতা। তাই যে নায়িকা যথাসময়ে সংকেতস্থানে নায়কের অনুপস্থিতির জন্য অপমানিতা হয় তাকেই বলে বিপ্রলব্ধা।[১০২] এ বিষয়ে সাহিত্যদর্পণকারের অভিমতও অনুরূপ। তাঁর মতে সঙ্কেত করার পরও প্রিয় কাছে না আসায় অপমানিতা নায়িকা বিপ্রলব্ধা।[১০৩]

প্রোষিতভর্তৃকা ঃ-

নানা কার্যবশতঃ যার পতি দূরদেশে গেছে এমন কামার্তা স্ত্রীকে বলা হয় প্রোষিতভর্তৃকা।[১০৪] এই নায়িকার অপর পারিভাষিক নাম প্রোষিতপ্রিয়া।[১০৫] প্রিয়ের প্রবাসজন্য কামপীড়া অনুভব করাই এই নায়িকার বৈশিষ্ট্য। কালিদাস রচিত মেঘদূত কাব্যের নায়ক যক্ষ কুবেরের শাপে সুদূর রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হয়েছিলেন। বিরহিনী যক্ষপ্রিয়া প্রোষিতভর্তৃকা বা প্রোষিতপ্রিয়া নায়িকার উদাহরণ।

বাসকসজ্জা ঃ-

প্রিয়তমের আগমন সম্ভাবনায় যে নারী আনন্দে নিজেকে সজ্জিত করে তাকে বলা হয় বাসকসজ্জা।[১০৬] এই নায়িকা নিজেকে যেমন নানা আভরণ ও প্রসাধনে সজ্জিত করে তেমনি প্রিয়তমকে

খুশী করার জন্য নিজের ঘরটিকেও সাজিয়ে রাখে। সাহিত্যদর্পণকার তাই এই নায়িকার লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে বললেন যে সুসজ্জিত বাসগৃহে সখীগণ যার প্রসাধন করে, সেই প্রিয় সঙ্গমে উদ্বেলিতা নায়িকা বাসকসজ্জা।[১০৭]

বিরহোৎকন্ঠিতা ঃ-

আসার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কোন কারণে নায়কের অনুপস্থিতিবশতঃ দুঃখিত যে নায়িকা তাকে বলে বিরহোৎকন্ঠিতা।[১০৮] নায়কের অকারণ বিলম্ব নায়িকার মনে এক আশঙ্কা ও উৎকন্ঠা সৃষ্টি করে। তাই এরূপ নায়িকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ধনঞ্জয়ও বললেন যে প্রিয় নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কোন কারণে তার আগমনে বিলম্ব হলে নায়কের জন্য উৎকন্ঠিতা নারীকে বলা হয় বিরহোৎকন্ঠিতা।[১০৯]

উপরিউক্ত আট প্রকার নায়িকার মধ্যে খণ্ডিতা, অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও বিরহোৎকন্ঠিতা নায়িকাকে চিন্তা, নিঃশ্বাস, খেদ, অশ্রু, বিবর্ণতা, গ্লানি ও ভূষণহীনতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আর স্বাধীনভর্ত্তৃকা ও বাসকসজ্জা নায়িকার সামান্য লক্ষণ হল ক্রীড়া, ঔজ্জ্বল্য ও হর্ষ।[১১০]

অতএব স্বীয়া নায়িকার তেরোটি ভেদ, কন্যা (অবিবাহিতা) ও পরস্ত্রী (বিবাহিতা) রূপে পরকীয়া নায়িকার দুটি ভেদ এবং সাধারণী স্ত্রী – এভাবে নায়িকার সংখ্যা যে ষোল হল, সেই ষোল প্রকার নায়িকা প্রত্যেকে আবার স্বাধীনভর্ত্তৃকা, খণ্ডিতা, অভিসারিকা ইত্যাদি আটভাগে ভাগ হওয়ায় মোট একশত আটাশ প্রকার নায়িকা হল। আবার এই একশত আটাশ প্রকার নায়িকা উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে মোট তিনশত চুরাশি প্রকার।[১১১] নায়িকার এতসব ভেদ বিভেদ একমাত্র শৃংগার রসের প্রয়োজনেই কল্পিত। এর থেকে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলির উপযোগ অনুধাবন করা যায়।

নায়িকার শ্রেণীবিভাজন প্রসঙ্গে ভরতের দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য পৃথক। ভরতের মতে নায়িকার ভেদ চারপ্রকার। যথা –

১। দিব্য
২। নৃপপত্নী
৩। কুলস্ত্রী
৪। গণিকা[১১২]

উপরিউক্ত নায়িকার চারপ্রকার বিভাজনের প্রত্যেককে আবার নাট্যাচার্য চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা –

১। ধীরা
২। ললিতা
৩। উদাত্তা
৪। নিভৃতা[১১৩]

পদমর্যাদা এবং মাত্রানুসারে রাজপ্রাসাদের যে সব অন্তঃপুরচারীদের সঙ্গে নায়কের ব্যবহারিক সম্পর্ক থাকত আচার্য ভরত তাদেরও শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পত্নীর ও গৃহিণীর মর্যাদা পেত, আর অন্যেরা নায়কের ইচ্ছাপূরণ ও আনন্দদানের জন্য নায়কের আনুগত্য স্বীকার করে সহকারী হিসাবে থাকত। ভরত তাদের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন আঠারো প্রকার। এঁরা হলেন –

১। মহাদেবী (প্রধানা মহিষী)
২। দেবী (অন্য রানী)
৩। স্বামিনী (উচ্চবংশীয়া)
৪। স্ত্রী
৫। স্থায়িনী (সাধারণ স্ত্রী)
৬। ভোগিনী (উপপত্নী)
৭। শিল্পকারিনী
৮। নাটকীয়া (নটী)
৯। নর্তকী
১০। অনুচারিকা (সর্বকালীন পরিচারিকা)
১১। পরিচারিকা (বিশেষ কাজের জন্য)
১২। সঞ্চারিকা (সর্বদা গতিশীল পরিচারিকা)
১৩। প্রেষণচারিকা (নানা কাজের জন্য যে পরিচারিকা ঘুরে বেড়ায়)
১৪। মহত্তরী (বর্ষীয়সী ম্যাট্রনজাতীয়া)
১৫। প্রতিহারী
১৬। কুমারী
১৭। স্থবিরা (বৃদ্ধা নারী)
১৮। আয়ুক্তিকা (নারী পরিদর্শিকা)[১১৪]

নায়িকার গুণ

দৃশ্যকাব্যে যে নায়িকাচরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই নায়িকা নিম্নলিখিত গুণসম্পন্না হবেন বলে মনে করা হয়। যথা সুগঠিত দেহ, সদ্‌গুণবতী, সচ্চরিত্রা, যুবতী, সোনার হার, মালা ও অলংকারভূষিতা, দীপ্তা, স্নেহপরায়ণা, প্রীতিপূর্ণা, মধুরভাষিণী, সুস্বরা, নাট্যসংক্রান্ত অভ্যাসে স্থির, সব তাল ও রসে অভিজ্ঞা, সর্বাভরণভূষিতা ও মাল্যসুগন্ধি দ্রব্যে সজ্জিতা।[১১৫]

তবে নায়িকার স্বাভাবিক গুণ হল সত্ত্বগুণ। স্ত্রীলোকের পক্ষে এই গুণগুলি অলংকারস্বরূপ। নায়িকারা যৌবনে এই সব গুণের দ্বারা বিভূষিতা হয়। এই গুণগুলির সংখ্যা নিয়ে আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। দশরূপককারের মতে নায়িকাদের গুণের সংখ্যা কুড়িটি।[১১৬] অপরপক্ষে সাহিত্যদর্পণকার নায়িকাদের অলংকারস্বরূপ আটাশটি গুণের কথা স্বীকার করেছেন।[১১৭]

নায়িকার সত্ত্বগুণসমন্বিত কুড়িটি অলংকারের মধ্যে তিনটি শরীরজ বা শারীরিক। যথা –

১। হাব
২। ভাব
৩। হেলা

উক্ত শারীরিক গুণগুলি প্রযত্নসাধ্য। এগুলি ব্যতীত আর যেকয়টি গুণ অযত্ন সাধিত বা যত্নব্যতিরেকেই উদ্ভূত সেগুলির সংখ্যা সাত। যথা –

১। শোভা
২। কান্তি
৩। দীপ্তি
৪। মাধুর্য্য
৫। প্রগল্‌ভতা
৬। ঔদার্য্য
৭। ধৈর্য্য[১১৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এই দশটি গুণ নায়কদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।[১১৯]

বিশ্বনাথও হাব, ভাব ও হেলা – এই তিনপ্রকার অলংকারকে অঙ্গজাত বলে উল্লেখ করেন। এই অলংকারত্রয়কে অঙ্গজাত বলা হয় কারণ এই তিনটি ভাব চিত্ত থেকে উৎপন্ন হলেও ভ্রূ, চক্ষুর ভঙ্গিমা ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। আর শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য্য – এই সাতটিকে বলা অযত্নজাত অলংকার।[১২০] কারণ এই গুণসমূহকে প্রকটিত করার জন্য নায়িকাদের কোন প্রকার চেষ্টা করতে হয় না।

পূর্বোল্লিখিত শরীরজ তিনপ্রকার এবং অযত্নজাত সাতপ্রকার অলংকার ব্যতীত অবশিষ্ট দশটি অলংকারকে বলা হয় নায়িকার স্বভাবগত বা স্বভাবজাত ভাব। এই গুণগুলি নায়িকার স্বভাবের মধ্যে নিহিত থাকে। এই দশটি স্বাভাবিক ভাব হল –

১। লীলা
২। বিলাস
৩। বিচ্ছিত্তি
৪। বিভ্রম
৫। কিলকিঞ্চিৎ
৬। মোট্টায়িত
৭। কুট্টমিত
৮। বিব্বোক
৯। ললিত
১০। বিহৃত [১২১]

ধনঞ্জয় কথিত লীলা, বিলাসাদি দশটি স্বাভাবিক ভাবের সঙ্গে বিশ্বনাথ অতিরিক্ত আটটি ভাব যুক্ত করে আঠারোটি স্বাভাবিক ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে স্বভাবজ বা স্বভাবজাত এই আঠারোটি ভাব হল –

১। লীলা
২। বিলাস
৩। বিচ্ছিত্তি
৪। বিব্বোক
৫। কিলকিঞ্চিৎ
৬। মোট্টায়িত

৭। কুট্টমিত

৮। বিভ্রম

৯। ললিত

১০। মদ

১১। বিহৃত

১২। তপন

১৩। মৌগ্ধ্য

১৪। বিক্ষেপ

১৫। কুতূহল

১৬। হসিত

১৭। চকিত

১৮। কেলি [১২২]

হাব, ভাব, হেলা – এই তিনপ্রকার শরীরজ গুণ এবং শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য,প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য এবং ধৈর্য্য – এই সাতটি অযত্নজাত গুণ মিলে মোট দশপ্রকার অলংকার নায়কদের সম্ভব হলেও এগুলি নায়িকাশ্রিত হলেই বিশেষ বৈচিত্র্যের পুষ্টিসাধন করে।[১২৩]

নায়িকা-সহায়িকা

নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটানোর জন্য কিছু সহায়ক বা মধ্যস্থতাকারী প্রয়োজন হয়। এই সাহায্যকারী বা মধ্যস্থতাকারীরা নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক মনোভাব জানিয়ে ও প্রয়োজনীয় সংবাদ আদান প্রদান করে উভয়ের মিলনকে সহজ করে তোলে। যাঁরা এই কাজ করার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তাঁরা হলেন – দাসী অর্থাৎ পরিচারিকা, সখী অর্থাৎ স্নেহপাশে আবদ্ধা রমণী, কারু অর্থাৎ রজকী প্রভৃতি নীচ জাতীয়া রমণী, ধাতৃকন্যা, প্রতিবেশিনী, সন্ন্যাসিনী, শিল্পিনী অর্থাৎ চিত্রকরের স্ত্রী এবং নায়িকা স্বয়ং। এছাড়াও পীঠমর্দ, বিট, বিদূষক প্রভৃতি নায়কের মিত্রানুরূপ গুণাবলী আছে এমন পুরুষ বা নারী নায়িকার দূত বা দূতীরূপে কাজ করতে পারে।[১২৪] এ প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার বলেন যে নায়িকার দূতীগণ হলেন সখী, নটী, দাসী, ধাতৃদুহিতা, প্রতিবেশিনী, বালিকা, সন্ন্যাসিনী, সূত্রধারাদির পত্নী, শিল্পিপত্নী প্রভৃতি আবার নায়িকা স্বয়ং দূতী হতে পারে।[১২৫]

দূত বা দূতী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা –

১। নিসৃষ্টার্থ
২। মিতার্থ
৩। সন্দেশহারক

যিনি স্বয়ং উভয়ের অভিপ্রায় অবগত হয়ে উত্তর দান করেন এবং যিনি সুশৃঙ্খলভাবে কার্যনির্বাহ করতে সক্ষম তাকে বলা হয় নিসৃষ্টার্থ দূত বা দূতী।[১২৬]

মিতভাষী এবং প্রকৃত কার্যসাধনে সক্ষম দূত বা দূতীকে বলা হয় মিতার্থক। আর যিনি কেবলমাত্র প্রেরকের বার্তাবাহী তাঁকে বলা হয় সন্দেশহারক।[১২৭]

দূতীগণের উল্লেখযোগ্য গুণাবলী হল – কলাকৌশল অর্থাৎ নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যায় নৈপুণ্য, উৎসাহ, ভক্তি, অপরের মনোভাব বোঝার ক্ষমতা,স্মৃতিশক্তি, মাধুর্য, নর্মবিজ্ঞান, বাগ্মিতা প্রভৃতি।[১২৮] ঔচিত্য অনুসারে দূতীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা –

১। উত্তম
২। মধ্যম

৩। অধম[১২৯]

মালতীমাধব নাটকের নায়ক মাধবের প্রতি মালতীকে আকৃষ্ট করার জন্য দূতী হিসাবে তপস্বিনী কামন্দকীর ভূমিকা এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নায়ক অথবা নায়িকা তাঁদের সহকারী হিসাবে পুরুষ অথবা নারী উভয়কেই নিযুক্ত করতে পারেন। এই সব সহকারীগণ রূপকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ নায়ক ও নায়িকার দূত এবং দূতী হিসাবেও কাজ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নায়ক-নায়িকার সহকারীবৃন্দ সকলেই তাঁদের কাছের মানুষ। সুতরাং একথা বলা যায় যে সংস্কৃত নাটকের নায়ক-নায়িকা এবং তাঁদের সহকারীবৃন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য – কোন কিছুই শাস্ত্রীয় রীতি ও প্রথাবিরোধী নয়। বরং এগুলি সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুসারী।

ঃঃ পাদটীকা ঃঃ

১। আলম্বনং নায়কাদিস্তমালম্ব্য রসোদ্গমাৎ। —সাহিত্যদর্পণ-৩/৩৫

২। অধিকারঃ ফলস্বাম্যমধিকারী চ তৎ প্রভুঃ।
তন্নির্বৃত্তমভিব্যাপি বৃত্তং স্যাদাধিকারিকম্।। —দশরূপক - ১/১২

৩। ব্যসনী প্রাপ্তদুঃখো বা যুজ্যতেঽভ্যুদয়েন যঃ।
তথা পুরুষবাহুল্যে প্রধানো নায়কঃ স্মৃতঃ।। —নাট্যশাস্ত্র - ৩৪/২৩

৪। নেতা বিনীতো মধুরস্ত্যাগী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।
রক্তলোকঃ শুচির্বাগ্মী রূঢ়বংশঃ স্থিরো যুবা।
বুদ্ধ্যুৎসাহস্মৃতিপ্রজ্ঞাকলামানসমন্বিতঃ।
শূরো দৃঢ়শ্চ তেজস্বী শাস্ত্রচক্ষুশ্চ ধার্মিকঃ।। —দশরূপক - ২/১-২

৫। ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।
দক্ষোঽনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা।। —সাহিত্যদর্পন - ৩/৩৬

৬। যদ্ব্রহ্মবাদিভিরুপাসিতবন্দ্যপাদে বিদ্যাতপোব্রতনিধৌ তপতাং বরিষ্ঠে।
দৈবাৎ কৃতস্ত্বয়ি ময়া বিনয়াপচারস্তত্র প্রসীদ ভগবন্নয়মঞ্জলিস্তে।। —মহাবীরচরিত – ৪/২১

৭। রাম রাম নয়নাভিরামতামাশয়স্য সদৃশীং সমুদ্বহন্।
অপ্রতর্ক্যগুণরামণীয়কঃ সর্বথৈব হৃদয়ঙ্গমোঽসি মে।। —মহাবীরচরিত – ২/৩৭

৮। স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।। —উত্তরচরিত – ১/১২

৯। স্ফূর্জদ্বজ্রসহস্রনির্মিতমিব প্রাদুর্ভবত্যগ্রতো
রামস্য ত্রিপুরান্তকৃদ্দিবিষদাং তেজোভিরিদ্ধং ধনুঃ। —মহাবীর চরিত – ১/৫৩

১০। উৎপত্তির্জমদগ্নিতঃ স ভগবান্ দেবঃ পিনাকী গুরুঃ
শৌর্যং যত্তু ন তদ্গিরাং পথি ননু ব্যক্তং হি তৎকর্মভিঃ।
ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্রমুদ্রিতমহীনির্ব্যাজদানাবধিঃ
ক্ষত্রব্রহ্মতপোনিধের্ভগবতঃ কিং বা ন লোকোত্তরম্।। —মহাবীরচরিত – ২/৩৬

১১। প্রায়শ্চিত্তং চরিষ্যামি পূজ্যানাং বো ব্যতিক্রমাৎ।
ন ত্বেব দূষয়িষ্যামি শস্ত্রগ্রহমহাব্রতম্।। —মহাবীরচরিত – ৩/৮

১২। বুদ্ধির্জ্ঞানম্। গৃহীতবিশেষকারী তু প্রজ্ঞা। —দশরূপক - ২/২ – ধনিকবৃত্তি

১৩। শোভা বিলাসো মাধুর্যং গাম্ভীর্যং স্থৈর্যতেজসী।
ললিতৌদার্যমিত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ পৌরুষা গুণাঃ।। — দশরূপক — ২/১০

১৪। শোভা বিলাসো মাধুর্যং স্থৈর্যং গাম্ভীর্যমেব চ।
ললিতৌদার্যতেজাংসি সত্ত্বভেদাস্তু পৌরুষাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র — ২২/৩৩
ইত্যষ্টৌ মহাগুণাঃ পুরুষাণাং তে নায়কে দর্শয়িতব্যাঃ।

ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত "নাটক লক্ষণরত্নকোশ"
গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ — পৃষ্ঠা — ১৭৭।

১৫। শোভা বিলাসো মাধুর্য্যং গাম্ভীর্য্যং ধৈর্য্যতেজসী।
ললিতৌদার্য্যমিত্যষ্টৌ সত্ত্বজাঃ পৌরুষা গুণাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৬২

১৬। ধীরোদ্ধতা ধীরললিতা ধীরোদাত্তাস্তথৈব চ।।
ধীরপ্রশান্তকাশ্চৈব নায়কাঃ পরিকীর্তিতাঃ। — নাট্যশাস্ত্র — ৩৪/১৮ (খ) — ১৯ (ক)

১৭। ধীরোদাত্তো ধীরোদ্ধতস্তথা ধীরললিতশ্চ।
ধীরপ্রশান্ত ইত্যয়মুক্তঃ প্রথমশ্চতুর্ভেদঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৩৭

১৮। ভেদশ্চতুর্ধা ললিতশান্তোদাত্তোদ্ধতৈরয়ম্। — দশরূপক — ২/৩/(ক)

১৯। অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৩৮

২০। মহাসত্ত্বোঽতিগম্ভীরঃ ক্ষমাবানবিকত্থনঃ।।
স্থিরো নিগূঢ়াহঙ্কারো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ। — দশরূপক — ২/৪(খ) - ৫(ক)

২১। দর্পমাৎসর্যভূয়িষ্ঠো মায়াছদ্মপরায়ণঃ।।
ধীরোদ্ধতস্ত্বহংকারী চলশ্চণ্ডো বিকত্থনঃ। — দশরূপক - ২/৫(খ) - ৬ (ক)

২২। মায়াপরঃ প্রচণ্ডশ্চপলোঽহংকারদর্পভূয়িষ্ঠঃ।
আত্মশ্লাঘানিরতো ধীরৈর্ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৩৯

২৩। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ কলাসক্তঃ সুখী মৃদুঃ।। — দশরূপক — ২/৩ (খ)

২৪। নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং,
কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৪০

২৫। সামান্যগুণযুক্তস্তু ধীরশান্তো দ্বিজাদিকঃ। — দশরূপক - ২/৪ (ক)

২৬। বিনয়াদিনেতৃসামান্যগুণযোগী ধীরশান্তো দ্বিজাদিক
ইতি বিপ্রবণিকসচিবাদীনাং প্রকরণনেতৃণামুপলক্ষণম্। — দশরূপক - ২/৪ (ক) - ধনিকবৃত্তি

২৭। সামান্যগুণৈর্ভূয়ান্
দ্বিজাদিকো ধীরপ্রশান্তঃ স্যাৎ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৪১

২৮। কৈলাসোদ্ধারসারত্রিভুবনবিজয়ৌর্জিত্যনিষ্ণাতদোষ্ণঃ
পৌলস্ত্যস্যাপি হেলাপহৃতরণমদো দুর্দমঃ কার্তবীর্য্যঃ।
যস্য ক্রোধাৎ কুঠারপ্রবিঘটিতমহাস্কন্ধবন্ধস্থবীয়ো
দোঃশাখাদণ্ডমুণ্ডস্তরুরিব বিহিতঃ কুল্যকন্দঃ পুরাভূৎ।। — মহাবীরচরিত - ২/১৬

২৯। ব্রাহ্মণাতিক্রম ত্যাগো ভবতামেব ভূতয়ে।
জামদগ্ন্যশ্চ বো মিত্রমন্যথা দুর্মনায়তে।। — মহাবীরচরিতম্ – ২/১০

৩০। পুণ্যা ব্রাহ্মণজাতিরন্বয়গুণঃ শ্লাঘ্যং চরিত্রঞ্চ মে
যেনৈকেন হৃতান্যমুনি হরতা চৈতন্যমাত্রামপি।
একঃ সন্নপি ভূরিদোষগহনঃ সোহয়ং ত্বয়া প্রেয়সা
বৎস ব্রাহ্মণবৎসলেন শমিতঃ ক্ষেমায় দর্পাময়ঃ।। — মহাবীরচরিত – ৪/২২

৩১। এভির্দক্ষিণধৃষ্টানুকূলশঠরূপিভিস্তু ষোড়শধা। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৪২

৩২। অনুকূলস্ত্বেকনায়িকঃ।। — দশরূপক – ২/৭ (খ)

৩৩। অনুকূল একনিরতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৪৫

৩৪। দক্ষিণোঽস্যাং সহৃদয়ঃ। — দশরূপক – ২/৭ (ক)

৩৫। এষু ত্বনেকমহিলাসু সমরাগো দক্ষিণঃ কথিতঃ। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৪৩

৩৬। গূঢ়বিপ্রিয়কৃচ্ছঠঃ। — দশরূপক – ২/৭ (ক)

৩৭। শঠোঽয়মেকত্র বদ্ধভাবো যঃ।
দর্শিতবহিরনুরাগো বিপ্রিয়মন্যত্র গূঢ়মাচরতি।। — সাহিত্যদর্পন – ৩/৪৬

৩৮। কৃতাগা অপি নিঃশঙ্ক স্তর্জ্জিতোঽপি ন লজ্জিতঃ।
দৃষ্টদোষোঽপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্টনায়কঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৪৪

৩৯। ন চোভয়োর্জেষ্ঠাকনিষ্ঠয়োর্নায়কস্য স্নেহেন ন ভবিতব্যমিতি বাচ্যম্, অবিরোধাৎ।
— দশরূপক বৃত্তি (ধনিক)-২/৭

৪০। এষাঞ্চ ত্রৈবিধ্যাৎ সর্বেষামুত্তমাধমমধ্যমত্বেন।
উক্তা নায়কভেদাশ্চত্বারিংশত্তথাষ্টৌ চ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৪৭

৪১। দেবা ধীরোদ্ধতা জ্ঞেয়াঃ সুধীরললিতা নৃপাঃ।।
সেনাপতিরমাত্যশ্চ ধীরোদাত্তৌ প্রকীর্তিতৌ।

ধীরপ্রশান্তা বিজ্ঞেয়া ব্রাহ্মণা বরিজস্তথা।। — নাট্যশাস্ত্র — ৩৪/১৯(খ)-২০

৪২। পতাকানায়কস্ত্বন্যঃ পীঠমর্দো বিচক্ষণঃ।
তস্যৈবানুচরো ভক্তঃ কিঞ্চিদূনশ্চ তদ্‌গুণৈঃ।। — দশরূপক — ২/৮

৪৩। দূরানুবর্তিনি স্যাৎ তস্য প্রাসঙ্গিকেতিবৃত্তে তু।
কিঞ্চিত্তদ্‌গুণহীনঃ সহায়ঃ এবাস্য পীঠমর্দ্দাখ্যঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৪৮

৪৪। সম্ভোগহীনসম্পদ্বিটস্তু ধূর্ত্তঃ কলৈকদেশজ্ঞঃ।
বেশোপচারকুশলো বাগ্মী মধুরোঽথ বহুমতো গোষ্ঠ্যাম্।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৫০

৪৫। সূত্রধারগুণৈর্যুক্তঃ সর্বএব প্রয়োগে সঃ।।
যেশ্যোপচারকুশলো মধুরো দক্ষিণঃ কবিঃ।
শাস্ত্রার্থতত্ত্ববেদী চ নিপুণো বৈশিকেষু চ।
উহাপোহক্ষমো বাগ্মী চতুরশ্চ বিটোভবেৎ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৩৫/৭৬-৭৭

৪৬। কলহপ্রিয়ো বহুকথো বিরূপো (ব)ন্ধু সেবকঃ।
মান্যামান্যবিশেষজ্ঞশ্চেটো হ্যেবংবিধঃ স্মৃতঃ।। — নাট্যশাস্ত্র — ৩৫/৮০

৪৭। কুসুমবসন্তাদ্যভিদঃ কর্ম্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্মজ্ঞঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৫১

৪৮। একবিদ্যো বিটশ্চান্যো হাস্যকৃচ্চ বিদূষকঃ। — দশরূপক — ২/৯ (ক)

৪৯। অস্য বিকৃতাকারবেষাদিত্বং হাস্যকারিত্বেনৈব লভ্যতে। — দশরূপক বৃত্তি (ধনিক) ২/৯

৫০। বামনো দন্তুরঃ কুব্জো দ্বিজিহ্বো বিকৃতাননঃ।
খলতিঃ পিঙ্গলাক্ষশ্চ স বিধেয়ো বিদূষকঃ।। — নাট্যশাস্ত্র — ৩৫/৭৯

৫১। এতেষাং চ পুনর্জ্ঞেয়াশ্চত্বরশ্চ বিদূষকাঃ।
লিংগিনো (দ্বিজাহ্) বরজাঃ শি(ষ্যা) শ্চেতি যথাক্রমম্।।
দেবক্ষিতিভৃতামাত্যব্রাহ্মণানাং প্রযোজয়েৎ।
বিপ্রলম্ভে সুহৃদো (হমী) সংকথালাপপেশলাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৩৪/২১-২২

৫২। মন্ত্রী ম্যাদর্থানাং চিন্তায়াম্। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৫২

৫৩। কুলীনা বুদ্ধিসম্পন্নাঃ শ্রুতিনীতিবিশারদাঃ।
স্বদেশ্যাশ্চানুরক্তাশ্চ শুচয়ো ধার্মিকাস্তথা
পুরোধোমন্ত্রিণশ্চৈব গুণৈরেতৈর্ভবন্তি হি।। — নাট্যশাস্ত্র — ৩৪/৯১

৫৪। মদমূর্খতাভিমানী দুষ্কুলতৈশ্চর্য্যসংযুক্তঃ।

সোঽয়মনূঢ়াভ্রাতা রাজ্ঞঃ শ্যালঃ শকার ইত্যুক্তঃ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৫৪

৫৫। উজ্জ্বলবস্ত্রাভরণঃ ক্রুধ্যত্যনিমিত্ততঃ প্রসীদতি চ।
অধমো মাগধীভাষী ভবতি শকারো বহুবিকারঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৩৫/৭৮

৫৬। দণ্ডে সুহৃৎকুমারাটবিকাঃ সামন্তসৈনিকাদ্যাশ্চ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৫৫

৫৭। ঋত্বিক্পুরোধসঃ স্যুর্ব্রহ্মবিদস্তাপসাস্তথা ধর্ম্মে।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৫৬

৫৮। উত্তমাঃ পীঠমর্দ্দাদ্যাঃ।।
মধ্যৌ বিটবিদূষকৌ।
তথা শকারচেটাদ্যা অধমাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৫৭-৫৮

৫৯। লুব্ধো ধীরোদ্ধতঃ স্তব্ধঃ পাপকৃদ্ ব্যসনী রিপুঃ।। — দশরূপক - ২/৯

৬০। ধীরোদ্ধতঃ পাপকারী ব্যসনী প্রতিনায়কঃ। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/১৩৩

৬১। নায়কসামান্যগুণৈর্ভবতি যথাসম্ভবৈর্যুক্তা। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৬৯ (খ)

৬২। স্বান্যা সাধারণস্ত্রীতি তদ্গুণা নায়িকা ত্রিধা। — দশরূপক — ২/১৫ (ক)

৬৩। অথ নায়িকা ত্রিবিধা, স্বাঽন্যা সাধারণী স্ত্রীতি। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৬৯ (ক)

৬৪। বিনয়ার্জবাদিযুক্তা গৃহকর্মপরা পতিব্রতা স্বীয়া। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৭০

৬৫। — স্বীয়া শীলার্জবাদিযুক্।। — দশরূপক — ২/১৫ (খ)

৬৬। শীলং সুবৃত্তম্, পতিব্রতাঽকুটিলা লজ্জাবতী
পুরুষোপচারনিপুণা স্বীয়া নায়িকা। — দশরূপক — বৃত্তি(ধনিক)-২/১৫

৬৭। সাপি কথিতা ত্রিভেদা, মুগ্ধা, মধ্যা প্রগলভেতি।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৭১

৬৮। সা চৈবংবিধা স্বীয়া মুগ্ধা-মধ্যা-প্রগল্ভাভেদাৎ ত্রিবিধা। — দশরূপক— বৃত্তি (ধনিক) ২/১৫

৬৯। মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা মৃদুঃ ক্রুধি। — দশরূপক — ২/১৬ (ক)

৭০। প্রথমাবতীর্ণযৌবনমদনবিকারা রতৌ বামা।
কথিতা মৃদুশ্চ মানে সমধিক লজ্জাবতী মুগ্ধা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৭২

৭১। মধ্যোদ্যদ্যৌবনানঙ্গা মোহান্তসুরতক্ষমা।। — দশরূপক - ২/১৬ (খ)

৭২। মধ্যা বিচিত্রসুরতা প্ররূঢ়স্মরযৌবনা।
ঈষৎপ্রগল্ভবচনা মধ্যমব্রীড়িতা মতা।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৭৩

৭৩। স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্তরতকোবিদা।
ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্ভাক্রান্তনায়কা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৭৪

৭৪। যৌবনান্ধা স্মরোন্মত্তা প্রগল্ভা দয়িতাঙ্গকে।

বিলীয়মানেবা নন্দাদ্রতারম্ভে২প্যচেতনা।। — দশরূপক – ২/১৮

৭৫। তে ধীরা চাপ্যধীরা চ ধীরাধীরেতি ষড়্‌বিধে। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৭৫

৭৬। প্রিয়ং সোৎপ্রাসবক্রোক্ত্যা মধ্যাধীরা দহেদ্রুষা।
ধীরাধীরা তু রুদিতৈরধীরা পরুষোক্তিভিঃ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৭৬

৭৭। সাবহিত্থাদরোদাস্তে রতৌ ধীরেতরা ক্রুধা।
সন্তর্জ্য তাড়য়েদ্ মধ্যা মধ্যাধীরেব তং বদেৎ।। — দশরূপক - ২/১৯

৭৮। প্রগল্‌ভা যদি ধীরা স্যাচ্ছন্নকোপাকৃতি স্তদা।
উদাস্তে সুরতে তত্র দর্শয়ন্ত্যাদরান্ বহিঃ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৭৭

৭৯। ধীরাধীরা তু সোল্লুণ্ঠভাষিতৈঃ খেদয়েদমূম্। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৭৮

৮০। তর্জ্জয়েত্তাড়য়েদন্যা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৭৯

৮১। প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা।
কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠরূপত্বান্নায়কপ্রণয়ং প্রতি।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৮০

৮২। মধ্যা-প্রগল্‌ভয়োর্ভেদাস্তস্মাদ্দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ।
মুগ্ধা ত্বেকৈব তেন স্যুঃ স্বীয়া ভেদাস্ত্রয়োদশ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৮০

৮৩। পরকীয়া দ্বিধা প্রোক্তা পরোঢ়া কন্যকা তথা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৮১

৮৪। কন্যা ত্বজাতোপযমা সলজ্জা নব-যৌবনা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৮৩

৮৫। অন্যস্ত্রী কন্যকোঢ়া চ নান্যোঢ়াঙ্গিরসে ক্বচিৎ।।
কন্যানুরাগমিচ্ছাতঃ কুর্যাদঙ্গাঙ্গিসংশ্রয়ম্। — দশরূপক – ২/২০(খ)-২১(ক)

৮৬। সাধারণস্ত্রী গণিকা কলাপ্রাগল্‌ভ্যধৌর্তযুক্।। — দশরূপক - ২/২১ (খ)

৮৭। ধীরা কলাপ্রগল্‌ভা স্যাদ্বেশ্যা সামান্যনায়িকা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৮৪ (ক)

৮৮। অবস্থাভির্ভবন্ত্যষ্টাবেতাঃ ষোড়শভেদিতাঃ। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৮৫ (ক)

৮৯। স্বাধীনভর্ত্তৃকা তদ্বৎ খণ্ডিতা২থাভিসারিকা।।
কলহান্তরিতা বিপ্রলব্ধা প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
অন্যা বাসকসজ্জা স্যাদ্বিরহোৎকণ্ঠিতা তথা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৮৫

৯০। কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি যদন্তিকম্।
বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৮৬

৯১। আসন্নায়ত্তরমণা হৃষ্টা স্বাধীনভর্ত্তৃকা। — দশরূপক - ২/২৪ (ক)

৯২। পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্যসম্ভোগচিহ্নিতঃ।

সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৮৭

৯৩। জ্ঞাতেঽন্যাসঙ্গবিকৃতে খণ্ডিতের্ষ্যাকষায়িতা।। — দশরূপক - ২/২৫ (খ)

৯৪। অভিসারয়তে কান্তং যা মন্মথবশংবদা।
স্বয়ং বাভিসরত্যেষা ধীরৈরুক্তাভিসারিকা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৮৮

৯৫। কামার্তাভিসরেৎ কান্তং সারয়েদ্বাভিসারিকা।। — দশরূপক - ২/২৭ (খ)

৯৬। সংলীনা স্বেষু গাত্রেষু মূকীকৃতবিভূষণা।
অবগুন্ঠনসংবীতা কুলজাভিসরেদ্ যদি।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৮৯

৯৭। বিচিত্রোজ্জ্বল বেশা তু রণন্নূপুরকঙ্কণা।
প্রমোদস্মেরবদনা স্যাদ্ বেশ্যাভিসরেদ্ যদি।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৮৯

৯৮। মদস্খলিতসংলাপা বিভ্রমোৎফুল্ললোচনা।
আবিদ্ধগতিসঞ্চারা স্যাৎ প্রেষ্যাভিসরেদ্ যদি।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৮৯

৯৯। ক্ষেত্রং বাটী ভগ্নদেবালয়ো দূতীগৃহং বনম্।
মালয়ঞ্চ শ্মশানঞ্চ নদ্যাদীনাং তটী তথা।।
এবং কৃতাভিসারাণাং পুংশ্চলীনাং বিনোদনে।
স্থানান্যষ্টৌ তথা ধ্বান্তচ্ছন্নেষু ক্বচিদাশ্রয়ঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৯০

১০০। কালহান্তরিতাঽমর্ষাদ্বিধূতেঽনুশয়ার্তিযুক্। — দশরূপক - ২/২৬ (ক)

১০১। চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৯১

১০২। বিপ্রলব্ধোক্তসময়মপ্রাপ্তেঽতিবিমানিতা।। — দশরূপক - ২/২৬ (খ)

১০৩। প্রিয়ং কৃত্বাপি সংকেতং যস্যা নায়াতি সন্নিধিম্।
বিপ্রলব্ধা তু সা জ্ঞেয়া নিতান্তমবমানিতা।। —সাহিত্যদর্পণ - ৩/৯২

১০৪। নানাকার্য্যবশাদ্ যস্যা দূরদেশং গতঃ পতিঃ।
সা মনোভবদুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৯৩

১০৫। দূরদেশান্তরস্থে তু কার্যতঃ প্রোষিতপ্রিয়া। — দ.রূ. - ২/২৭ (ক)

১০৬। মুদা বাসকসসজ্জা স্বং মণ্ডয়েত্যেষ্যতি প্রিয়ে। — দশরূপক - ২/২৪

১০৭। কুরুতে মণ্ডনং যস্যাঃ সজ্জিতে বাসবেশ্মনি।
সা তু বাসকসজ্জা স্যাদ্বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৯৪

১০৮। আগন্তুং কৃতাচিত্তোঽপি দৈবান্নায়াতি যৎপ্রিয়ঃ।

তদনাগমদুঃখার্ত্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা তু সা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৯৫

১০৯। চিরয়ত্যব্যলীকে তু বিরহোৎকণ্ঠিতা মতা। — দশরূপক - ২/২৫ (ক)

১১০। চিন্তানিঃশ্বাসখেদাশ্রুবৈবর্ণ্যগ্লান্যভূষণৈঃ।
যুক্তাঃ ষড়ন্ত্যা দ্বে চাদ্যে ক্রীড়ৌজ্জ্বল্যপ্রহর্ষিতৈঃ।। — দশরূপক - ২/২৮

১১১। ইতি সাষ্টাবিংশতিশতমুত্তমমধ্যমাধমস্বরূপতঃ।
চতুরধিকাশীতিযুতং শতত্রয়ং নায়িকাভেদানাং স্যাৎ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৯৬

১১২। দিব্যা চ নৃপপত্নী চ কুলস্ত্রী গণিকা তথা।
এতাস্তু নায়িকা জ্ঞেয়া নানাপ্রকৃতিলক্ষণাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র -৩৪/২৬

১১৩। ধীরা চ ললিতা চৈব উদাত্তা নিভৃতা তথা। — নাট্যশাস্ত্র - ৩৪/২৭ (ক)

১১৪। মহাদেব তথা দেব স্বামিনী স্থায়িন তথা।
ভোগিনী শিল্পকারিণী নাটকীয়াথ নর্তকী।।
অনুচারিকা চ বিজ্ঞেয়া তথা চ পরিচারিকা।
তথা সঞ্চারিকা চৈব তথা প্রেষণচারিকা।।
মহত্তরা প্রতীহারী কুমারী স্থবিরা অপি।
আযুক্তিকা চ নৃপতেরয়মাভ্যন্তরো জনঃ।। — নাট্যশাস্ত্র — ৩৪/৩২-৩৪

১১৫। রূপগুণশীলযৌবনসুবর্ণমাল্যাভরণৈঃ সংপন্না।
বিশদা স্নিগ্ধা মধুরা পেশলবচনশুভরক্তকণ্ঠী চ।।
যোগ্যায়ামক্ষুভিতা লয়তালজ্ঞা রসৈশ্চ সম্পন্না।
সর্বাভরণসংযুক্তা গন্ধমাল্যোপশোভিতা।।
এবংবিধগুণৈর্যুক্তা কর্তব্যা নায়িকা তজ্জ্ঞৈঃ। — নাট্যশাস্ত্র - ৩৫/৮৪-৮৬ (ক)

১১৬। যৌবনে সত্ত্বজাঃ স্ত্রীণামলংকারাস্তু বিংশতিঃ। — দশরূপক - ২/৩০ (ক)

১১৭। যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামষ্টাবিংশতিসংখ্যকাঃ। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৯৯

১১৮। ভাবো হাবশ্চ হেলা চ ত্রয়স্তত্র শরীরজাঃ।।
শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্যং চ প্রগল্ভতা।
ঔদার্যং ধৈর্যমিত্যেতে সপ্ত ভাবা অযত্নজাঃ।। — দশরূপক - ২/৩০ (খ) - ৩১

১১৯। স্বভাবজাশ্চ ভাবাদ্যা দশ পুংসাং ভবন্ত্যপি।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৯৯

১২০। অলংকারাস্তত্র ভাবহাবহেলাস্ত্রয়োঽঙ্গজাঃ।।
শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যং চ প্রগল্ভতা।

ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈব স্যুরযত্নজাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৯৯

১২১। লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতম্।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা।।
বিহৃতং চেতি বিজ্ঞেয়া দশ ভাবাঃ স্বভাবজাঃ। — দশরূপক - ২/৩২-৩৩ (ক)

১২২। লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিব্বোকঃ কিলকিঞ্চিতম্।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিভ্রমো ললিতং মদঃ।।
বিহৃতং তপনং মৌগ্ধ্যং বিক্ষেপশ্চ কুতূহলম্।
হসিতং চকিতং কেলিরিত্যষ্টাদশসংখ্যকাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৯৯

১২৩। পূর্বে ভাবাদয়ো ধৈর্য্যান্তা দশা নায়কানামপি সম্ভবন্তি
কিন্তু সর্বেঽপ্যমী নায়িকাশ্রিতা বিচ্ছিত্তিবিশেষং পুষ্ণন্তি। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৯৯ (বৃত্তি)

১২৪। দূত্যো দাসী সখী কারূর্ধাত্রেয়ী প্রতিবেশিকা।
লিঙ্গিনী শিল্পিনী স্বং চ নেতৃমিত্রগুণান্বিতাঃ।। — দশরূপক - ২/২৯

১২৫। দূত্যঃ সখী, নটী, দাসী, ধাত্রেয়ী, প্রতিবেশিনী।
বালা, প্রব্রজিতা, কারুঃ, শিল্পিন্যাদ্যাঃ স্বয়ং তথা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১৩১

১২৬। উভয়োর্ভাবমুন্নীয় স্বয়ং বদতি চোত্তরম্।
সুশ্লিষ্টং কুরুতে কার্য্যং নিসৃষ্টার্থস্তু স স্মৃতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৬০

১২৭। মিতার্থভাষী কার্যস্য সিদ্ধিকারী মিতার্থকঃ।
যাবদ্ভাষিতসন্দেশহারঃ সন্দেশহারকঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/৬১

১২৮। কলাকৌশলমুৎসাহো ভক্তিশ্চিত্তজ্ঞতা স্মৃতিঃ।
মাধুর্য্যং নর্মবিজ্ঞানং বাগ্মিতা চেতি তদ্গুণাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/১৩২ (ক)

১২৯। এতা অপি যথৌচিত্যাদুত্তমাধমমধ্যমাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১৩২ (খ)

ঃঃ চতুর্থ অধ্যায় ঃঃ

সংস্কৃত নাটকের গঠনরীতি, নাম, সম্বোধন ও ভাষার ব্যবহার

সংস্কৃত নাট্যবস্তুর অগ্রগতির জন্য নাট্যালংকারিকগণ কতকগুলি রীতির উল্লেখ করেছেন। এই রীতিগুলিকে সার্বজনীন নাট্যরীতির পর্যবেক্ষণের নিরীখে সাধারণ নিয়ম হিসাবে গণ্য করা হয়। গঠনের দিক্ থেকে, নাট্যচরিত্রের নামকরণের দিক্ থেকে, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র কর্তৃক তাদের সম্বোধনের দিক্ থেকে নট-নটী কর্তৃক প্রযুক্ত ভাষার ব্যবহারের দিক্ থেকে রূপকে ভিন্ন ভিন্ন রীতির কথা বলা হয়।

গঠনগত রীতি ঃ-

রূপকের গঠনগত দিক্ থেকে দেখা যায় যে নাটক পাঁচ অঙ্কের কম এবং দশ অঙ্কের অধিক হবে না।[১] বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সংস্কৃত সাহিত্যের জনপ্রিয় নাটকগুলি পঞ্চম অথবা সপ্তম অঙ্কবিশিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্", ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তম্" ইত্যাদির কথা বলা যায়। দশ অঙ্কবিশিষ্ট নাটককে মহানাটক নামে আখ্যায়িত করেছেন বিশ্বনাথ।[২] রাজশেখরের "বালরামায়ণ" তাই নাটক নয়, মহানাটক।

নাটকের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেই গড়ে ওঠে একটি পরিপূর্ণ নাটক। এই সামঞ্জস্যের বাঁধুনি হবে গোপুচ্ছাগ্রের বা গরুর লেজের শেষ দিককার কেশগুচ্ছের মত।[৩] এ বিষয়ে আচার্য ভরতের সঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার একই অভিমত পোষণ করেন।[৪] সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে গোপুচ্ছাগ্র শব্দটির দুরকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। বিশ্বনাথ মন্তব্য করেছেন যে কেউ কেউ 'গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রের' অর্থ করেন — ক্রমশ হ্রস্ব গোপুচ্ছের মত নাটকের অঙ্ক ক্রমশ সূক্ষ্ম হবে। আবার কেউ কেউ বলেন — গোপুচ্ছের লোম যেমন কোথাও ছোট আবার কোথাও লম্বা হয় তেমনি নাটকীয় কথাবস্তুর অঙ্গীভূত কোন কাজ মুখ বা প্রথম সন্ধিতে সমাপ্ত হবে অর্থাৎ ছোট চুলের মত ব্যাপারটির দৈর্ঘ্য কম হবে। আবার কোন ঘটনা প্রতিমুখ নামক দ্বিতীয় সন্ধিতে সমাপ্ত হবে এবং সেই ঘটনা মুখ সন্ধিতে সমাপ্ত ঘটনার থেকে দীর্ঘ হবে। এভাবেই কোন ঘটনা শেষ হবে গর্ভসন্ধিতে, কোন ঘটনা বিমর্ষসন্ধিতে, আবার কোন ঘটনা নির্বহন সন্ধিতে।[৫] সুতরাং পরের সন্ধিতে যে ঘটনা শেষ হচ্ছে তা পূর্বের সন্ধির শেষ হওয়া ঘটনার তুলনায় দীর্ঘ হবে।

তবে প্রথম ব্যাখ্যাটি যুক্তিসম্মত বলে মনে হয় না। কারণ এই ব্যাখ্যাটিকে মর্যাদা দিতে হলে

অনেক প্রসিদ্ধ নাটকই নাট্যপদবাচ্য হবে না। যেমন ভাস বিরচিত "স্বপ্নবাসবদত্তম্" নাটকের প্রথম অঙ্কটি বড় এবং পঞ্চম অঙ্কটি প্রায় এরই সমান। কিন্তু চতুর্থ ও ষষ্ঠ অঙ্ক সবচেয়ে বড় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক সবচেয়ে ছোট। সুতরাং অঙ্কগুলি ক্রমশ সূক্ষ্ম হবে এই গঠনপদ্ধতি গ্রহণ করলে আলোচ্য নাটকটি নাটক বলে পরিগণিত হতে পারে না।

তাই সাহিত্যদর্পণে উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিকে অপেক্ষাকৃত উদার ও যুক্তিসম্মত বলা যায়। এই ব্যাখ্যানুসারে নাটকের অঙ্ক, সন্ধি অথবা ঘটনাগত দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে নাট্যকার সম্পূর্ণ স্বাধীন। নায়কের কোন্ ব্যাপারটি কোথায় সমাপ্ত হবে তা নাটকীয় ঘটনার প্রকৃতি অনুসারে দর্শকের ঔৎসুক্য ও রসসৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যকারই ঠিক করবেন। গোপুচ্ছাগ্রের কোন্ স্থানের কোন্ কেশটি ছোট বা বড় হবে সেবিষয়ে যেমন কোন স্থিরতা নেই তেমনি নাটকের নায়কের জীবনের সব ব্যাপারগুলিও সমান দৈর্ঘ্যের নয়, হতে পারেও না। আখ্যান বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে নাটকীয় ব্যাপারের সংঘটন সময়ের তারতম্য ঘটে এবং তা ঘটে বলেই ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট গোপুচ্ছের মতই প্রতিটি নাটক নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে ভিন্ন। নাটক রচনার বিশেষ কোন একটি ছাঁচ নেই। একটি ছাঁচে ঢেলে নাটক রচনা করতে গেলে অথবা বিশেষ কোন একটি ছাঁচে ফেলে নাটকের ভালো মন্দ বিচার করতে গেলে তা যে সঠিক ও সুসংগত হবে না গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্র শব্দের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ব্যাখ্যা ভারতীয় নাট্যালংকারিকগণের নাট্যবিচারে সূক্ষ্ম, উদার ও গভীর দৃষ্টিরই পরিচয় বহন করে।

তাছাড়াও নাটকের কলেবর কল্পনা বিষয়ে ঠিক কোন একটি নিয়ম বা পরিকল্পনা সম্ভব নয়। কারণ নাটকের মধ্যে কোথায় কতদূরে নাটকীয় সংকট সৃষ্টি হবে, ঘটনার উত্থান-পতনের কালমাত্রা কোন নাটকে কিরূপ হবে সব কিছুই নির্ভর করে নাটকীয় কাহিনীর নিজস্ব প্রকৃতির উপর। তবে ঘটনার সামগ্রিক বিকাশে যাতে সামঞ্জস্য থাকে, যাতে সমতার অভাব না হয়, যাতে দর্শকচিত্তে একটানা ঔৎসুক্য বর্তমান থাকে, যাতে রসপ্রবাহে কোন ব্যাঘাত না ঘটে তাই হবে নাট্যকারের লক্ষ্য এবং যে কাঠামো, যে ঘটনাবন্ধ, যে গঠনবৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তাই নাটকে আদর্শ এবং অভিপ্রেত।

নাটকের চরিত্র যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেহেতু গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে সেই চরিত্রের সংখ্যা সম্পর্কেও আলংকারিকগণ মতপ্রকাশ করেছেন। নাটকে প্রধান চরিত্র থাকবে চার বা পাঁচটি। এই প্রধান চরিত্রগুলি বিভিন্ন নাটকীয় ঘটনার অগ্রগতিতে নায়ককে সহায়তা করবে।[৮] তবে চার বা পাঁচজন থাকতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই প্রধান চরিত্রের সংখ্যা তিনও হতে পারে, আবার ছয় সাতওহতে

পারে।[৭] প্রকৃতপক্ষে কতজনকে দিয়ে নাট্যকার তাঁর নাটকীয় ঘটনার অগ্রগতি ঘটাতে পারবেন তা তাঁর উপর নির্ভর করবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে নাটকের অঙ্ক হবে পাঁচ থেকে দশের মধ্যে। অঙ্কে রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস ইত্যাদি স্পষ্টভাবে প্রতীত হবে। এখানে নিবদ্ধ শব্দগুলি হবে অগূঢ় অর্থাৎ অনায়াসবোধ্য।[৮] দুর্বোধ্য আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করলেও তা এমনভাবে করতে হবে যাতে তার অর্থ অন্য শব্দের সঙ্গে সাহচর্য্য বশতঃ সুবোধ্য হয়। নাটক হবে ক্ষুদ্র চূর্ণক সংযুক্ত। অর্থাৎ সমাসবিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দযুক্ত হবে নাটক। সুতরাং প্রহেলিকার মত দুরূহ শব্দার্থ নাটকের গদ্যে ব্যবহার করা চলবে না।[৯] সেদিক্ থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে যে ভবভূতি রচিত নাটকগুলিতে যে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ গদ্যাংশ ব্যবহৃত হয়েছে তা হয়তো দোষাবহ হয়েছে। আচার্য ভরতও অধিক মাত্রায় চূর্ণক ব্যবহার না করার ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন।[১০]

নাটকের অঙ্কে বহু মনোহর ঘটনার সন্নিবেশ থাকবে। কিন্তু কবিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে নাটকীয় অঙ্কে কোনভাবেই যেন গদ্যের থেকে পদ্য বা শ্লোক বেশী না হয়। নাটকীয় কাজের জন্য নিত্যকর্মের বর্জন দেখানো চলবে না।[১১] যেমন সন্ধ্যার সময় কোন ব্রাহ্মণ পাত্রকে দিয়ে হয়তো কোন কাজ করাতে হবে। কিন্তু তখন তো তার সন্ধ্যা-বন্দনার সময়। এটাই তার কাছে নিত্যকর্ম। সুতরাং ঐ পাত্রকে দিয়ে যদি কাজটি করাতেই হয় তবে কাজটি সন্ধ্যার আগে বা পরে করিয়ে নিতে হবে।

নাটকে স্থান, কাল ও ক্রিয়ার ঐক্য (Unity) থাকা চাই। ঐক্য না থাকলে নাটকত্ব নষ্ট হয়। ঐক্য না থাকলে নাটকের আবেদন দুর্বল হয়। ঘটনাসংস্থাপনে সামান্য শৈথিল্যও রসসৃষ্টির পথে বিশেষ অন্তরায় হয়ে থাকে। সংস্কৃত নাটকে ক্রিয়াগত ঐক্যের (Unity of Action) উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সাহিত্যদর্পণকার নাটকের অঙ্কলক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন যে অবান্তর বিষয় অঙ্কে পরিসমাপ্তি লাভ করবে কিন্তু অবান্তর বিষয়ের পরিসমাপ্তি হলেও ঘটনার সামঞ্জস্যরক্ষক একটি অংশ নাটকে নিবদ্ধ করতে হবে।[১২] অর্থাৎ কোন ঘটনা একটি অঙ্কের মধ্যে শেষ হলেও এমন কিছু কথা সেখানে বলা থাকে যে কথার সূত্র ধরে পরবর্তী অঙ্কের সঙ্গে তার সম্পর্ক বোঝা যায়। এভাবেই বিন্দু স্থাপনার দ্বারা মূল কথাসূত্রের সঙ্গে অঙ্কের নাটকীয় ঘটনার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিন্দু নামক অর্থপ্রকৃতিই নাটকের ক্রিয়াগত ঐক্য রক্ষা করে।

বহু স্থান ও বহু কালের ঘটনা, বহু নাটকীয় চরিত্র নিয়ে নাটক রচনা করতে গেলে রচনার বন্ধন শৈথিল্য ও বিশৃংঙ্খলার সম্ভাবনা থাকে। সেকারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ নাটকই ঘটাবিন্যাসে শৃংখলার অভাবের জন্য অসার্থক। কিন্তু স্থানিক ও কালিক ঐক্য-নীতি লঙ্ঘন করেও যদি নাট্যকার তাঁর নাটকে নিপুণ মালাকারের মত ঘটনাগুলিকে সুগ্রথিত করে রসসৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে সেখানে নিয়ম লঙ্ঘিত হলেও নাটকত্ব ব্যাহত হয় না। তবে ক্রিয়াগত ঐক্য নাটকে অপিরহার্য। এই ঐক্য না থাকলে নাটকত্ব শিথিল হয়, নাটকের কাহিনী বিশৃংখল ও গতিহীন হয়ে পড়ে। এক ঘন্টার ঘটনা বিন্যাসেও যদি ক্রিয়াগত ঐক্য না থাকে, তবে তা নাটক নয়। আবার এক শতাব্দীর ঘটনাও যদি ক্রিয়াগত ঐক্যে সুসংবদ্ধ হয় তবে তা আদর্শ নাটক হয়ে উঠতে পারে।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নাটকের স্থান ও কালের ঐক্যবিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম নেই। তবে স্থান ও কাল বিষয়ে কয়েকটি বিধি নিষেধ দৃষ্ট হয়। নাট্যশাস্ত্রকার বলেন যে –

১। একটি অঙ্কে এক দিনের অধিক ঘটনা থাকবে না।[১৩]

২। নৈশ ঘটনার বিষয় অঙ্কমধ্যে বর্ণনীয় নয়। যদি নাটকীয় প্রয়োজনে এই বর্ণনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তবে তা প্রবেশকে দেখাতে হয়।[১৪]

৩। দুটি অঙ্কের মধ্যে এক মাসের অধিক ব্যবধান ব্যঞ্জনীয় নয়, এক বৎসরের অধিক ব্যবধান নিষিদ্ধ। যদি বর্ণিত ঘটনায় এক বৎসরের বেশী সময়ের ব্যবধানের কথা থাকে, তবে এই দীর্ঘকালকে এক বৎসর বা তার চেয়ে কম সময়ের মত কল্পনা করতে হবে।[১৫]

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে এইসব বিধিনিষেধ নির্দিষ্ট হলেও সংস্কৃত নাটকে এদের যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে, ব্যতিক্রম থাকবেও। ভবভূতি রচিত "মহাবীরচরিত" নাটকে বারো বছরের ঘটনা আছে। তাঁর "উত্তররামচরিতে"র প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে বারো বছরের ব্যবধান দেখা যায়। কিন্তু এই ব্যবধান সত্ত্বেও দর্শকচিত্তে নাট্যরস সৃষ্টিতে কোন বাধা হয় না। অতএব কালিক ঐক্য না থাকলেও এর নাটকত্ব অব্যাহত ও অটুট। আসলে নাটকের সৌষ্ঠব ও শৃংখলা রক্ষার জন্যই নাট্যসূত্র অথবা নাট্যশাস্ত্রের বিধি নিষেধ, নিছক বিধি নিষেধের জন্যই নয়। বিধি-নিষেধের ছাঁচে ফেলে একটি সুন্দর কাঠামো তৈরী হতে পারে কিন্তু নিছক কাঠামোর সৌন্দর্যেই সাহিত্যের সৌন্দর্য হয় না। এই সৌন্দর্য কাঠামোর সৌন্দর্যের থেকেও আরও কিছু। এই আরও কিছুর জন্যই যুগে যুগে, দেশে দেশে কাঠামোর ছাঁচ বদলে যায়, সাহিত্যে পুরাতন সাহিত্য-শাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ হয় এবং পত্তন হয় নূতন সাহিত্যশাস্ত্রের। শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের নাট্যকার নয়,কোন দেশের কোন নাট্যকারই কোনদিন বাঁধাধরা নিয়মে চলে না, চলতে পারেও না।

এজন্যই ইউরোপীয় নাট্যসূত্রে 'দেশ কাল ও ঘটনার ঐক্য' বিষয়ে কড়াকড়ি নিয়ম থাকা সত্ত্বেও নাটকসমূহে নিয়ম পালন অপেক্ষা নিয়ম ভঙ্গের দৃষ্টান্তই অধিক।

মাল্য বিচারে যেমন পুষ্পের বর্ণ, গন্ধ, রূপ, আয়তন, চয়নকাল,উৎপত্তিস্থল প্রভৃতির বিচার বড়ো নয়, এদের বিন্যাস ও গ্রন্থনে মালার সামগ্রিক ঐক্যবদ্ধ রূপটিই বড়ো, তেমনি নাটকে স্থান-কালের প্রশ্ন বড়ে নয়, বড়ো হল এর অবিচ্ছেদের, এর স্বতঃউৎসারিত ঘটনাপ্রবাহ ও তজ্জনিত রস-সৃষ্টির।

নাটকের সমস্ত অঙ্কে নায়ক উপস্থিত না থাকলেও ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা প্রতি অঙ্কেই তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। তিন বা চারজন পাত্রদ্বারা অঙ্ক সংযুক্ত করতে হবে।[১৬] নায়ক কোন কারণে কোন অঙ্কে অনুপস্থিত থাকলেও উপস্থিত পাত্র-পাত্রীরা বারবার ঐ নায়কের প্রসঙ্গ আলোচনা করবে বা বারবার তার নাম উচ্চারণ করবে। এভাবেই নায়ক প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে নাটকের অঙ্কে উপস্থিত থেকে অঙ্ককে আসন্ননায়ক করে তুলবে। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বা "মুদ্রারাক্ষসম্" নাটকের প্রথম অঙ্কে নায়কের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও তাদের নাম বারবার উচ্চারণের দ্বারা অঙ্ক আসন্ন নায়ক হয়ে উঠেছে।

কতকগুলি বিষয়ের বর্ণনা নাটকের অঙ্কে বর্জন করতে হবে। যেমন দূর থেকে কাউকে আহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপদান, মলত্যাগ, মৃত্যু, সুরতক্রীড়া, অধরদংশন, নখাঘাত, অন্যান্য লজ্জাকর কাজ, শয়ন, অধরপান, নগর-অবরোধ, স্নান, অনুলেপন প্রভৃতি।[১৭]

নাটকে উপরিউক্ত বিধিনিষেধের উপযুক্ত কারণও ছিল। শিল্প সাহিত্যের মূল লক্ষ্য রসসৃষ্টি হলেও মানুষের মঙ্গল ও মানবজীবনের অভ্যুদয়ের জন্যই রসসৃষ্টি করতে হবে এটাই ছিল নাট্যরচয়িতাগণের উদ্দেশ্য। তাই শুধু লজ্জাকর বস্তুই নয়, যা মানুষের স্নায়বিক চাঞ্চল্য ঘটায়, যা মানুষকে বিভ্রান্ত ও অস্থির করে, যা সৃজনের পরিবর্তে শুধু হিংসা, বিদ্বেষ ও মাৎসর্য জাগায় তা নাটকে ও নাট্যমঞ্চে নিষিদ্ধ হয়েছে।

তবে অধিকাংশ নাটকের গঠনের ক্ষেত্রে এই নিষেধবিধি মানা হলেও ভাস প্রভৃতির নাটকে এর কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ভবভূতি বিরচিত "উত্তররামচরিতের" প্রথম অঙ্কে রাম বক্ষে সীতার শয়ন, কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের তৃতীয়াঙ্কে দুষ্যন্তের চুম্বনোদ্যোগ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দৃশ্যও স্থান পেয়েছে। কারণ যে পরিবেশে এইসব দৃশ্য দর্শিত হয়েছে সেই পরিবেশে এরা যে অশ্লীল তা

কোন প্রকারেই মনে হয় না। অসভ্য, উন্মাদনার জনক না হলে শয়ন-চুম্বনাদি দৃশ্যও অশ্লীল নয়। এছাড়া নাটকের বৃহত্তর প্রয়োজনেও অনেক সময় আলংকারিক নিষেধ-নীতি লঙ্ঘন করতে হয়। যেমন প্রসাধন ব্যাপার দৃশ্যকাব্যে নিষিদ্ধ হলেও "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের তৃতীয় অঙ্কে এই দৃশ্য দেখানো হয়েছে। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা নামক দুই সখী শকুন্তলাকে রঙ্গমঞ্চেই সাজাচ্ছেন। এই প্রসাধন দৃশ্যের প্রয়োজন ছিল। কারণ পঞ্চমাঙ্কে যাতে শকুন্তলার রূপান্তর দুষ্যন্তের মত দর্শকদেরও ভ্রান্তি উৎপাদন না করে সে সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনই কবির অভিপ্রায় ছিল।

অবশ্য আধুনিক নাটক বিবাহ, ভোজন, শয়ন, অধরপান, মৃত্যু ইত্যাদি নিষেধের সার্থকতা স্বীকার করে না। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নাটকীয় কৌশলের তথা যুগরুচির পরিবর্তনই এর কারণ।

নাটকের অঙ্ক অত্যন্ত দীর্ঘ হবে না। কারণ অঙ্ক বিস্তৃত হলে তা দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। তাছাড়া রাজার প্রধান মহিষী, পরিজন, অমাত্য, বণিক প্রভৃতি চরিত্রকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যা রস বা ভাবকে উদ্রিক্ত করতে পারে। অঙ্কের শেষে সমস্ত নাটকীয় পাত্র-পাত্রী রঙ্গমঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাবে।[১৮] তৎকালীন নাটকে পর্দাব্যবস্থা ছিল না। সেকারণেই বোধহয় সমস্ত পাত্র-পাত্রীকে মঞ্চ থেকে বের করে দিয়ে অঙ্কের অবসান সূচনা করতে হত।

আচার্য ভরত নাটকের গঠনগত রীতি সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে যা বলেছেন তা হল – নাটক হবে বৃত্তি ও বৃত্তঙ্গযুক্ত, অর্থপ্রকৃতিসম্পন্ন, পঞ্চ-অবস্থা থেকে উদ্ভূত, পঞ্চসন্ধিসমন্বিত, একুশটি সন্ধ্যন্তর ও চৌষট্টি সন্ধ্যঙ্গবিশিষ্ট, ছত্রিশ লক্ষণান্বিত, গুণে ও অলংকারে সজ্জিত, মহারস ও মহাভোগযুক্ত, উদাত্ত বচনসম্পন্ন, মহাপুরুষের কার্যকলাপপূর্ণ, সদাচারযুক্ত, জনপ্রিয়, সুগ্রথিত, সন্ধিসমন্বিত, সহজে অভিনেয়, সুখকর এবং মৃদুশব্দবহুল।[১৯]

বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও বর্ধনের উপর ভিত্তি করেই নাটকের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। আলংকারিগণ তাই নাটকের পরিকাঠামো গঠনের ব্যাপারে সচেতনভাবে কিছু নীতি নির্ধারণ করছেন যে নীতির উপর ভিত্তি করে সুন্দর ও সুশৃংখল দৃশ্যকাব্য গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এক যুগে যা নীতি, অন্য যুগে তা হয়তো নীতি বলে গণ্য নাও হতে পারে। কারণ যুগে যুগে মানব-কল্যাণের কথা ভেবে নীতির পরিবর্তন হয়। শিল্পী বা স্রষ্টাকেও নূতন নূতন নীতির সঙ্গে আপোষ ও সংগতি রক্ষা করতে হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে ভারতীয় নাট্যকারগণ ছিলেন যথেষ্ট উদার। তাঁরা কোনদিনই যুগধর্মকে অস্বীকার বা অবহেলা করেন নি। সেকারণেই যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে সংস্কৃত নাটকের গঠন রীতিরও তাঁরা কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং সেই পরিবর্তন নাট্যসমাজে আদৃত হয়েছে।

নামকরণ সংক্রান্ত রীতি

রূপকের নামকরণ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতীয় নাট্যালংকার শাস্ত্রে দৃশ্যকাব্যের নামকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বিহিত হয়েছে।

নাটকীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সমগ্র নাটকের উপর যার বিশেষ প্রভাব সেই অনুসারেই নাটকের নামকরণ হয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথের অভিমত হল – নাটকের নামকরণ এমন করতে হবে যাতে গর্ভিতার্থ প্রকাশিত হয়।[২০] অর্থাৎ নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞাপক হয় এরূপ নামকরণ করতে হবে। যেমন ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'', ''স্বপ্নবাসবদত্তম্'' ইত্যাদি। শকুন্তলা নাটকে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের মুখ্য হেতু হল অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক। অঙ্গুরীয়ক বৃত্তান্তটিই এই নাটকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়কে অবলম্বন করেই সেজন্য নাটকের নামকরণ করা হয়েছে। ''স্বপ্নবাসবদত্তম্'' নাটকে নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনে স্বপ্নবৃত্তান্তের প্রভাব সমধিক। অতি গুরুত্বপূর্ণ এই স্বপ্নবৃত্তান্তের জন্যই নাটকের নাম ''স্বপ্নবাসবদত্তম্''।

নায়ক ও নায়িকার উভয়ের সম্মিলিত নাম নিয়েই প্রকরণাদির নামকরণ হবে।[২১] যথা ''মালতীমাধবম্''। এই প্রকরণের নায়ক মাধব এবং নায়িকা মালতী। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হল ''মৃচ্ছকটিকম্''। নাটকের মতই এই প্রকরণটির নাম গর্ভিতার্থ প্রকাশক। অতএব প্রকরণের নামকরণ বিষয়ে যে নিয়ম তা সার্বত্রিক নয়, প্রায়িক।[২২] নায়িকার নাম দিয়ে নাটিকা, সট্টক প্রভৃতির নামকরণ করা হয়ে থাকে।[২৩] যথা রত্নাবলী, কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি। ''রত্নাবলী'' নাটিকা, ''কর্পূরমঞ্জরী'' সট্টক। বস্তুতপক্ষে হয় গর্ভিতার্থ, না হয় নায়ক-নায়িকার নাম নিয়েই দৃশ্যকাব্যের নামকরণ হয়। সকলদেশের নাটকেই নামকরণের এটাই সাধারণ পদ্ধতি।

দৃশ্যকাব্যে ব্যক্তিভেদে নামকরণের এক বিশেষ নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। যেমন বেশ্যাদের নামের শেষে দত্তা, সিদ্ধা, সেনা প্রভৃতি শব্দ যোগ করা হয়।[২৪] ''মৃচ্ছকটিক'' প্রকরণে বেশ্যার নাম তাই বসন্তসেনা। চেট অর্থাৎ ভৃত্য এবং চেটী অর্থাৎ দাসী প্রভৃতির নাম হবে বসন্ত প্রভৃতি কালে বর্ণনীয় বস্তুর নাম অনুসারে। তাই 'মালতীমাধব' প্রকরণে দাসের নামকরণ করা হয়েছে কলহংস। বসন্তকালে এই কলহংসমালা দৃষ্ট হয়। সেজন্যই ভৃত্যের এরূপ নামকরণ হয়েছে। এভাবেই ''মালতীমাধবের'' চেটীর নাম মন্দারিকা। মন্দার পুষ্প শীতকালে ফোটে। তাই কালানুসারে জাত বস্তুর নাম অনুযায়ী চেট, চেটী প্রভৃতিদের নামকরণ

হয়েছে।[২৫] নাট্যশাস্ত্রকারের মতে নাটকে ভৃত্যদের নাম হবে বিবিধ পুষ্পের ন্যায়। চেটগণের নাম হবে মঙ্গলসূচক।[২৬] বণিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের নামের শেষে 'দত্ত' শব্দ যোগ করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বণিকদের নামের শেষে 'ভূতি' প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হয়। দত্তশব্দান্ত নাম যথা বিষ্ণুদত্ত। বণিক না হয়েও ব্রাহ্মণ যদি বণিকবৃত্তি অবলম্বন করেন তাহলে তাঁদের নামের শেষে 'দত্ত' শব্দের ব্যবহার নাট্যশাস্ত্রে লক্ষ্য করা যায়। যেমন মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত ব্রাহ্মণ হলেও তিনি বণিকবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন বলে দত্তশব্দান্ত নাম ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রের নামকরণ প্রসঙ্গে আচার্য ভরত আরও জানালেন যে বীরগণের ক্ষেত্রে অতিশয় শৌর্যসূচক নাম করণীয়।[২৭] গোত্র এবং পেশাগত কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নামের সঙ্গে যথাক্রমে শর্মা এবং বর্মা পদবী যুক্ত হয়।[২৮]

যে সব রূপকের বস্তু কবিকল্পিত সেসব ক্ষেত্রে নৃপতির নাম হবে আর্যক, পালক বা সুদর্শন প্রভৃতি। প্রয়োগকর্তা তাঁর ভার্যার নাম দেবেন শশিকলা, চন্দ্রলেখা, ইন্দুমতী ইত্যাদি। আর নৃপপত্নীর সখীদের নাম হবে প্রিয়ংবদা প্রভৃতি।[২৯] নাট্যশাস্ত্রকারের মতে সর্বদা রাণীদের নাম হবে জয়সূচক।[৩০] উত্তম চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে বলা হয় যে যেহেতু তাদের কর্ম হবে নামের অনুরূপ সেহেতু তাদের ক্ষেত্রে গভীরার্থবোধক নাম করণীয়।[৩১] অবশিষ্ট চরিত্রগুলির নাম হবে জাতি ও কাজ অনুসারে।[৩২]

ফল, নিজ নিজ জাতি, গুণ ও আচরণ অনুসারে কপি, চণ্ডাল, রাক্ষস, চোর, দ্যুতকর, শিল্পী, নাবিক ও শকটাদি চালকের নাম হবে। মুণ্ডব্রতধারিগণের দেওয়া হবে উগ্রনাম – যথা অঘোর, ভৈরবাচার্য, কপালশিখর প্রভৃতি। ধার্মিকগণের নাম হবে শ্রীগুরু, স্কন্দদাস প্রভৃতি। ক্ষপণক এবং ভিক্ষুগণের নামের শেষ অংশ হবে নন্দী। বিপ্রের নামের শেষ পদ হবে বসু এবং নাট্যনির্দেশকের আচার্য।[৩৩] কঞ্চুকী এবং রাজবাড়ী তত্ত্বাবধায়কদের (chamberlain) নাম হবে আস্থাপ্রকাশক। যেমন বিনয়ন্ধর, বাভ্রব্য, জয়ন্ধর ইত্যাদি। চারণকবি এবং সময়রক্ষকগণ ভূষিত হন কাম্পিল্য নামে। মন্ত্রীদের মেধাসূচক নামকরণ করা হয়। যেমন সুবুদ্ধি, বসুভূতি ইত্যাদি। পুরোহিতদের অধিকাংশই কৌস্ত, গৌতম ইত্যাদি গোত্রজ নামে অভিহিত। বিদূষকের নামের ক্ষেত্রে ঋতুর নাম ব্যবহৃত হয়। যথা বসন্তক, মাধব্য ইত্যাদি। কখনও কখনও তাদের ক্ষেত্রে তামাসা বা রহস্যপ্রিয় নামও ব্যবহৃত হয়। নায়কদের নামের শেষে ভূষণ, উত্তমস ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়। কারণ তাঁরা সমাজের ভূষণস্বরূপ। এছাড়া উদাত্ত, ললিত, উদ্ধত এবং শান্ত – রূপ অনুযায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে নায়কদের নামকরণও করা হয়।

সম্বোধন (পুরুষদের ক্ষেত্রে)

দৃশ্যকাব্যের পাত্র-পাত্রী পারস্পরিক উক্তি-প্রত্যুক্তিকালে একে অপরকে সম্বোধন করে থাকেন। কোন্ শ্রেণীর পাত্র কাকে কিভাবে সম্বোধন করবেন সে সম্পর্কে নাট্যতত্ত্বে সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে।

রাজাকে অমাত্য প্রভৃতি ভৃত্যগণ "স্বামী" বা " দেব" শব্দের দ্বারা সম্বোধন করবেন। অধম জাতীয় পাত্র রাজাকে 'ভট্ট' শব্দের দ্বারা সম্বোধন করবেন। রাজর্ষি এবং বিদূষক তাঁকে সম্বোধন করবেন 'বয়স্য' শব্দের দ্বারা। ঋষিগণ রাজাকে 'রাজন্' শব্দের দ্বারা বা অপত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দের দ্বারা সম্বোধন করবেন।[৩৪] অর্থাৎ পিতৃনাম বা বংশনামের সঙ্গে অপত্য-প্রত্যয় যোগ করে যে শব্দ হয় সেই শব্দের দ্বারা রাজা ঋষিগণ কর্তৃক সম্বোধিত হবেন। যেমন পুরুর অপত্য পৌরব, দশরথের পুত্র দাশরথি ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণ রাজাকে ইচ্ছানুসারে নাম ধরে সম্বোধন করতে পারেন। কারণ দ্বিজগণ পূজনীয় বলে কথিত।[৩৫] বিদূষক রাজাকে বয়স্য বা রাজন্ বলে সম্বোধন করবেন।[৩৬] রাণী রাজাকে যৌবনে বলবেন 'আর্যপুত্র' এবং অন্য সময়ে 'আর্য' বলে সম্বোধন করবেন। সকল স্ত্রীলোকও স্বামীকে এইরূপ সম্ভাষণ করবেন।[৩৭]

ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকে ইচ্ছানুযায়ী অপত্য প্রত্যয়যুক্ত শব্দে সম্বোধন করবেন অথবা সেই ব্যক্তির বিশেষ নাম ব্যবহার করতে পারেন। অপর সকলে ব্রাহ্মণকে সম্বোধনের সময় 'আর্য' শব্দ ব্যবহার করবেন। রাজা বিদূষককে সম্বোধনের সময় 'বয়স্য' শব্দ ব্যবহার করবেন অথবা তার ব্যক্তিগত নাম উচ্চারণ করে সম্বোধন করবেন।[৩৮] ধনঞ্জয়ের মতে ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলা হবে 'আর্য'।[৩৯]

নটী ও সূত্রধার পরস্পরকে 'আর্য' নামে সম্বোধন করবেন। পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে বলবেন 'ভাব' এবং সূত্রধার পারিপার্শ্বিককে বলবেন 'মারিষ'। অধম ব্যক্তি অধম ব্যক্তিকে সম্বোধনের সময় ব্যবহার করবেন 'হণ্ডে' শব্দ। উত্তম ব্যক্তিগণ পরস্পরকে 'বয়স্য', মধ্যম ব্যক্তিগণ পরস্পরকে 'হংহো' এবং কনিষ্ঠগণ অগ্রজকে 'আর্য' শব্দে সম্বোধন করবেন।[৪০] এ প্রসঙ্গে আচার্য ভরতের অভিমত হল যে মান্য ব্যক্তিকে 'ভাব' বলে সম্বোধন করা বিধেয়। তাঁর অপেক্ষা কিছু পরিমাণে কম মান্য ব্যক্তিকে 'মারিষ' বলা উচিত। সমপর্যায়ের লোককে বলা উচিত 'বয়স্য' এবং অধম ব্যক্তিকে বলা উচিত 'হংহো', 'হণ্ডে'।[৪১]

সূত সবসময় রথারোহীকে 'আয়ুষ্মন্' বলে সম্বোধন করবেন। বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বালক অথবা যুবক 'তাত' শব্দের দ্বারা সম্বোধন করবেন।[৪২] পিতা বা গুরু পুত্র বা শিষ্যকে বৎস, পুত্রক বা তাত শব্দে অথবা নাম ধরে বা গোত্র নামে সম্ভাষণ করবেন।[৪৩]

ব্রাহ্মণগণ সচিবকে অমাত্য বা সচিব বলে সম্ভাষণ করবেন। অন্য হীন ব্যক্তিরা সর্বদা তাঁকে 'আর্য' বলে সম্ভাষণ করবেন।[৪৪]

তপস্বী ও প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা 'সাধো' শব্দের দ্বারা সম্বোধন করবেন। শিষ্যগণ গুরু প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিদের নাম গ্রহণ না করে 'সুগৃহীতাভিধ' শব্দের দ্বারা সম্বোধন করবেন।[৪৫]

আচার্যকে 'উপাধ্যায়' এবং ভূপতিকে 'মহারাজ' অথবা 'স্বামিন্' শব্দে সম্বোধন করতে হবে। যুবরাজকে 'কুমার' অথবা 'ভর্ত্তৃদারক' বলে সম্বোধন করতে হবে। অধম ব্যক্তিরা কুমারকে 'সৌম্য' অথবা 'ভদ্রমুখ' বলে সম্বোধন করবেন।[৪৬] এপ্রসঙ্গে আচার্য ভরতের মত হল – যুবরাজকে 'স্বামী', অন্য রাজকুমারকে 'ভর্তৃদারক', অধম ব্যক্তিকে 'হে সৌম্য', 'ভদ্রমুখ' – এইভাবে বলা উচিত।[৪৭]

সমপর্যায়ের ব্যক্তি যে নামে পরিচিত সেই নামে তাকে সম্ভাষণ করা হবে। হীন ব্যক্তি বিশেষ অধিকার বলে উত্তম ব্যক্তিকে নাম ধরে সম্ভাষণ করবে।[৪৮] বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসীকে প্রযোক্তাগণ 'ভদন্ত' বলে সম্ভাষণ করবেন।[৪৯] দেবতা, ঋষি ও দণ্ডকমণ্ডলুধারীকে সকলে 'ভগবন্' বলে সম্বোধন করবে।[৫০] এ প্রসঙ্গে দশরূপককারের অভিমত হল – বিদ্বান্ ব্যক্তি, দেবর্ষি এবং সন্ন্যাসীদের 'ভগবন্' বলে সম্বোধন করতে হবে।[৫১]

পাষণ্ড অর্থাৎ কাপালিক প্রভৃতিকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ক্রিয়া অনুসারে 'কাপালিক' প্রভৃতি নামে সম্বোধন করা হবে। শক, যবন প্রভৃতিকে 'ভদ্রদত্ত' প্রভৃতি নামদ্বারা সম্বোধন করতে হবে।[৫২] যার যা কার্য (অর্থাৎ শিল্প, বিদ্যা, জাতি ইত্যাদি অনুযায়ী) তাকে সেই অনুসারে তাম্বুলিক, চৈত্রিক, বৈয়াকরণ, রজক ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা যাবে।[৫৩]

সম্বোধন (স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে)

নাটকে গুরুপত্নী ও স্থানীয়া নারীকে 'ভবতি' বলে সম্ভাষণ করা হয়। এখানে স্থানীয়া বলতে বোঝায় যিনি স্থানে আছেন। অর্থাৎ উচ্চপদে আসীনা বা মর্যাদাসম্পন্না নারীকে স্থানীয়া বলা হতে পারে। আবার স্থানীয়া শব্দের দ্বারা সম্ভ্রান্ত নারীকেও বোঝাতে পারে। কারও মতে স্থানীয়া হলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পত্নী। গম্যা নারীকে অর্থাৎ সম্ভোগের যোগ্য নারীকে 'ভদ্রা' বলে এবং বৃদ্ধাকে 'অম্বা' বলে সম্বোধন করতে হয়।[৫৪] বিদূষক রাজ্ঞী ও চেটীকে 'ভবতি' বলে সম্বোধন করবেন।[৫৫]

তাপসী ও দেবীকে 'ভগবতী' বলে সম্বোধন করতে হয়।[৫৬] মহাত্মা মহর্ষিগণের পত্নীগণকেও 'ভগবতী' বলে সম্ভাষণ করা বিধেয়।[৫৭]

রাণীদের 'ভট্টিনী', 'স্বামিনী' ও 'দেবী' বলে সম্বোধন করতে হয়।[৫৮] উত্তম, মধ্যম ও অধম সকল ব্যক্তিই প্রভূর স্ত্রীকে দেবী বলে সম্বোধন করবেন।[৫৯] রাজা তাঁর মহিষীকে 'দেবী' বলে সম্বোধন করবেন। অবশিষ্ট ভোগিনীগণকে অর্থাৎ উপপত্নী বা রাজার ভোগ্যা নারীকে (যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহসূত্রে তাঁর সঙ্গে আবদ্ধ নন) বলতে হয় স্বামিনী।[৬০] রাজা বা অন্য লোক শৃংগার রসের স্ত্রীকে 'প্রিয়া' বলে সম্বোধন করবেন।[৬১]

পরিচারিকাগণ রাজকুমারীকে বলবে 'ভর্তৃদারিকা'। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে 'ভগিনী' এবং কনিষ্ঠাকে 'বৎসা' বলে সম্বোধন করতে হয়।[৬২] আবার প্রজাবর্গও রাজকুমারীকে 'ভর্তৃদারিকা' বলে সম্বোধন করবেন এরূপ বিধান দেওয়া হয়েছে সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে।[৬৩]

ব্রাহ্মণী, লিঙ্গস্থা অর্থাৎ ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশেষের বেশধারিণী ও ব্রতিনী নারীকে 'আর্যা' বলে সম্বোধন করতে হয়। স্ত্রীকেও 'আর্যা' বলে সম্বোধন করা যাবে। এছাড়াও স্ত্রীকে সম্ভাষণ করার সময় তাঁর পিতৃনাম যথা মাঠরের কন্যা অর্থে মাঠরপুত্রী, বা পুত্রের নাম যথা সোমশর্মার মা উল্লেখ করে সম্ভাষণ করা যাবে।[৬৪] পুরোহিত বা বণিক্গণের স্ত্রীকে সর্বদা 'আর্যা' বলে সম্ভাষণ করতে হয়।[৬৫]

সমপর্যায়ের সখীগণ পরস্পরকে 'হলা' বলে সম্বোধন করবে। স্ত্রীলোক উত্তম পরিচারিকাকে 'হঞ্জে' বলে সম্ভাষণ করবেন। বেশ্যার পরিজন তাকে সম্বোধন করবে 'অজ্জুকা' বলে এবং বৃদ্ধা বেশ্যাকে তার পরিজন বলবে 'অত্তা'।[৬৬] আচার্য বিশ্বনাথ একটু অন্যভাবে অভিমত প্রকাশ করে বললেন যে নিজের তুল্য সেবিকাকে 'হলা', বেশ্যাকে 'হঞ্জে' এবং কুট্টিনীকে 'অজ্জুকা' বলে সম্বোধন করতে হবে। এতদ্ব্যতীত অনুগত ব্যক্তিরা কুট্টিনীকে এবং পূজনীয়া বৃদ্ধাকে 'অম্ব' বলে সম্বোধন করবে।[৬৭] অন্যান্য ক্ষেত্রে যথোপযুক্তভাবে সম্বোধন করতে হবে।[৬৮]

নাট্যোক্তি বা সংলাপ

নাটক হল উক্তি-প্রত্যুক্তির সমন্বয়। নাটকীয় পাত্র-পাত্রী রঙ্গমঞ্চে অন্য পাত্রের সঙ্গে অথবা অন্য পাত্রের অনুপস্থিতিতে এককভাবে অনুপস্থিত পাত্রকে শুনিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে উক্তি-প্রত্যুক্তি করে তাকেই বলে নাট্যোক্তি বা সংলাপ। সংলাপের শক্তিতেই লৌকিক চরিত্রগুলি অলৌকিক 'বিভাবে' পরিণত হয়, যে বিভাব দর্শকের অন্তঃস্থিত স্থায়ী ভাবকে উদ্বোধিত, উদ্দীপ্ত ও পরিপুষ্ট করে রসে পরিণত করে। অতএব দৃশ্যকাব্যে নাট্যোক্তি বা সংলাপের বিশেষ গুরুত্ব আছে। নাটকীয় কাহিনীর গতি ও চরিত্র সৃষ্টির এটাই একটি মুখ্য উপায়। কিন্তু এই সংলাপে বক্তার অন্তর ও আদর্শের প্রকৃত ছায়া পড়া চাই। নচেৎ সংলাপ প্রাণবন্ত হয় না, তার সার্থকতা থাকে না।[৬৯] সমালোচক হাডসনের মতে সংলাপ নাটকীয় কাহিনীর গতির এক অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য অঙ্গ। নাটকীয় চরিত্রায়নের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সংযোগ।[৭০]

দৃশ্যকাব্যে এই সংলাপ কথনের মুখ্যত দুটি রীতি দৃষ্ট হয়। যথা – ১) সকলের অশ্রাব্য এবং ২) শ্রাব্য। সকলের অশ্রাব্য হল স্বগত। আর শ্রাব্য উক্তি তিন প্রকার। যথা – সর্বশ্রাব্য, অভিপ্রেতজনের শ্রাব্য এবং বক্তৃমাত্রশ্রাব্য। অভিপ্রেতজনের শ্রাব্য আবার দুরকম। যথা অপবারিত ও জনান্তিক। সুতরাং সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে নাট্যোক্তি পাঁচপ্রকার। যথা – ১) স্বগত, ২) সর্বশ্রাব্য বা প্রকাশ, ৩) বক্তৃমাত্রশ্রাব্য বা আকাশভাষিত, ৪) অপবারিত এবং ৫) জনান্তিক।

একটি ছকের সাহায্যে সংক্ষেপে নাট্যোক্তিকে বোঝাবার চেষ্টা করা হল –
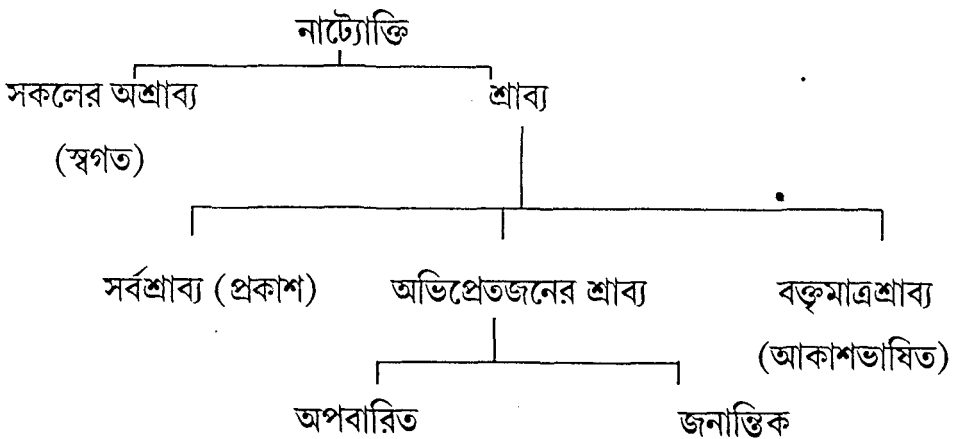
স্বগত বা আত্মগত ঃ

যে উক্তি অন্যের শ্রাব্য নয় অর্থাৎ যে উক্তি নাট্যমঞ্চে উপস্থিত অন্য সমস্ত অভিনেতার শ্রুতিগম্য হবে না, কেবল নিজের কাছেই শ্রুতিগত হবে তাকে বলে স্বগত।[৭১] স্ব অর্থাৎ নিজের কাছেই এই বাক্য শ্রুতিগত

হয় বলে এর নাম স্বগত।[৭২] রূপগোস্বামীও অনুরূপভাবে বললেন যে, যা একমাত্র নিজেই জানা যায়, অপরে জানতে পারে না তাকে স্বগত বলে।[৭৩] দশরূপককারের মতে যা সকলের অশ্রাব্য সেরূপ উক্তি স্বগত নামে পরিচিত।[৭৪] নাট্যশাস্ত্রকারের মতে স্বগত উক্তি হল আত্মগত। ভরতের মতে – অতিশয় হর্ষ, মত্ততা, উন্মাদ, রাগ, দ্বেষ ও ভয়পীড়িত কোন ব্যক্তি একা বিস্ময়, ক্রোধ, দুঃখ ও আর্তিবশতঃ যে মনের কথা বলে তা আত্মগত বলে কথিত হয়।[৭৫]

স্বগত উক্তির উদাহরণ যেমন "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের প্রথম অঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত বলছেন - (আত্মগত) এখন কি করে নিজের পরিচয় দিই? নিজেকে গোপনই বা করি কি করে? বেশ এঁকে এই বলি। (প্রকাশ্যে) পুরুবংশের রাজা যাকে ধর্মাধিকারে নিযুক্ত করেছেন আমি সেই লোক। ধর্মকার্য নির্বিঘ্নে হচ্ছে কিনা তা জানতে আমি এই তপোবনে এসেছি।[৭৬]

আবার এই নাটকের প্রথম অঙ্কেই রাজা দুষ্যন্ত বলছেন – (আত্মগত) আর, আমার ইচ্ছা সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু পরিহাস করে সখী যে বর প্রার্থনার কথা বলেছে, তা শুনে আমার মন দ্বিধায় কাতর হচ্ছে।[৭৭]

প্রকাশ ঃ- নাট্যমঞ্চে উপস্থিত সমস্ত পাত্র-পাত্রী যে উক্তি শ্রবণ করে তাকে বলে প্রকাশ।[৭৮] সকলের কাছে প্রকাশিত হয় বলেই এর নাম প্রকাশ।[৭৯] রূপ গোস্বামী প্রকাশকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা – ১) সর্ব-প্রকাশ এবং ২) নিয়ত-প্রকাশ[৮০] অবস্থিত সমস্ত জনগণেরই যা শ্রবণযোগ্য তাকে বলে সর্বপ্রকাশ। আর অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি যা শুনতে পায় তাকে বলে নিয়তপ্রকাশ।[৮১] রূপ গোস্বামীর মতে এই নিয়তপ্রকাশ – জনান্তিক ও অপবারিত ভেদে দুই প্রকার।[৮২] দশরূপককারও একইরকম ভাবে বললেন যে নিয়তশ্রাব্য নাট্যধর্ম দুপ্রকার – জনান্ত এবং অপবারিত।[৮৩]

অপবারিত ঃ- যাকে শোনাতে চাওয়া হচ্ছে না সেই পাত্রের দিকে অর্থাৎ অবাঞ্ছিত জনের দিকে পিছন ফিরে বাঞ্ছিত জনের সঙ্গে যে গোপন আলাপ তাকে বলে অপবারিত।[৮৪] অপ অর্থাৎ পৃষ্ঠবর্তীজনকে শ্রবণে বারিত করা হয় বলে এর নাম অপবারিত।[৮৫] রূপগোস্বামী বললেন যে, কিছুটা দূরে গিয়ে অপরে শুনতে না পায় এমনভাবে যে বাক্যকথন তার নাম অপবারিত।[৮৬] এ প্রসঙ্গে দশরূপককার ও রূপগোস্বামীর মত হুবহু এক।[৮৭] আচার্য ভরতের মতে অন্য সকলের কাছ থেকে কোন বিষয়কে গোপন করে বিশ্বাস্য ব্যক্তির কাছে তা প্রকাশ করার নাম অপবারিত।[৮৮] যেমন "রত্নাবলী"র শেষে বাসবদত্তা সাশ্রুনেত্রে রত্নাবলীকে

বন্ধুস্নেহ নিবেদন করতে বাহু প্রসারিত করেও রত্নাবলীর দিকে পিছন ফিরে রাজাকে বলছেন- এর সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করার জন্য আমি লজ্জিত।[৮৯]

জনান্তিক ঃ- ত্রিপতাকার মত হস্তমুদ্রার দ্বারা অন্য সকল ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বাঞ্ছিতজনের সঙ্গে গোপন মন্ত্রণা বা আলাপকে বলা হয় জনান্তিক।[৯০] বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে কুঞ্চিত করে, অনামিকাকে নমিত করে এবং অবশিষ্ট তিনটি আঙুলকে উন্নমিত করে যে বিশেষ হস্তভঙ্গী করা হয় তাকেই বলে ত্রিপতাকা। নাট্যশাস্ত্রেও বলা হয়েছে যে কার্যবশতঃ পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক যা শ্রুত হয় না তা জনান্তিক।[৯১] জনান্তিকের প্রয়োগ বা অভিনয় কেমনভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দিতে গিয়ে আচার্য ভরত জানালেন যে ত্রিপতাকার ভঙ্গীতে হস্ত ঢেকে প্রযোক্তৃগণ কর্তৃক জনান্তিক ও অপবারিত প্রযোজ্য।[৯২] রূপ গোস্বামী তাঁর ''নাটকচন্দ্রিকা'' গ্রন্থে জনান্তিকের লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রায় একইরকম ভাবে অভিমত প্রকাশ করে বললেন যে কথার মধ্যে ত্রিপতাকাকৃতি অঙ্গুলিসংকেতে এবং অন্যের অগোচরে ও নিকটে যে পরস্পর কথোপকথন তার নাম জনন্তিক।[৯৩] সাহিত্যদর্পণে উল্লিখিত জনান্তিকের লক্ষণ হুবহু ধনঞ্জয় কথিত লক্ষণেরই অনুরূপ।[৯৪] ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকের প্রথম অঙ্কে দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রথম দর্শনেই প্রণয় জন্মাবার পর সখীদের যে উক্তি (দুজনের রকম দেখে জনান্তিকে) শকুন্তলা, যদি এখানে আজ পিতা থাকতেন – তা জনান্তিকের উদাহরণ।[৯৫]

'অপবারিত' উক্তিতে অবাঞ্ছিতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকে পিছনে রাখা হয়। আর জনান্তিক আলাপে ত্রিপতাকাবৎ হস্তভঙ্গী করে অবাঞ্ছিতকে বারণ করা হয়।[৯৬] প্রাচীনকালের নাটকীয় জনন্তিকের ব্যাপারটি বর্তমান কালের অভিনেতা অভিনেত্রীগণ সাধারণ সমক্ষে আঙুল নেড়ে ঠারে ঠোরে কথা বলে সেরে নেন।

আকাশভাষিত ঃ- সংস্কৃত নাটকে আরও এক ধরণের উক্তি দেখা যায়, তা হল আকাশভাষিত। সংস্কৃত নাট্যোক্তির এটি একটি উল্লেখযোগ্য ভেদ। রঙ্গমঞ্চের কোন চরিত্র যদি অদৃশ্য কোন পাত্র-পাত্রীর উক্তি শুনে তার সঙ্গে 'কি বলছ' এইভাবে আরম্ভ করে আলাপ করে তবে সেই ভাষণকে বলা হয় আকাশভাষিত।[৯৭] আকাশ শব্দের অর্থ শূন্য। তাই শূন্য বা আকাশের দিকে তাকিয়ে এরূপ উক্তি করা হয় বলেই এই প্রক্রিয়ার নাম আকাশভাষিত। পাত্র অলক্ষ্যে থাকায় এ যেন শূন্যের সঙ্গে আলাপ। এই আলাপে অদৃশ্যজনের উক্তি-প্রত্যুক্তি আকাশ ভাষাকই শুধু শুনতে পায়। এ যেন কতকটা দূরভাষযন্ত্রে (telephone) আলাপের মত। নাট্যশাস্ত্রে এই উক্তিবিশেষ 'আকাশবচন' নামে কথিত হয়েছে।[৯৮] ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকের

তৃতীয় অঙ্কে আকাশের দিকে তাকিয়ে কণ্বশিষ্যের যে উক্তি – (খানিকটা গিয়ে দেখে, আকাশে) — প্রিয়ংবদা, কার জন্য এই উশীর (বেণার) প্রলেপ আর ডাঁটা শুদ্ধ পদ্ম পাতা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? (শোনার অভিনয় করে) কি বলছ? রোদ লেগে শকুন্তলা খুব অসুস্থ্ হয়ে পড়েছে, তার শরীর ঠান্ডা করার জন্য?[৯৯] তা আকাশভাষিতের উদাহরণ।

একমাত্র ভাণ নামক রূপকে 'আকাশভাষিতে'র বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় রূপকে বিট আকাশভাষিতের কৌশলে অপরের সম্ভাব্য কথা বলে থাকে। নেপথ্যে উচ্চারিত বাক্য শ্রোতারা শুনতে পান। যেমন ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকের দুর্বাসার অভিশাপ বচনটি নাট্যপ্রেক্ষকগণ শুনতে পান, বক্তা দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু আকাশভাষিতে অনুপস্থিত পাত্রের অনুক্ত কথা পুনরুক্তির ছলে মঞ্চে উপস্থিত পাত্র উচ্চারণ করেন। সেজন্য সাগরনন্দী মন্তব্য করেছেন – প্রয়োজনীয় (অথচ) স্বল্প কোন কিছু বলবার জন্য পাত্রের প্রয়োজন নেই। এরূপ ক্ষেত্রে অপর পাত্র প্রবেশ করাবে না, তার কার্যনির্বাহের জন্য আকাশবচন, নেপথ্যোক্তি বা লেখ ব্যবহার করবে।[১০০] সাম্প্রতিক কালের একক অভিনয় বা mono-acting এর ক্ষেত্রে আকাশভাষিতের অস্তিত্ব বজায় আছে। ভাণ ব্যতীত অন্যান্য রূপকে আকাশভাষিতের প্রয়োগ খুবই সীমিত।

এই নাট্যোক্তি বা সংলাপের ভাষার এমনই শক্তি যে এককালে যখন রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য সজ্জার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, তখন বিষয়ের বর্ণনা শুনেই দর্শক মণ্ডলী বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ করতেন এবং এই অসাধারণ মানসপ্রত্যক্ষের ফলেই তাঁদের রসোপলব্ধি হত। ''মৃচ্ছকটিকে'' যে বর্ষার বর্ণনা আছে তা এমনই নিখুঁত যে শুনতে শুনতে মনে হয় যেন বর্ষার বিচিত্র রূপটি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ''অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকে পলায়মান মৃগের বর্ণনা শুনে মনে হয় যেন সেই হরিণটি চোখের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ভবভূতি রচিত ''উত্তরামচরিত'' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দণ্ডকারণ্যের যে বর্ণনা আছে তা অত্যন্ত সজীব ও জীবন্ত।[১০১]

তবে অনেকের মতে স্বগতোক্তি কৃত্রিম। কারণ রঙ্গমঞ্চে একজন স্বগতোক্তি করবে, আর অত্যন্ত কাছে থেকেও অন্য চরিত্রগুলি চুপচাপ অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকবে, স্বগতোক্তি শুনতে পেয়েও না শোনার ভান করবে, এর চেয়ে অস্বাভাবিক ব্যাপার আর কি হতে পারে?

কিন্তু স্বগতোক্তিকে কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক বললে বহু প্রসিদ্ধ নাট্যকারের নাটকগুলি দোষদুষ্ট

হয়ে পড়ে। শেক্সপীয়রের নাটকগুলিতে soliloquy-র একটি বিশেষ মহিমা ও মর্যাদা আছে যদিও এইসব উক্তি অনেক ক্ষেত্রেই বেশ দীর্ঘ। এগুলিকে বাদ দিলে নাটকগুলি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"-এও বহু স্বগতোক্তি আছে এবং সেগুলি নাটকে অপ্রধানও নয়। নাটকে যদি মনস্তত্ব বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকে, যদি সুখে-দুঃখে কোন একটি চরিত্রের অন্তরের প্রতিক্রিয়াকে দর্শক সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করা নিষ্প্রয়োজন না হয়, তবে স্বগতোক্তির একটি মূল্য দিতেই হয়। কারণ নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করার জন্য এটাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাছাড়া নাটকের দৃশ্যমান ঘটনার আড়ালে কি কি ব্যাপার ঘটছে তা দর্শকদের অনেক সময় জানানো দরকার হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় একজনের সংলাপের মধ্যে দিয়ে অপর আর একজনের চরিত্রের পরিচয় দেওয়াও হয়তো প্রয়োজনীয় হতে পারে।

স্বগত ভাষণ যে একটি কৃত্রিম কলা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শেক্সপীয়র, কালিদাস, ভাস প্রভৃতি নাট্যকারগণ এই কৃত্রিম রীতিটিকে নাটকের এমন স্থলে এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে এমন দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন যে সেখানে একে অস্বাভাবিক বলে মনে হওয়া দূরের কথা, বরং এরই জন্য নাটকটি অধিকতর আকর্ষণীয় হয়েছে। নাটকের action বা গতি সেখানে থেমে যায়নি। বরং নাটকীয় উৎকণ্ঠা ও গাম্ভীর্য আরও বর্ধিত হয়েছে। তাই স্বগত ভাষণ নাটকীয়তা নষ্ট করে এমন কথাও কখনো বলা যায় না।

তাছাড়াও নাটকে অনেক সময় এমন কতকগুলি চরিত্র থাকে (বিশেষতঃ দুষ্ট চরিত্র এবং প্রেমিক চরিত্র) যাদের অন্তরের গোপন রহস্য নাটকের অন্য কোন চরিত্রের কাছে ব্যক্ত করা চলে না, অথচ যে রহস্যের উন্মোচন না হলে দর্শকের পক্ষে নাটকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত উৎসটিকে বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয়। এরূপ স্থলে নাটকের রহস্যজাল ছিন্ন করে নাটকটিকে সুবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য করে তুলতে স্বগতোক্তি শুধু আবশ্যক নয়,এটাই একমাত্র উপায়।

ভাষা ব্যবহারের রীতি

দৃশ্যকাব্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই বিভিন্ন ধরণের পাত্র-পাত্রী যেমন থাকে, তেমনি তারা সকলে এক ভাষায় কথা বলে না। নাট্যপ্রয়োজনে এবং তাদের প্রত্যেকের সামাজিক অবস্থান বোঝাবার জন্য প্রত্যেকের মুখে নাট্যকার বিভিন্ন প্রকার ভাষা ব্যবহার করেন।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে দেশ ও পাত্র অনুসারে নাটকের ভাষা চারপ্রকার। যথা – ১) অতিভাষা ২) আর্যভাষা ৩) জাতিভাষা ৪) যোন্যন্তরী ভাষা[১০২]

'অতিভাষা' দেবগণের ভাষা এবং 'আর্যভাষা' রাজগণের ভাষা। তাই এই দুই ভাষা সংস্কারযুক্ত ও সপ্তদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত।[১০৩] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে প্রাচীনকালে সমস্ত পৃথিবী সাতটি দ্বীপে বিভক্ত বলে মনে করা হত। এদের মধ্যে অন্যতম জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ। আর 'যোন্যন্তরী' ভাষা গ্রাম্য ও অরণ্য পশু এবং বিবিধ বিহঙ্গ থেকে উদ্ভূত।[১০৪] নাট্যপ্রয়োগে 'জাতিভাষা' দুই প্রকার বলে কথিত।[১০৫] নাট্যশাস্ত্রকারের মতে দ্বিবিধ জাতিভাষা হল – 'সংস্কৃত' এবং 'প্রাকৃত'। এই দুই নাট্যভাষাকেই তিনি চতুর্বর্ণের ভাষা বলেছেন।[১০৬] রূপ গোস্বামী নাটকের ভাষাকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করেছেন। যথা – ১) সংস্কৃত এবং ২) প্রাকৃত।[১০৭]

সাধারণত মার্জিত বুদ্ধি, শিক্ষিত ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর পাত্রের ভাষা 'সংস্কৃত' এবং অধম পাত্র-পাত্রীর ভাষা 'প্রাকৃত'।[১০৮] 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে মহারাজ দুষ্যন্ত ও মহর্ষি কণ্ব উত্তম শ্রেণীর পাত্র এবং রাজসারথি, কঞ্চুকী প্রভৃতি মধ্যম শ্রেণীর পাত্র। তাই তাঁদের ভাষা 'সংস্কৃত'। এই নাটকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংকের মধ্যবর্তী অর্থোপক্ষেপকে শিক্ষিত হলেও সামাজিক মর্যাদা উচ্চ নয় বলে নাগরিক শ্যালকের ভাষা 'প্রাকৃত'। আবার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ রচিত "বংগীয়প্রতাপ" নাটকের পঞ্চম অঙ্কে কেশব নিম্নশ্রেণীর পাত্র না হলেও অশিক্ষিত বলে 'প্রাকৃতই' তাঁর ভাষা।

দৃশ্যকাব্যে কোন্ চরিত্রের ভাষা কিরূপ হবে সে প্রসঙ্গে দশরূপককারের অভিমত হল নাটকে নায়কাদি কুলীন এবং কৃতাত্মপুরুষেরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করবেন। তাছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে তপস্বিনী বা সন্ন্যাসিনী, মহারাণী, মন্ত্রীকন্যা এবং বারবণিতারা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করবেন। সাধারণতঃ শিক্ষিত ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর পাত্রদের ভাষা হবে প্রাকৃত।[১০৯] রূপগোস্বামী তাঁর

'নাটকচন্দ্রিকা'য় কারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলবেন তার একটি তালিকা দিয়েছেন। যথা নাট্যশাস্ত্রে দেবতা প্রভৃতি মুনিগণ, নায়ক, তপস্বী বা ব্রহ্মচারী, বিপ্র, বণিক, ক্ষত্রিয়, মন্ত্রী, কঞ্চুকী, বনদেবী, গণিকা, মন্ত্রীর পুত্র প্রভৃতি যোষিৎ, যোগিনী, অপ্সরা এবং শিল্পকারিণী – এই সকল ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করবে।[১১০]

নাটকে দ্বিতীয় যে ভাষাটি ব্যবহৃত হয় তার নাম প্রাকৃত। ভাষার প্রকৃতি হল সংস্কৃত। অতএব সেই প্রকৃতি থেকে জাত ভাষা হ'ল প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাষার প্রধানতঃ চারটি ভেদ। যথা – মাগধী, সৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী এবং পৈশাচী। অবশ্য রূপ গোস্বামীর মতে প্রাকৃত ভাষা ছয়প্রকার। যথা – শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকা, শাবরী ও অপভ্রংশ।[১১১]

নাট্যশাস্ত্রে সাতটি দেশভাষা ও বিভাষার (dialect) কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই সাতটি দেশভাষা হল – মাগধী, অবন্তিজা, প্রাচ্যা, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীকা ও দাক্ষিণাত্যা।[১১২] এছাড়া স্ব স্ব দেশভাষাও সংশ্লিষ্ট দেশবাসীর কথ্যভাষারূপে নাটকে ব্যবহৃত হবে।[১১৩] সাহিত্যদর্পণকারও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[১১৪]

স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রাকৃত ভাষাই নিয়ত।[১১৫] ধনঞ্জয়ের মতে স্ত্রীলোকদের এবং নিম্নশ্রেণীর পুরুষ চরিত্রের ভাষা হবে মূলতঃ প্রাকৃত এবং তা সৌরসেনী প্রাকৃত।[১১৬] স্ত্রীজাতির মধ্যে অনীচ প্রকৃতির অর্থাৎ উত্তম ও মধ্যম প্রকৃতির নারীরা সৌরসেনী ভাষায় কথা বলবেন। 'সুরসেন' শব্দের অর্থ মথুরা। তাই মথুরার ব্যবহৃত প্রাকৃতই সৌরসেনী। কিন্তু মহিলারা যখন কোন গাথা গান করবেন তখন তার ভাষা হবে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত।[১১৭] মেয়েদের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে রূপ গোস্বামী বিশ্বনাথের সঙ্গেই সহমত পোষণ করে বলেছেন যে যাঁরা নায়িকা পদাভিষিক্ত তাঁদের শৌরসেনী প্রযোজ্য। আর উত্তম যোষিদ্‌গণের গাথা অর্থাৎ শ্লোকসমূহে মহারাষ্ট্রী ভাষা প্রযোজ্য।[১১৮]

মহিলাগণ বিদুষী হলেও সেযুগে তাঁরা প্রধানতঃ ছিলেন গৃহকর্ত্রী। তাই গৃহে ব্যবহৃত যে ভাষা অর্থাৎ কথ্য প্রাকৃত ভাষাই ছিল তাঁদের অধিকাংশ সময়ের আলাপ-সংলাপের ভাষা। সুতরাং বাস্তব দিক থেকে 'প্রাকৃতই' নাটকে সমগ্র স্ত্রীজাতির ভাষা হিসাবে প্রযোজ্য। নাহলে নাটকের স্বভাবধর্ম ক্ষুন্ন হয়। নাটকে স্বাভাবিকতার মর্যাদা রক্ষার জন্যই এই রীতিকে অনুসরণ করা হয়। এর মধ্যে স্ত্রীজাতির মর্যাদা ক্ষুন্ন করার কোন অভিপ্রায় নেই।

এছাড়াও ঐশ্বর্য দ্বারা প্রমত্ত দারিদ্র্যবশতঃ উপহতাত্মা এবং কর্ম ও জাতিগুণে যারা নীচ তাদের সম্বন্ধেও প্রাকৃতভাষা প্রযোজ্য।[১১৯] নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ঐশ্বর্যমত্ত ও দারিদ্রক্লিষ্ট উত্তম চরিত্রের মুখে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছেন।[১২০]

রাজার অন্তঃপুরাচারী বামন, ষণ্ড প্রভৃতি চরিত্রের ভাষা হবে মাগধী প্রাকৃত। চেট প্রভৃতি রাজভৃত্য, রাজপুত্র, প্রধান বণিক প্রভৃতি চরিত্রের ভাষা হবে অর্ধমাগধী।[১২১] বিদূষক প্রভৃতির ভাষা হবে প্রাচ্য।[১২২] এখানে প্রভৃতি শব্দের দ্বারা রাজপুত্রী, ধাত্রী ইত্যাদি চরিত্রকেও বোঝানো হয়েছে।[১২৩] অর্থাৎ বিদূষক, রাজপুত্রী, ধাত্রী ইত্যাদি চরিত্রের ভাষা হবে পূর্বদেশীয় প্রাকৃত। রূপ গোস্বামী অবশ্য মনে করেন যে এঁদের ভাষা হবে মাগধী।[১২৪] ধূর্তগণের ভাষা হবে অবন্তিজা বা অবন্তিকা প্রাকৃত। ক্রীড়াসক্ত যোদ্ধা ও নাগরিকদের ভাষা হবে দাক্ষিণাত্যা প্রাকৃত বা বৈদর্ভী প্রাকৃত।[১২৫] শবর, শক, যবন প্রভৃতির মুখের ভাষা হবে শাবরী প্রাকৃত।[১২৬] উত্তরভারতের ব্যক্তিদের ভাষা হবে বাহ্লীক এবং দ্রাবিড়জাতীয় পাত্রের ভাষা হবে দ্রাবিড়।[১২৭] কিন্তু রূপ গোস্বামী চণ্ডাল, যবন প্রভৃতির মুখে অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।[১২৮]

আভীররা হল গোপালক জাতি। এই আভীর বা গোপগণের ভাষা হবে আভীরী। পুক্কস অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির ভাষা হবে চণ্ডালী। কাষ্ঠোপজীবীরা আভীরী ভাষা এবং পত্রোপজীবীগণ শাবরীভাষা ব্যবহার করবে।[১২৯] অঙ্গারকার বা কামার এবং চর্মকারগণ আভীরী অথবা শাবরী ভাষা প্রয়োগ করবে। পিশাচগণ পৈশাচী ভাষা ব্যবহার করবে।[১৩০] ধনঞ্জয়ের মতে পিশাচ এবং অত্যন্ত নীচ জাতির ভাষা হবে পৈশাচী এবং মাগধী প্রাকৃত।[১৩১] রূপ গোস্বামীও এবিষয়ে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন।[১৩২]

নীচ নয় এমন চেটিগণের ভাষা হবে শৌরসেনী। বালক, নপুংসক, নীচ গ্রহাচার্য্য, উন্মত্ত ও আতুর ব্যক্তিগণের ভাষাও হবে শৌরসেনী প্রাকৃত। তবে কখনও কখনও এরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতে পারবে।[১৩৩]

নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে কার কোন্ ভাষা তা একনজরে দেখার জন্য নীচে একটি তালিকা দেওয়া হল —

	পাত্র-পাত্রীর জাতি বা শ্রেণী	ব্যবহৃত ভাষা
১।	ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত	

	এবং ধীরোদ্ধত – যে কোন শ্রেণীর নায়ক	—	সংস্কৃত
২।	উত্তম-মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষিত পাত্র	—	সংস্কৃত
৩।	অধম, অশিক্ষিত পাত্র – ঐশ্বর্যমত্ত, দারিদ্র্য-বিকৃত ব্যক্তি – পরিব্রাজক ও বল্কলধারী সন্ন্যাসী	—	প্রাকৃত
৪।	যে কোন পাত্রী	—	প্রাকৃত
৫।	অনীচ শিক্ষিতা পাত্রী, অনীচ চেটী, বালক, নিকৃষ্ট দৈবজ্ঞ, উন্মত্ত ও আতুর	—	শৌরসেনী প্রাকৃত
৬।	রাজ-অন্তঃপুরচারী, বামন, ষণ্ড প্রভৃতি	—	মাগধী প্রাকৃত
৭।	রাজভৃত্য (চেট), রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠী (রাজবণিক)	—	অর্ধমাগধী
৮।	বিদূষক, রাজকন্যা, ধাত্রেয়ী প্রভৃতি	—	প্রাচ্যা ভাষা বা পূর্বদেশীয় প্রাকৃত
৯।	ধূর্তগণ	—	অবন্তিজা
১০।	যোদ্ধা, দ্যুতকর ও নাগরিক	—	দাক্ষিণাত্য বা বৈদর্ভী
১১।	ম্লেচ্ছ-শবর, শক-যবনাদি ও পত্রোপজীবী	—	শাবরী
১২।	উদীচ্য অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলবাসী ও খস প্রভৃতি	—	বাহ্লীক
১৩।	দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতি	—	দ্রাবিড়ী
১৪।	আভীর জাতি ও কাষ্ঠোপজীবী	—	আভীরী
১৫।	পুক্কস অর্থাৎ চণ্ডাল	—	চণ্ডালী
১৬।	অঙ্গারকার অর্থাৎ কর্মকার, চর্মকার প্রভৃতি	—	আভীরী বা শাবরী
১৭।	পিশাচ প্রভৃতি	—	পৈশাচী

এছাড়াও অন্যান্য নীচ পাত্রের ভাষা হবে স্ব স্ব দেশভাষা।

নাটকের ভাষা নির্ণয়ে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে কয়েকটি বিশিষ্ট বিধান দৃষ্ট হয়। যেমন – ১) গঙ্গা ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের দেশগুলির ভাষা হবে একার বহুল।[১৩৪] ২) বিন্ধ্য ও সাগরের মধ্যে যে সকল দেশ সেখানে ন-কার বহুল ভাষার প্রয়োগ কর্তব্য।[১৩৫] ৩) সুরাষ্ট্র, অবন্তী এবং বেত্রবতী (গঙ্গার শাখানদী, আধুনিক নাম বেতোয়া) নদীর অন্তবর্তী অঞ্চলের দেশগুলিতে চ-কার-বহুল ভাষা প্রযোজ্য।[১৩৬] কালিদাসের মেঘদূতে বেত্রবতী নদীর উল্লেখ আছে।[১৩৭] ৪) হিমালয়, সিন্ধু, সৌবীর প্রভৃতি দেশবাসীর ক্ষেত্রে উকারবহুল

ভাষা সর্বদা প্রযোজ্য।[১৩৮] ৫) চর্মণ্বতী (চম্বল) নদীতীরে ও অর্বুদ পর্বতের অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের ওকারবহুল ভাষা সর্বদা প্রযোজ্য।[১৩৯] মেঘদূতে রন্তিদেবের কীর্তিরূপে চর্মণ্বতী নদীর প্রসঙ্গ আছে।[১৪০]

নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর ব্যবহারের ভাষা সম্পর্কে এই যে বিধান তা সবই প্রায়িক অর্থাৎ আপাত নিয়ম। স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে নাট্যকার এই নিয়মের ব্যতিক্রমও করতে পারেন। দশরূপককার তাই বললেন – প্রয়োজনে উত্তম পাত্র-পাত্রীর ভাষা বিপর্যয় হতে পারে।[১৪১] রূপ গোস্বামীও প্রায় অনুরূপভাবে অভিমত দিলেন যে সকল ব্যক্তিরই কারণবশতঃ ভাষার ব্যতিক্রম করা যেতেপারে। মাহাত্ম্যের পরিভ্রংশ এবং মত্ততার আতিশয্যবশতঃ ভাষার ব্যতিক্রম হতে পারে। প্রচ্ছাদন, বিভ্রান্তি, যথালিখিত বাচন এবং কোন স্থানে অনুবাদও ভাষা ব্যতিক্রমের কারণ বলে উক্ত হয়।[১৪২] যেমন নিজের দেহ বা স্বভাব আচ্ছন্ন রেখে অপরের কথা বলতে গেলে, পরের লিখিত বিষয় যথাযথ পাঠ করতে গেলে এবং এক ভাষাকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করলে ভাষার ব্যতিক্রম ছাড়া চলে না।

সাধারণভাবে বলা হয় যে শিক্ষিত ও সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর ভাষা হবে সংস্কৃত আর মহিলা ও অধম শ্রেণীর পাত্রদের ভাষা হবে প্রাকৃত। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তপস্বিনী বা সন্ন্যাসিনী, মহারাণী, মন্ত্রীকন্যা এবং বারবণিতারা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করবেন।[১৪৩] সাগরনন্দী তাই বললেন যে কাজের অনুরোধে, সেবকের অভিনয়ে এমনকি রাজাও কোথাও কোথাও সৌরসেনী, প্রাচ্যা বা অবন্তীতে কথা বলবেন।[১৪৪]

ধূর্ত, চোর, নারীর সখী, বালক, বেশ্যা, অপ্সরা প্রভৃতি চরিত্রের মুখে সাধারণভাবে প্রাকৃত ভাষা শোভনীয় হলেও বিশেষ কারণে নাট্যকার এদের মুখে সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করবেন।[১৪৫] বিশ্বনাথও একই অভিমত পোষণ করেছেন।[১৪৬] ধূর্ত যদি পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত বলে তবে তার পণ্ডিতকে ঠকাতে সুবিধা হবে। আবার বেশ্যা যদি জ্ঞানী নাগর পায় তাহলে তার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে পারবে এবং নাগরের যোগ্য হয়ে উঠবে। সেকারণেই "মালতীমাধব" নাটকের নায়িকা মালতী এবং তার সখী লবঙ্গিকার ভাষা সংস্কৃত। 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণে বসন্তসেনার ভাষা সংস্কৃত; "উত্তররামচরিত" নাটকে তাপসী আত্রেয়ীর ভাষাও সংস্কৃত। "অনর্ঘরাঘবে" বালক রামচন্দ্রের মুখে ব্যবহৃত হয়েছে সংস্কৃত। নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী নায়িকা ও সখীদের উপযোগী ভাষা শৌরসেনী[১৪৭] এবং বিশ্বনাথের মতে উত্তমশ্রেণীর নারীদের ভাষা হবে শৌরসেনী প্রাকৃত।[১৪৮] কিন্তু রৌদ্রাদিরস প্রকাশের সৌকর্যের জন্য হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর "বঙ্গীয়প্রতাপ" নাটকের কল্যাণী চরিত্রের মুখে সংস্কৃত ভাষা বসিয়েছেন।

সুতরাং ভাষাবিধানের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নিয়ম-তালিকা প্রণয়ন করা অসম্ভব। নাটক যেহেতু 'লোকবৃত্ত্যনুকরণ' সেহেতু যে দেশ বা যে অঞ্চলের ভাষা তা সেই দেশে বা সেই অঞ্চলের লোকের সংলাপরূপে প্রযোজ্য। সেকারণেই নাট্যশাস্ত্রকার ভাষাবিধানের ব্যাপারে নাট্যকারকে স্বাধীনতা দিয়ে বলেছেন যে ভাষাবিধান বিষয়ে যা বলা হল তা পালনীয়, আর যা বলা হ'ল না তা লোকব্যবহার দেখে গ্রহণ করতে হবে।[১৪৯]

সংস্কৃত রূপকে উচ্চশ্রেণীর অভিজাত পাত্রের ভাষা সংস্কৃত এবং নারীদের ও অন্যান্য শ্রেণীর পাত্রের, এককথায় সাধারণ মানুষের ভাষা প্রাকৃত। রূপকে এধরণের ভাষা বিভেদকে অনেকে কৃত্রিম এবং অবাস্তব বলে মনে করেন। পরবর্তীকালের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকার মন্তব্যের সত্যতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। একেবারে গোড়ায় পাত্রের শ্রেণী অনুসারে সংলাপের ভাষা বিভেদ স্বাভাবিক এবং বাস্তব ছিল বলেই মনে হয়।

তবে এটা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে যেযুগে জনসাধারণের কাছ থেকে সংস্কৃত দূরে সরে গিয়েছিল। শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ সংস্কৃত বলত না বা বলতেও পারত না। কিন্তু মার্জিত সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। সেজন্যই রূপকে শিক্ষিত ব্যক্তির সংলাপই রচিত হ'ত সংস্কৃত ভাষায়। স্ত্রীশিক্ষারও নিশ্চয়ই প্রসার ছিল না। তাই স্ত্রী চরিত্রের সংলাপের ভাষা হত কথ্য অথচ মার্জিত প্রাকৃত। প্রাকৃতের রূপও সমস্ত দেশে এক প্রকার ছিল না এবং তা থাকা সম্ভবও নয়। এজন্যই বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন প্রকৃতির পাত্রের সংলাপে বিভিন্ন প্রাকৃত ব্যবহৃত হত। সেযুগে এসবের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত কোন ভাষাই দুর্বোধ্য বলে বিবেচিত হত না। বর্তমান কালেও বাংলা রূপকে বিভিন্ন শ্রেণীর পাত্রের সংলাপ বিভিন্ন ধরণের বাংলায় এবং বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়। বাংলা রূপকে উচ্চশ্রেণীর পাত্রেরা মার্জিত অর্থাৎ সংস্কৃত বাংলাতেই কথা বলেন এবং লোকব্যবহারে বর্তমানে মার্জিত বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রায় সেযুগের সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারের মতই সীমিত।

ঃঃ পাদটীকা ঃঃ

১। প্রকরণনাটকবিষয়ে কবিভিঃ পঞ্চাদ্যা দশাবরাশ্চ।
অঙ্কাঃ কর্তব্যাঃ স্যুর্নানারসভাবসংযুক্তাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র — ২০/৫৭

২। এতদেব যদা সর্বৈঃ পতাকাস্থানকৈর্যুতম্।
অঙ্কৈশ্চ দশভির্ধীরা মহানাটকমুচিরে।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/২২৩

৩। কার্যং গোপুচ্ছাগ্রং কর্তব্যং কাব্যবন্ধনমাসাদ্য। — নাট্যশাস্ত্র - ২০/৪৫ (ক)

৪। গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তস্য - কীর্ত্তিতম্।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১১ (খ)

৫। গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রমিতি — 'ক্রমেণাঙ্কাঃ সূক্ষ্মাঃ কর্ত্তব্যাঃ'
ইতি কেচিৎ। অন্যে ত্বাহুঃ - 'যথা গোপুচ্ছে কেচিদ্বালা হ্রস্বাঃ
কেচিদ্দীর্ঘাস্তথেহ কানিচিৎ কার্য্যাণি মুখসন্ধৌ সমাপ্তানি
কানিচিৎ প্রতিমুখে। এবমন্যেস্বপি কানিচিৎ কানিচিৎ ইতি। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/১১-বৃত্তি

৬। চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্য্যব্যাপৃতপুরুষাঃ। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/১১ (ক)

৭। অত্রবাশব্দো২নাস্থায়াম্। তেন ততো ন্যূনাধিকতা-
দৃশপাত্রনিবন্ধনে২পি ন দোষঃ। — হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ কৃত "কুসুমপ্রতিমা" টীকা — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১১

৮। মৃদুশব্দাভিধানং চ কবিঃ কুর্য়াত্তু নাটকম্।। — নাট্যশাস্ত্র — ২১/১১৬ (খ)

৯। প্রত্যক্ষনেতৃচরিতো রসভাবসমুজ্জ্বলঃ।
ভবেদগূঢ়শব্দার্থঃ ক্ষুদ্রচূর্ণকসংযুতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/১২

১০। বহুচূর্ণপদৈর্যুক্তং জনয়তি খেদং প্রয়োগস্য। — নাট্যশাস্ত্র - ২০/৩৪(খ)

১১। নানাবিধানসংযুক্তো নাতিপ্রচুরপদ্যবান্।
আবশ্যকানাং কার্য্যাণামবিরোধাদ্বিনির্মিতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/১৪

১২। বিচ্ছিন্নাবান্তরৈকার্থঃ কিঞ্চিৎ সংলগ্নবিন্দুকঃ। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৩ (ক)

১৩। একদিবসপ্রবৃত্ত কার্যস্ত্বংকো — — নাট্যশাস্ত্র — ২০/২৩

১৪। দিবাবসানকার্যং যদ্যংকে নোপপদ্যতে সর্বম্।
অঙ্কচ্ছেদং কৃত্বা প্রবেশকৈস্তদ্বিধাতব্যম্।। — নাট্যশাস্ত্র — ২০/২৭

১৫। অঙ্কচ্ছেদং কুর্যাৎ মাসকৃতং বর্ষসঞ্চিতং বাপি।

তৎসর্বং কর্তব্যং বর্ষাদূর্ধ্বং ন তু কদাচিৎ।।

যঃ কশ্চিৎ কার্যবশাদ্ গচ্ছতি পুরুষঃ প্রকৃষ্টমধ্বানম্।

তত্রাপ্যঙ্কচ্ছেদঃ কর্তব্যঃ পূর্ববৎ তজ্‌জ্ঞৈঃ।। — নাট্যশাস্ত্র — ২০/২৮-২৯

১৬। আসন্ননায়কঃ পাত্রৈর্যুতস্ত্রিচতুরৈস্তথা।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/১৫ (খ)

১৭। দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।

বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যু রতং তথা।।

দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্‌ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ।

শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যবরোধনম্।।

স্নানানুলেপনে চৈভির্বর্জিতো নাতিবিস্তরঃ। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/১৬ - ১৮ (ক)

১৮। —————— নাতিবিস্তরঃ।

দেবীপরিজনাদীনামমাত্যবণিজামপি।।

প্রত্যক্ষচিত্রচরিতৈর্যুক্তো ভাবরসোদ্ভবৈঃ।

অন্তনিষ্ক্রান্তনিখিলপাত্রোঽঙ্ক ইতি কীর্ত্তিতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৮-১৯

১৯। বৃত্তিবৃত্ত্যঙ্গসম্পন্নং পদার্থপ্রকৃতিক্ষমম্।

পঞ্চাবস্থাসমুৎপন্নং পঞ্চভিঃ সন্ধিভির্যুতম্।।

সন্ধ্যন্তরৈকবিংশত্যা চতুঃষষ্ট্যঙ্গসংযুতম্।

ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষণোপেতং গুণাঽলঙ্কারভূষিতম্।।

মহারসং মহাভোগমুদাত্তবচনান্বিতম্।

মহাপুরুষসঞ্চারং সাধ্বাচারজনপ্রিয়ম্।।

সুশ্লিষ্টসন্ধিযোগং চ সুপ্রয়োগং সুখাশ্রময়্।

মৃদুশব্দাভিধানং চ কবিঃ কুর্যাত্তু নাটকম্।। — নাট্যশাস্ত্র — ২১/১১৩-১১৬

২০। নামকার্য্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্।। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/১৪২

২১। নায়িকানায়কাখ্যানাং সংজ্ঞা প্রকরণাদিষু। — সাহিত্যদর্পণ — ৬/১৪৩ (ক)

২২। এতত্তু প্রায়িকম্ বসন্তসেনাচারুদত্তসম্বন্ধিদৃশ্যকাব্যস্য প্রকরণত্বেঽপি নাটকবন্মৃচ্ছকটিকেতি গর্ভিতার্থপ্রকাশকসংজ্ঞাদর্শনাত্।

— সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৪২ - হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ - কৃত "কুসুমপ্রতিমা" টীকা।

২৩। নাটিকাসট্টকাদীনাং নায়িকাভির্বিশেষণম্। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৪৩

২৪। দত্তাং সিদ্ধাং চ সেনাং চ বেশ্যানাং নাম দর্শয়েৎ। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৪১ (ক)

২৫। দত্তপ্রায়ানি বণিজাং চেটচেট্যোস্তথা পুনঃ।
বসন্তাদিষু বর্ণ্যস্য বস্তুনো নাম যদ্ভবেৎ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৪১

২৬। নানাকুসুমনামানঃ প্রেষ্যাঃ কার্যাস্তু নাটকে।
মঙ্গলার্থানি নামানি চেটানামপি কারয়েৎ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৯/৩৪

২৭। দত্তপ্রায়াণি নামানি বণিজাং তু প্রযোজয়েৎ।
শৌর্যৌদাত্তানি নামানি তথা শূরেষু যোজয়েৎ।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/৩২

২৮। ব্রহ্মক্ষত্রস্য নামানি গোত্রকর্মানুরূপতঃ।
কাব্যে কার্যাণি কবিভিঃ শর্মবর্মকৃতানি চ।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/৩১

২৯। উৎপাদিতকথাযোগে রূপকে পৃথিবীপতিঃ।।
আর্যকঃ পালকশ্চেতি নাম্নোচ্চার্যঃ সুদর্শনঃ।
অস্য ভার্যা শশিকলা চন্দ্রলেখেন্দুমত্যপি।।
সুকুমারোচিতাহ্বানা বিধাতব্যা প্রযোক্তৃভিঃ।
সখীজনস্তথৈবাস্যাঃ প্রিয়ংবদাদিনামভিঃ।। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ – অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

৩০। বিজয়ার্থানি নামানি রাজস্ত্রীণাং তু নিত্যশঃ। — নাট্যশাস্ত্র – ১৯/৩৩ (ক)

৩১। গম্ভীরার্থানি নামানি যোজয়েদুত্তমেষু চ।
যস্মান্নামানুসদৃশং কর্ম তেষাং ভবিষ্যতি।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৯/৩৫

৩২। জাতিচেষ্টানুরূপাণি শেষাণামপি যোজয়েৎ। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/৩৬ (ক)

৩৩। ফলজাতিগুণাচারৈঃ কপিচণ্ডালরাক্ষসাঃ।।
চৌরা দ্যূতকরাঃ শিল্পিনাবিকারোহকাদয়ঃ।
উগ্রনাম্না গ্রহীতব্যা মুণ্ডব্রতনিষেবিণঃ।।
অঘোরভৈরবাচার্যকপালশিখরাদয়ঃ।
ধার্মিকাঃ শ্রীগুরুস্কন্দদাসাদিকসমাহ্বয়াঃ।।
নন্দ্যুত্তরপদা বাচ্যাঃ ক্ষপণা ভিক্ষবস্তথা।
বসূত্তরপদা বিপ্রা আচার্যা নাট্যদেশকাঃ।। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ - অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ (ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

কর্তৃক অনূদিত - পৃ–২৪৪-২৪৫)

৩৪। রাজা স্বামীতি দেবেতি ভৃত্যৈর্ভট্টেতি চাধমৈঃ।।
রাজর্ষিভির্বয়স্যেতি তথা বিদূষকেণ চ।
রাজন্নিত্যৃষিভির্বাচ্যঃ সোঽপত্যপ্রত্যয়েন চ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৪৪ (খ)-১৪৫

৩৫। ছন্দতো নামভির্বাচ্যা ব্রাহ্মণৈস্তু নরাধিপাঃ।
তৎক্ষাম্যং তু মহীপালৈর্যস্মাৎ পূজ্যা দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৯/৬

৩৬। বয়স্য রাজন্নিতি বা ভবেদ্বাচ্যো মহীপতিঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/১৭ (খ)

৩৭। সর্বস্ত্রীভিঃ পতির্বাচ্যঃ আর্যপুত্রেতি যৌবনে।
অন্যদা পুনরার্যেতি বাচ্যো রাজ্ঞ্যাপি ভূপতিঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৯/১৯

৩৮। স্বেচ্ছয়া নামভির্বিপ্রৈর্বিপ্র আর্যেতি চেতরৈঃ।
বয়স্যেত্যথবা নাম্না বাচ্যো রাজ্ঞা বিদূষকঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৪৬

৩৯। বিপ্রামাত্যাগ্রজাশ্চার্যা নটীসূত্রভৃতৌ মিথঃ।। — দশরূপক – ২/৬৭ (খ)

৪০। বাচ্যৌ নটীসূত্রধারাবার্য্যনাম্না পরস্পরম্।
সূত্রধারং বদেদ্ভাব ইতি বৈ পারিপার্শ্বিকঃ।।
সূত্রধারো মারীষেতি হণ্ডে ইত্যধমৈঃ সমাঃ।
বয়স্যেত্যুত্তমৈর্হংহো মধ্যৈরার্য্যেতি চাগ্রজঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৪৭-১৪৮

৪১। মান্যো ভাবেতি বক্তব্যো কিঞ্চিদূনস্তু মারিষঃ।
সমানো হি বয়স্যেতি হংহো হণ্ডে ইতি বাঽধমঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৯/১০

৪২। আয়ুষ্মন্ রথিনং সূতো বৃদ্ধং তাতেতি চেতরঃ। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৫০ (ক)

৪৩। বৎস পুত্রক তাতেতি নাম্না গোত্রেণ বা পুনঃ।
বাচ্যঃ শিষ্যঃ সুতো বাঽথ পিত্রা বা গুরুণাঽথবা।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/১৪

৪৪। ব্রাহ্মণৈঃ সচিবো বাচ্যো হ্যমাত্য সচিবেতি বা।
শেষৈরন্যৈর্জনৈর্বাচ্যো হীনৈরার্যেতি নিত্যশঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৯/৭

৪৫। সাধো! ইতি তপস্বী চ প্রশান্তশ্চোচ্যতে বুধৈঃ।
স্বগৃহীতাভিধঃ পূজ্যঃ শিষ্যাদ্যৈর্বিনিগদ্যতে।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৫২

৪৬। উপাধ্যায়েতি চাচার্য্যো মহারাজেতি ভূপতিঃ।
স্বামীতি যুবরাজস্তু কুমারো ভর্ত্তৃদারকঃ।।
ভদ্রসৌম্যমুখেত্যেবমধমৈস্তু কুমারকঃ। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৫৩-১৫৪ (ক)

৪৭। স্বামীতি যুবরাজস্তু কুমারো ভর্ত্তৃদারকঃ।
সৌম্য ভদ্রমুখেত্যেবং হেপূর্বং চাধমং বদেৎ।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/১২

৪৮। সমৈঃ সম্ভাষণং কার্যং যেন নাম্না তু সংজ্ঞিতাঃ।
হীনৈঃ সপরিহারং তু নাম্না সংভাষ্য উত্তমঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/৮

৪৯। সংভাষ্যাঃ শাক্যনির্গ্রন্থা ভদন্তেতি প্রযোক্তৃভিঃ। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/১৫ (ক)

৫০। ভগবন্নিতি বক্তব্যাঃ সর্বৈর্দেবর্ষিলিঙ্গিনঃ। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৪৯ (ক)

৫১। ভগবন্তো বরৈর্বাচ্যা বিদ্বদ্ দেবর্ষিলিঙ্গিনঃ। — দশরূপক - ২/৬৭ (ক)

৫২। আমন্ত্রণৈশ্চ পাষণ্ডা বাচ্যাঃ স্বসময়াগতৈঃ।।
শকাদয়শ্চ সংভাষ্যা ভদ্রদত্তাদিনামভিঃ। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৫৬ (খ)-১৫৭(ক)

৫৩। যদ্যস্য কর্ম শিল্পং বা বিদ্যা বা জাতিরেব বা।
স তেন নাম্না সংভাষ্যো নাটকাদৌ প্রযোক্তৃভিঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/১৩

৫৪। গুরুভার্যা চ বক্তব্যা স্থানীয়া ভবতীতি চ।
গম্যা ভদ্রেতি বক্তব্যা বৃদ্ধাম্বেতি চ নাটকে।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/২২

৫৫। বদেদ্রাজ্ঞীং চ চেটীং চ ভবতীতি বিদূষকঃ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৪৯ (খ)

৫৬। তপস্বিন্যো দেবতাশ্চ বাচ্যা ভগবতীতি চ।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/২১ (খ)

৫৭। দেবানামপি যে দেবা মহাত্মানো মহর্ষয়ঃ।
ভগবন্নিতি তে বাচ্যা যাস্তেষাং যোষিতস্তথা।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/৩

৫৮। রাজপত্ন্যশ্চ সংভাষ্যা সর্বাঃ পরিজনেন তু।
ভট্টিনী স্বামিনী দেবী ইত্যেবং নাটকে বুধৈঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/২৩

৫৯। পতির্যথা তথা বাচ্যা জ্যেষ্ঠমধ্যাধমৈঃ স্ত্রিয়ঃ। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৫৫ (ক)

৬০। দেবীতি মহিষী বাচ্যা রাজ্ঞা পরিজনেন চ।
ভোগিন্যঃ পরিশিষ্টাস্তু স্বামিন্য ইতি বা পুনঃ।। — নাট্যশাস্ত্র ১৯/২৪

৬১। প্রিয়েতি ভার্যা শৃঙ্গারে বাচ্যা রাজ্ঞেতরেণ বা। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/২৯ (ক)

৬২। কুমার্যশ্চৈব বক্তব্যাঃ প্রেষ্যাভির্ভর্তৃদারিকাঃ।
স্বসেতি ভগিনী বাচ্যা জ্যেষ্ঠা বৎসেতি চানুজা।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/২৫

৬৩। বাচ্যা প্রকৃতিভী রাজ্ঞঃ কুমারী ভর্ত্তৃদারিকা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৫৪ (খ)

৬৪। ব্রাহ্মণ্যার্যেতি বক্তব্যা লিঙ্গস্থা ব্রতিনী চ যা।
পত্নী চার্যেতি সংভাষ্যা পিতুর্নাম্না সুতস্য বা।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৯/২৬

৬৫। পুরোধঃসার্থবাহানাং ভার্যাস্ত্বার্যেতি নিত্যশঃ।। —নাট্যশাস্ত্র - ১৯/২৯ (খ)

৬৬। সমানাভিস্তথা সখ্যো হলা ভাষ্যাঃ পরস্পরম্।
প্রেষ্যা হঞ্জেতি বক্তব্যা স্ত্রিয়া যা তূত্তমা ভবেৎ।।
অজ্জুকেতি ভবেদ্বেশ্যা বাচ্যা পরিজনেন তু।
যা তত্র বৃদ্ধা সা ত্বত্তা ভাষ্যা পরিজনেন তু।। —নাট্যশাস্ত্র - ১৯/২৭-২৮

৬৭। হলেতি সদৃশী প্রেষ্যা হঞ্জে বেশ্যাজ্জুকা তথা।।
কুট্টিন্যম্বেত্যনুগতৈঃ পূজ্যা চ জরতী জনৈঃ। —সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৫৫ (খ)
—১৫৬ (ক)

৬৮। তেনৈব নাম্না বাচ্যোঽসৌ জ্ঞেয়াশ্চান্যে যথোচিতম্।। —সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৫৭ (খ)

৬৯। সংলাপ যেখানে চরিত্রের শুধু মুখের কথা নয়, সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি হয়, সেখানে সংলাপ সার্থক। আর সংলাপ যেখানে শুধু কেবল ভাষার অহেতুক আড়ম্বরমাত্র, স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সংগতিহীন, সেখানে তা চরিত্রকে কলের পুতুল করে মাত্র, সজীব মানুষে পরিণত করতে পারে না। —নাটকের কথা - অজিত কুমার ঘোষ — পৃষ্ঠা-৩০

৭০। Dialogue then becomes an essential adjunct to action or even an integral part of it : the story moving beneath the talk, and being, stage by stage, elucidated by it. Yet the principal junction of dialogue in the drama as in the novel is, as I have said, in direct connection with characterisation.

-- An Introduction to the study of Literature - p-19।

৭১। অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৩৭ (খ)

৭২। স্বস্মিন্নাত্মমাত্রে গতং প্রত্যক্ষত্বেন স্থিতমিতি ব্যুৎপত্তেঃ। — হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত "কুসুমপ্রতিমা" টীকা-সা.দ.-৬/১৩৭

৭৩। স্বগতং স্বৈকবিজ্ঞেয়ম্। — নাটক চন্দ্রিকা — ৫৯০ (ক)

৭৪। অশ্রাব্যং স্বগতং মতম্।। — দশরূপক — ১/৬৪

৭৫। অতিহর্ষমদোন্মাদরাগদ্বেষভয়ার্দিতঃ।।
বিস্ময়ক্রোধদুঃখার্তিবশাদেকোঽপি ভাষতে।

হৃদয়স্থং বচো যত্তু তদাত্মগতমিষ্যতে।। — নাট্যশাস্ত্র — ২৬/৮৫ (খ) - ৮৬

৭৬। রাজা - (আত্মগতম্) কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি, কথং বা আত্মাপহারং করোমি। ভবতু এবং তাবদেনাং বক্ষ্যে। (প্রকাশম্) ভবতি, যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ, সো২হমবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় ধর্মারণ্যমিদমায়াতঃ। — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ — প্রথম অঙ্ক

৭৭। রাজা — (আত্মগতম্) লব্ধাবকাশো মে মনোরথঃ। কিন্তু সখ্যা পরিহাসোদাহৃতাং বরপ্রার্থনাং শ্রুত্বা ধৃতদ্বৈধীভাবকাতরং মে মনঃ। — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ — প্রথম অঙ্ক

৭৮। সর্ব্বশ্রাব্যং প্রকাশম্ — সাহিত্যদর্পণ — ৬/১৩৮ (ক)

৭৯। সর্বেষু প্রকাশতে প্রত্যক্ষীভবতীতি ব্যুত্পত্তেঃ। — হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত "কুসুমপ্রতিমা" টীকা - সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৩৮

৮০। প্রকাশঞ্চ দ্বিধা ভবেৎ।
সর্ব্বপ্রকাশং নিয়তপ্রকাশঞ্চেতি ভেদতঃ।। — নাটকচন্দ্রিকা - ৫৯০

৮১। সর্ব্বপ্রকাশং সর্ব্বেষাং স্থিতানাং শ্রবণোচিতম্।
দ্বিতীয়ন্তু স্থিতেম্বন্যেম্বেকত্র শ্রবণোচিতম্।। — নাটকচন্দ্রিকা — ৫৯১

৮২। দ্বিধা বিভজ্যতে তজ্জনান্তিকমপবারিতম্। — নাটকচন্দ্রিকা — ৫৯২ (ক)

৮৩। দ্বিধা২ন্যন্নাট্যধর্মাখ্যং জনান্তমপবারিতম্। — দশরূপক — ১/৬৫ (ক)

৮৪। — তদ্‌ভবেদপবারিতম্।
রহস্যং তু যদন্যস্য পরাবৃত্য প্রকাশ্যতে।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৩৮

৮৫। অপবারিতং পৃষ্ঠবর্ত্তিজনস্য শ্রবণে বাধিতমিতি ব্যুৎপত্তেঃ। — হরিদাস সিদ্ধান্তবাগশ কৃত "কুসুমপ্রতিমা" টীকা-সা.দ.-৬/১৩৮

৮৬। রহস্যং কথ্যতে২ন্যস্য পরাবৃত্যাপবারিতম্। — নাটকচন্দ্রিকা — ৫৯২

৮৭। রহস্যং কথ্যতে২ন্যস্য পরাবৃত্ত্যাপবারিতম্।। — দশরূপক — ১/৬৬ (খ)

৮৮। নিগূঢ়ভাবসংযুক্তমপবারিতকং স্মৃতম্।। — নাট্যশাস্ত্র - ২৬/৮৭ (খ)

৮৯। বাসবদত্তা — (অপবার্য) অজ্জউত্ত, লজ্জেমি অহং ইমিণা অত্তণো নিসংসত্তণেণ। — রত্নাবলী - চতুর্থ অঙ্ক

৯০। ত্রিপতাকাকরেণান্যানপবার্যান্তরা কথাম্।।
অন্যোন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাজ্‌জনান্তে তজ্জনান্তিকম্। — দশরূপক — ১/৬৫ (খ) - ৬৬ (ক)

৯১। কার্যবশাদশ্রবণং পার্শ্বগতৈর্যজ্জনান্তিকং তৎ স্যাৎ। — নাট্যশাস্ত্র — ২৬/৮৮ (ক)

৯২। হস্তমন্তরিতং কৃত্বা ত্রিপতাকং প্রযোক্তৃভিঃ।
জনান্তিকং প্রযোক্তব্যমপবারিতকং তথা।। — নাট্যশাস্ত্র - ২৬/৯২

৯৩। ত্রিপতাককরেণান্যানপবার্য্যান্তরা কথাং।।
যা মিথঃ ক্রিয়তে দ্বাভ্যাং তজ্জনান্তিকমুচ্যতে। — নাটকচন্দ্রিকা - ৫৯২

৯৪। ত্রিপতাককরেণান্যানপবার্য্যান্তরা কথাম্।
অন্যোন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাত্তজ্জনান্তে জনান্তিকম্।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৩৯

৯৫। সখ্যৌ ঃ-(উভয়োরাকারং বিদিত্বা, জনান্তিকম্) হলা সউন্দলে, জই এত্থ অজ্জ তাদো সংণিহিদো ভবে? (হলা শকুন্তলে যদি অত্র অদ্য তাতঃ সন্নিহিতঃ ভবেৎ?)
— অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-প্রথম অঙ্ক

৯৬। যঃ কশ্চিদর্থো যস্মাদ্ গোপনীয়স্তস্যান্তরত উর্দ্ধং সর্ব্বাঙ্গুলিনামিতানামিকং ত্রিপতাকলক্ষণং করং কৃত্বান্যেন সহ যন্মন্ত্র্যতে তজ্জনান্তিকম্। — সা.দ. ৬/১৪০ (বৃত্তি)

৯৭। কিং ব্রবীষ্যেবমিত্যাদি বিনা পাত্রং ব্রবীতি যৎ।
শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যেকস্তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্।। — দশরূপক - ১/৬৭

৯৮। দূরস্থাভাষণং যৎ স্যাদশরীরনিবেদনম্।।
পরোক্ষান্তরিতং বাক্যমাকাশবচনং তু তৎ। — নাট্যশাস্ত্র - ২৬/৮৩ (খ)-৮৪ (ক)

৯৯। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ, আকাশে) প্রিয়ংবদে, কস্যেদমুশীরানুলেপনং মৃণালবন্তি চ নলিনীপত্রাণি নীয়ন্তে? (শ্রুতিমভিনীয়) কিং ব্রবীষি? আতপলঙ্ঘনাদ্বলবদস্বস্থা শকুন্তলা, তস্যাঃ শরীর নির্বাপণায়েতি। — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ - তৃতীয় অঙ্ক

১০০। ন বিশেৎ পাত্রমপরং কার্যং স্যাত্তেন তদ্যথা।।
স্বল্পং কার্যমভিপ্রেতং বক্তুং পাত্রেণ কিং ফলম্।
আকাশবাঙ্নেপথ্যোক্তিলেখান্ তত্রাবকাশয়েৎ।। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ - অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ (ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত - পৃষ্ঠা - ২৪৭)

১০১। 'উত্তরচরিতের' দ্বিতীয়াঙ্কে ভবভূতি রাম ও শম্বুকের মুখে দণ্ডকারণ্যের যে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তার আবৃত্তির পরে সমস্ত গাম্ভীর্য, মাধুর্য, আশ্চর্য এবং ভীষণতা নিয়ে উক্ত বনভূমি শ্রোতার যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। — প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা — মনোমোহন ঘোষ, পৃষ্ঠা-৩৩

১০২। অতিভাষার্যভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ।

তথা যোন্যন্তরী চৈব ভাষা নাট্যে প্রকীর্ত্তিতা।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৮/২৬

১০৩। অতিভাষা তু দেবানামার্যভাষা তু ভূভুজাম্।
সংস্কারগুণসংযুক্তা সপ্তদ্বীপপ্রতিষ্ঠিতা।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৮/২৭

১০৪। অথ যোন্যন্তরীভাষা গ্রাম্যারণ্যপশূদ্ভবা।
নানা বিহংগজা চৈব নাট্যধর্ম্মী প্রয়োগতঃ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৮/২৯

১০৫। দ্বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা। — নাট্যশাস্ত্র - ১৮/২৮ (ক)

১০৬। জাতিভাষাশ্রয়ং পাঠ্যং দ্বিবিধং সমুদাহৃতম্।
প্রাকৃতং সংস্কৃতং চৈব চাতুর্বর্ণ্যসমাশ্রয়ম্।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৮/৩০

১০৭। ভাষা দ্বিধা সংস্কৃতা চ প্রাকৃতী চেতি ভেদতঃ। — নাটকচন্দ্রিকা – ৫৯৮

১০৮। পুরুষানামনীচানাং সংকৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৫৮

১০৯। পাঠ্যং তু সংস্কৃতং নৃণামনীচানাং কৃতাত্মনাম্।
লিঙ্গিনীনাং মহাদেব্যা মন্ত্রিজাবেশ্যয়োঃ ক্বচিৎ।। — দশরূপক – ২/৬৪

১১০। সংস্কৃতা দেবতাদীনাং মুনীনাং নায়কস্য চ।
লিঙ্গি-বিপ্র-বণিক-ক্ষত্র-মন্ত্রি-কঞ্চুকিনামপি।।
অরণ্যদেবী-গণিকা-মন্ত্রিজাধীতি-যোষিতাং।
যোগিন্যপ্সরসোঃ শিল্পকারিণ্যা অপি-কীর্ত্তিতা।। — নাটকচন্দ্রিকা – ৫৯৮

১১১। যোঢ়ান্তিমা প্রাকৃতী স্যাৎ শৌরসেনী চ মাগধী।
পৈশাচী চূলিকা শাবর্য্যপভ্রংশ ইতি ক্রমাৎ।। — নাটকচন্দ্রিকা – ৫৯৯

১১২। মাগধ্যবন্তিজা প্রাচ্যা শৌরসেন্যর্ধমাগধী।
বাহ্লীকা দাক্ষিণাত্যা চ সপ্তভাষাঃ প্রকীর্তিতাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ১৮/৪৭

১১৩। অথবা ছন্দতঃ কার্যা দেশভাষা প্রযোক্তৃভিঃ।
নানাদেশসমুত্থং হি কার্যং ভবতি নাটকে। — নাট্যশাস্ত্র - ১৮/৪৬

১১৪। যদ্দেশ্যং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশ্যং তস্য ভাষিতম্। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৬৮ (ক)

১১৫। অত্র তু প্রাকৃতং স্ত্রীণাং সর্ব্বাসাং নিয়তং ভবেৎ। — নাটকচন্দ্রিকা – ৫৯৯

১১৬। স্ত্রীণাং তু প্রাকৃতং প্রায়ঃ সৌরসেন্যধমেষু - চ। — দশরূপক - ২/৬৫ (ক)

১১৭। শৌরসেনী প্রযুক্তব্যা তাদৃশানাং চ যোষিতাম্।
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১৫৯

১১৮। তত্রাপি নায়িকাদীনাং শৌরসেনী প্রকীর্ত্তিতা।

আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রী স্মৃতা বুধৈঃ।। — নাটকচন্দ্রিকা – ৫৯৯

১১৯। ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তানাং দারিদ্র্যোপহতাত্মনাম্।
যে নীচাঃ কর্ম্মণা জাত্যা তেষাঞ্চ প্রাকৃতং স্মৃতম্। — নাটকচন্দ্রিকা – ৫৯৯

১২০। ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যেণ প্লুতস্য চ।
উত্তমস্যাপি পঠতঃ প্রাকৃতং সংপ্রযোজয়েৎ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৮/৩৩

১২১। অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্।
চেটানাং রাজপুত্রানাং শ্রেষ্ঠানাং চার্ধমাগধী।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৬০

১২২। প্রাচ্যাং বিদূষকাদীনাং ———— — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৬১ (ক)

১২৩। বিদূষকস্য আদিশব্দাত্ রাজসুতাধাত্রেয়ীপ্রভৃতীনাং প্রাচ্যা ভাষা।
— সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৬১
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত "কুসুমপ্রতিমা" টীকা

১২৪। অত্রোক্তা মাগধীভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্।
তথা বিদূষকাদীনাং চেটানামপি কীর্ত্তিতা।। — নাটকচন্দ্রিকা – ৫৯৯

১২৫। — ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিজা।
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যা হি দীব্যতাম্।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৬১

১২৬। শবরাণাং ম্লেচ্ছবিশেষাণাং শকযবনাদীনাঞ্চ শাবরীং ভাষাং কবিঃ সম্প্রযোজয়েত্।
— সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৬২ –
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত "কুসুমপ্রতিমা" টীকা

১২৭। শবরাণাং শকাদীনাং শাবরীং সংপ্রযোজয়েৎ।
বাহ্লীকভাষোদীচ্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রাবিড়াদিষু।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৬২

১২৮। অপভ্রংশস্তু চণ্ডালযবনাদিষু যুজ্যতে। — নাটকচন্দ্রিকা – ৫৯৯

১২৯। আভীরেষু তথাভীরী চণ্ডালী পুক্কসাদিষু।
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপাত্রোপজীবিষু।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৬৩

১৩০। তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৬৪ (ক)

১৩১। পিশাচাত্যন্তনীচাদৌ পৈশাচং মাগধং তথা।। — দশরূপক – ২/৬৫ (খ)

১৩২। রক্ষঃ পিশাচনীচেষু পৈশাচী দ্বিতয়ং ভবেৎ। — নাটকচন্দ্রিকা – ৫৯৯

১৩৩। চেটীনামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা।।
বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাম্।

উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৬৪ (খ)-১৬৫

১৩৪। গঙ্গাসাগরমধ্যে তু যে দেশাঃ সংপ্রকীর্তিতাঃ।
একারবহুলাং তেষু ভাষাং তজ্জ্ঞাঃ প্রযোজয়েৎ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৮/৫৬

১৩৫। বিন্ধ্যসাগরমধ্যে যে দেশাঃ শ্রুতিমাগতাঃ।
নকারবহুলাং তেষু ভাষাং তজ্জ্ঞাঃ প্রযোজয়েৎ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৮/৫৭

১৩৬। সুরাষ্ট্রাবন্তিদেশেষু বেত্রবত্যন্তরেষু চ।
যে দেশাস্তেষু কুর্বীত চকারবহুলামিহ।। — নাট্যশাস্ত্র –১৮/৫৮

১৩৭। তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যুক্তং
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি।। — মেঘদূত – পূর্বমেঘ/২৫

১৩৮। হিমবৎসিন্ধুসৌবীরান্ যেঽন্যে জনাঃ সমাশ্রিতাঃ।
উকারবহুলাং তেষু নিত্যং ভাষাং প্রযোজয়েৎ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৮/৫৯

১৩৯। চর্মণ্বতীনদীতীরে যে চার্বুদসমাশ্রয়াঃ।
ওকারবহুলাং নিত্যং তেষু ভাষাং প্রযোজয়েৎ।। — নাট্যশাস্ত্র – ১৮/৬০

১৪০। আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্।। — মেঘদূত – পূর্বমেঘ/৪৬

১৪১। কার্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্যো ভাষাব্যতিক্রমঃ।। — দশরূপক – ২/৬৬ (খ)

১৪২। সর্ব্বেষাং কারণবশাৎ কার্য্যো ভাষাব্যতিক্রমঃ।
মাহাত্ম্যস্য পরিভ্রংশান্মদস্যাতিশয়াত্তথা।।
প্রচ্ছাদনঞ্চ বিভ্রান্তির্যথা লিখিতবাচনং।
কদাচিদনুবাদশ্চ কারণানি প্রচক্ষতে।। — নাটকচন্দ্রিকা – ৫৯৯

১৪৩। লিঙ্গিনীনাং মহাদেব্যা মন্ত্রিজাবেশ্যয়োঃ ক্বচিৎ।। — দশরূপক – ২/৬৪ (খ)

১৪৪। নৃপোঽপি কার্যতঃ কোঽপি সেবকস্য বরায়িতঃ।
শৌরসেনীমথ প্রাচ্যামাবন্তীং কর্হিচিৎ পঠেৎ।। — নাটকলক্ষণরত্নকোশ – অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ (ড. সিদ্ধেশ্বর

চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত, পৃ–২৪২)

১৪৫। নায়িকানাং সখীবেশ্যাকিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রযোক্তব্যং সংস্কৃতঞ্চান্তরান্তরা। – নাটকচন্দ্রিকা – ৫৯৯

১৪৬। যোষিৎসখীবালবেশ্যাকিত বাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা।। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৬৯

১৪৭। নায়িকানাং সখীনাং চ শৌরসেন্যবিরোধিনী।। – নাট্যশাস্ত্র – ১৮/৫০ (খ)

১৪৮। শৌরসেনী প্রযুক্তব্যা তাদৃশানাং চ যোষিতাম্। – সাহিত্যদর্পণ – ৬/১৫৯ (ক)

১৪৯। এবং ভাষাবিধানন্তু কর্তব্যং নাটকাশ্রয়ম্।
অথ নোক্তং ময়া যচ্চ লোকাদ্গ্রাহ্যং বুধৈস্তু তৎ।। – নাট্যশাস্ত্র – ১৮/৬১

:: পঞ্চম অধ্যায় ::

সংস্কৃত নাটকে রসচিত্রণ

নাট্য হ'ল বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। নাট্যের মধ্যে মানব-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। মানবপ্রকৃতির মধ্যে আবেগ থাকে এবং এই আবেগ একজন মানুষকে লক্ষ্য বস্তু পাবার জন্য অধীর ক'রে তোলে। ঈপ্সিত বস্তু অর্জন করতে গিয়ে কেউ সফল হয়, আবার কেউবা হয় বিফল। মনস্তাত্ত্বিকগণ সত্ত্ব, রজ ও তম – মানবমনের এই তিনটি মৌলিক উপাদানের কথা বলেন এবং এই উপাদান তিনটি মিশ্র অবস্থায় একই সঙ্গে অবস্থান করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে একটি উপাদান যখন প্রাধান্য বিস্তার করে তখন অন্যেরা তাকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। ফলস্বরূপ এমন একটি মানসিক অবস্থা গড়ে ওঠে যা মানুষের কথায়, আচরণে এবং দেহবিভঙ্গে প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায় যে দৃশ্যকাব্যে রসই প্রধান। রস পরিবেশনে নাট্যকারের সাফল্য, রসানুভূতিতেই দর্শকের চরিতার্থতা। তাই আচার্য ভরত বললেন - রস ব্যতীত কোন অর্থই প্রবর্তিত হয় না।[১] ভরতের এই উক্তি থেকেই সংস্কৃত নাটকে রসের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃত নাটকে রসের প্রাধান্য থাকতেই হবে। যে কোন একটি রস হবে প্রধান এবং অন্য রস তার পরিপূরক হিসাবে থাকতে পারে। সেগুলি হবে অপ্রধান বা অঙ্গরস।[২] কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকে এইরূপ রসের প্রাধান্য থাকে না। সেখানে চরিত্র-চিত্রণ ও নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর সংলাপের (dialogue) মাধ্যমে নাটকের গতিবেগ সৃষ্টি করা হয়। সংস্কৃত নাটকে রসচিত্রণের মাধ্যমে দর্শকদের মনকে আকৃষ্ট করা হয়; তা সে শৃংগার রসই হোক বা করুণ রসই হোক। অন্য অঙ্গরসগুলি প্রধান রসকে পুষ্ট করে।

যেখানে সুখ-দুঃখ, সম্পদ্ ও বিপদ্, ব্যক্তিগত জীবনের আঘাত-অভিমান, উত্থান-পতন, উৎপীড়ন ও বেদনা এক বিচিত্র আনন্দোজ্জ্বল বিশুদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে, যে রূপ দর্শন ক'রে আমরা উদার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হই, ঔদ্ধত্য ভুলি, আভিজাত্য বিসর্জন দিই; অপূর্ব এক সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতায় সিক্ত ও বিগলিত হতে হতে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যাই, রজ ও তমোগুণের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না হ'লেও প্রশমন ঘটে, আমাদের ভাব ও ভাবনা সত্ত্বগুণে স্বচ্ছ, শান্ত ও নিষ্কলুষ হ'য়ে ওঠে; সাহিত্যের ভাষায় এই শুদ্ধ, নির্মল, নিঃস্বার্থ আনন্দই রস। সত্ত্বময় গুণের এ এক বিচিত্র আস্বাদ।

সংস্কৃত-সাহিত্যশাস্ত্রে রসকে তাই 'সত্ত্বোদ্রেকসম্ভূত', 'অখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময়', 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'

ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়। কবির অলৌকিক বচন-বিন্যাস, কান্তাসম্মিত মধুর ও মর্মস্পর্শী আবেদনে চৈতন্যের কঠিন আবরণটি ভেঙে যায়; রজ ও তমোগুণের অশুভ শক্তির পরাভব ঘটে এবং চিত্ত মোহমুক্ত হয়। এই মোহমুক্তির ফলে যে উদার অনুপ্রেরণা জাগে, যে সত্যদৃষ্টি উন্মুক্ত হয় তাই সত্ত্বগুণের প্রকাশ। কিন্তু এই প্রকাশের ফলে যে রসচর্বণা বা রসাস্বাদ হয় তা নিরালম্ব নয়। কাব্যার্থের সংভেদ বা অনুভূতির ফলেই এই রসাস্বাদ, এই আত্মানন্দ ঘটে।[৩] সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথও অনুরূপভাবে বললেন যে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হ'লে বাহ্যবস্তুবিষয়ের আর জ্ঞান হয় না। তখন চিত্ত নির্বিকার হয় এবং রসপদার্থের অনুভূতি হ'তে আর কোন বাধা থাকে না।[৪] আসলে জীবন ও জগৎকে অবলম্বন ক'রেই কাব্য সৃষ্টি হয়। কাব্যার্থকে বাদ দিয়ে রসসৃষ্টি হয় না। কবির প্রতিভাস্পর্শেই লৌকিক জগতের ঘটনাগুলি অলৌকিক হ'য়ে ওঠে। এই অলৌকিকত্বই রসের হেতু।

রস না হ'লে কাব্যার্থের স্ফুরণ হয় না; কাব্যার্থ অচল, দীপ্তি ও তৃপ্তিহীন হ'য়ে পড়ে। এই রস মানুষ ও মানুষের জগৎ নিরপেক্ষ নয়, হতে পারে না। আপন শরীরের মতই অভিন্নতাহেতু রস আস্বাদিত হয়।[৫] দেহ ও আত্মা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন হ'লেও ''আমি যাচ্ছি''– এক্ষেত্রে 'আমি' কে – দেহ না আত্মা – এই ভেদবুদ্ধি যেমন থাকে না সেরূপ নায়ক প্রভৃতির নায়কাদি বিষয়ক রতি প্রভৃতি থেকে নিজ নিজ রতি প্রভৃতি আশ্রয়াদি ভেদে ভিন্ন হলেও তাদের কথাবার্তা, চাতুর্য্য ইত্যাদি ব্যাপারবলে সহৃদয় সামাজিকগণ কর্তৃক অভিন্ন ব'লে প্রতীত হয়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে তরুণ ও তরুণী, প্রেমিক ও প্রেমিকা-এরা বস্তু, এরা বাস্তব। যখন এরা বাস্তব তখন এরা লৌকিক জগতের সাধারণ মানুষ। তখন এদের যে প্রেম, যে প্রেমালাপ তা শুনলে অথবা দেখলে চিত্ত চঞ্চল হয়, ঈর্ষ্যা জাগে, কারও বা লজ্জা হয়। এদের আনন্দে অন্যের বিক্ষোভ, অপরের অতৃপ্তি।

কিন্তু এই বাস্তব তরুণ-তরুণী যখন কবির ভাবদৃষ্টি, অপূর্ব কবি-কথার সংগীত-মাধুর্যে সাহিত্যের পাত্র-পাত্রী অথবা নায়ক-নায়িকা হ'য়ে দেখা দেয়, তখন এরা আর বস্তু নয়, এরা 'বিভাব'। এরা তখন বিশেষ নয়, নির্বিশেষ; অতএব রসহেতু।[৬] এদের লৌকিক মিলন-বিরহে অন্তরের যে কথা, যে ভাব, যে উচ্ছ্বাস, যে আসক্তি, যে অনাসক্তি ফুটতে পায় না; কবির অলৌকিক বচন-কৌশল ও কবি-হৃদয়ের অপরূপ সহমর্মিতা বাস্তবের সুখ-দুঃখকে অপরূপ মহিমায় আনন্দময় ক'রে তোলে। বাস্তবের প্রেমালাপ যেখানে ঈর্ষ্যা ও উত্তেজনা জাগায়, কাব্যের প্রেমালাপে সেখানে আসে চমৎকারিতা, আসে তন্ময়তা।

বাস্তব জগতে যে দেখা, যে শোনা তা ইন্দ্রিয়জ। সেখানে যে অনুভূতি, তা 'আমি'র অনুভূতি। তাই সে অনুভূতিতে সুখ বা দুঃখ থাকলেও তাতে তন্ময়তা নেই, রস নেই।

বর্ণনীয় বস্তুর রসাস্বাদে প্রথম 'সামাজিক' হ'লেন কবি বা নাট্যকার। কবির রসাস্বাদ না হ'লে নায়ক-নায়িকার সংবাদ সংলাপে রস সৃষ্টি অসম্ভব। শিল্পীর দৃষ্টি উর্দ্ধে থাকলেও মর্তের মাটিতে দাঁড়িয়েই সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়। প্রেক্ষক ও শিল্পী সমগোত্র না হ'লে শিল্পের মর্যাদা থাকে না।[৭] কবির স্বভাব অনুসারে কাব্য রচিত হয়।[৮] সমচরিত্র না হ'লে সহানুভূতি জাগে না; আর সহানুভূতি না হ'লে রসানুভূতি অসম্ভব। নাট্যরচনার সময় নাট্যকারকে একথা স্মরণ রাখতে হবে। আবার মানুষের স্বভাব, বলাবল, আনন্দ ও যুক্তি – এসবও বিবেচনা করতে হবে নাট্যরচয়িতাকে।[৯]

বাস্তবকে উপেক্ষা ক'রে রসসৃষ্টি হয় না। যে যা প্রত্যক্ষ করেনি, যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কোন সম্ভাবনা নেই তাতে রসোপলব্ধি অসম্ভব। তাই ভরতমুনির নির্দেশ-মনুষ্যজগতের ভাবগ্রহণের সামর্থ্য বিচার ক'রে নাটক রচনা করা উচিত। নাটকের শব্দ হবে সহজ ও শ্রুতিমধুর, ভাষা হবে সরল ও সুবোধ্য। কমণ্ডলুধারী ব্রাহ্মণের সাহচর্যে বারবণিতা যেমন শোভা পায় না, কঠিন ও কর্কশ শব্দে কাব্যেরও সেরূপ শোভা নষ্ট হয়।[১০]

নান্দনিকতাবোধের মূলকথা হ'ল অন্যের মানসিক অবস্থা অনুধাবনের ক্ষমতা বা সমবেদনক্ষমতা। ভরতের মতে নাট্যকারের বৈশিষ্ট্য হ'ল সৃজনক্ষমতা এবং দর্শকের বৈশিষ্ট্য হ'ল অনুধাবন ক্ষমতা। তাই তিনি বলেন যে (অপরের) তুষ্টিতে তুষ্ট হয়, শোকে শোকার্ত হয়, দৈন্যে দীনত্ব বোধ করে সেই নাট্যাভিনয়ের দর্শক।[১১] সৃজনক্ষমতা ও অনুধাবনক্ষমতা – এ দুইই নাট্যকার ও দর্শককে সাধারণের থেকে পৃথক ক'রে তোলে এবং তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়তা করে। সুতরাং সমস্ত নাট্যের মুখ্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (aspect) হ'ল অনুভূতি বা বোধের উপস্থাপনা ও অনুধাবন।

সংসারে যা কিছু ঘটতে দেখা যায়, তা বাস্তব হ'লেও বাস্তব সত্য নয়। বাস্তব সত্য থাকে কবির দৃষ্টিতে ও কবির প্রতিভায়। রস-দৃষ্টি, দরদী দৃষ্টি না থাকলে বস্তু জগতের গূঢ় ও গভীর সত্যটিকে ধরা যায় না। ব্যক্ত বাস্তবের পশ্চাতে যে অব্যক্ত অসীম জগৎ রয়েছে, যা পরম সত্য ও অতীব দুর্বোধ্য, তাকে জানতে হ'লে আনন্দ চাই। কবি অপূর্ব কৌশলে অপরূপ বাক্য দিয়ে সেই আনন্দলোক সৃষ্টি করেন। যা ব্যক্ত তার মাধ্যমে অব্যক্তকে চেনার কথা কৌশলই কাব্য। অতএব বস্তুকে প্রকাশ করতে হলে বস্তু

অপেক্ষা রসই প্রধান। বস্তু ব্যতীত রস নিরাশ্রয়, আর রস ব্যতিরেকে বস্তু নিস্প্রাণ।

সুতরাং সাহিত্যজগতে চিরদিনই 'বস্তু' ও 'বাস্তব' গৌণ, ইহা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য। লক্ষ্য পরমের অনুভূতি। এই পরম অনুভূতিই রস। বস্তুর আবেদন ইন্দ্রিয়ে কিন্তু বিভাবের আবেদন হৃদয়ে। একটিতে চঞ্চলতা, অন্যটিতে তন্ময়তা। নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যমঞ্চে থাকে নাটকীয় পাত্র-পাত্রী, নায়ক-নায়িকা। অথচ রস প্রতীতি হয় প্রেক্ষককে। এটা কিভাবে সম্ভব হয়? কেমন ক'রে নায়ক-নায়িকার অন্যোন্যরতি দর্শকের হৃদয়ে রত্যাস্বাদ আনে? এক জায়গায় যা আলাপ-বিলাপ, অন্য জায়গায় তা রস। এটি একটি অদ্ভুত ব্যাপার। এটাই কবি চাতুর্য।

নায়ক ভালোবাসে নায়িকাকে। নায়িকার প্রতি নায়কের এই যে প্রেম, এই যে রতি, এই প্রেম, এই রতি দর্শকের মধ্যেও আছে সূক্ষ্মাকারে বাসনারূপে। বিচিত্র পরিবেশে, বিচিত্র বচনবৈভবে কবির অপরূপ সৃষ্টি কৌশলে তা ভেসে ওঠে। প্রেক্ষকের চিত্তলোকে দোলা লাগে। সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিত রাজকন্যার যেন নিদ্রাভঙ্গ হয়। নায়কের রতি, হাস, শোক প্রভৃতির প্রেক্ষকের অবচেতন লোকের রতি, হাস, শোক প্রভৃতির বাসনাকে ব্যক্ত ক'রে তোলে। এই ব্যক্ত বাসনাই রস।

ধ্বন্যালোকের টীকাকার অভিনবগুপ্ত এপ্রসঙ্গে বলেন যে কবির পদলালিত্যে লৌকিক 'বস্তু' বিভাবে পরিণত হয়। লৌকিক জগতের বাঙ্ময় বপুই হ'ল বিভাব; এরই বাঙ্ময়ী মায়ায় দর্শক ও অভিনেতা একাত্ম হ'য়ে পড়ে। এই বিভাব হৃদয়-সংবেদ্য। হৃদয়ে-হৃদয়ে সংবাদ বা একরূপতা এর (বিভাবের) অবদান। এই অবদানে প্রেক্ষকের অবচেতন মনে পূর্ব থেকেই নিবিষ্ট অর্থাৎ অবস্থিত রতি প্রভৃতি বাসনার অবস্পন্দনে নিজ সংবিৎ অর্থাৎ নির্মল আত্মচেতনা ও আনন্দের যে চর্বণা বা আস্বাদন বা প্রকাশ তারই নাম রস।[১২]

রস্ ধাতুর মূল অর্থ আস্বাদন করা।[১৩] যা রসিত অর্থাৎ আস্বাদিত হয় তাই রস। আস্বাদন করা (to taste) থেকে অনুভব করা (to feel) এবং পরে ভালোবাসা (to love) অর্থেও রস্ ধাতুর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। রস্ ধাতুর মূল অর্থ যে স্বাদ তা থেকেই বিভিন্ন ও বিচিত্র অর্থের সৃষ্টি হয়েছে। অলংকার-শাস্ত্রেও এটি সর্বদাই আস্বাদনার্থক বা আস্বাদনাত্মক। নাট্যশাস্ত্রে ভরতমুনি নাট্যরস উপলক্ষে রস শব্দের ব্যাখ্যানকালে রসের স্বাদন ধর্মের কথাই উল্লেখ করেছেন।[১৪] পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রসের লক্ষণ প্রসঙ্গে বললেন – রত্যাদি বিশিষ্ট ভগ্নাবরণ চিৎ স্বরূপই রস।[১৫] চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা

বিশিষ্ট হওয়ায় সাধারণীকরণের ফলে আবরণ ভেঙে যায়। তখন চিৎ বা চৈতন্য স্বরূপই রসরূপে প্রকাশ পায়। উপনিষদের ঋষিগণ প্রায় সর্বত্রই ব্রহ্মকে বা আত্মাকে আনন্দ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে – রসই তিনি, কারণ রসকেই লাভ ক'রে এই পুরুষ (জীব) আনন্দীভূত হন।[১৬] এ প্রসঙ্গে দশরূপককার বলেন - রস হ'ল সেই দীর্ঘস্থায়ী বোধ বা অনুভূতি যা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারিভাবের যথাযথ রূপায়নের মাধ্যমে একজন নান্দনিক-বোধসম্পন্ন মানুষের মনকে আনন্দের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে।[১৭]

ভাব

যা হয় অর্থাৎ উৎপন্ন হয় – এই অর্থে 'ভূ' ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় ক'রে 'ভাব' শব্দের নিষ্পত্তি। অথবা যা হওয়ায় অর্থাৎ উৎপন্ন করে – এই অর্থে 'ভূ' ধাতুর উত্তর নিচ্ ও ঘঞ্ প্রত্যয় ক'রে ভাব শব্দটি নিষ্পন্ন হ'য়ে থাকে।[১৮] মহর্ষি ভরত এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন যে – বাক্য, অঙ্গভঙ্গী ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা কাব্যের বিষয় ভাবায় ব'লে ভাব নাম হয়েছে।[১৯]

ভাব প্রথমে সংস্কাররূপে অনাস্বাদ্য থাকে। কিন্তু বিভাবাদিজনিত সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এটি উদ্ভূত হ'য়ে যখন আস্বাদ্যমান হয় তখনই রস নিষ্পত্তি ঘটে। 'ভাব' শব্দটির মুখ্যার্থ চিত্তবৃত্তিবিশেষ হ'লেও এর আলংকারিকসম্মত অর্থ – যা বাগঙ্গসত্ত্বযুক্ত কাব্যার্থকে ভাবিত বা উৎপাদিত করে। লৌকিক দশায় প্রথমে সংস্কাররূপে অনাস্বাদ্য থাকার পর যা বাচিকাদি অভিনয় প্রক্রিয়ারূঢ় হ'য়ে আপনাকে আস্বাদ্য রসরূপে পরিণমিত করে তাই ভাব।

রসসৃষ্টির সহায়ক দৈহিক ও মানসিক বিকারই ভাব।[২০] যে অর্থ বিভাবসমূহ দ্বারা আহৃত হয়, অনুভাবসমূহ দ্বারা প্রতীত হয় তাকেই ভাব ব'লে সংজ্ঞা দেওয়া হ'য়ে থাকে।[২১]

এই ভাব মুখ্যত দুপ্রকার। – ১) আভ্যন্তর অর্থাৎ মানসিক এবং ২) বাহ্য অর্থাৎ দৈহিক। স্থায়িভাব মাত্রই আভ্যন্তর এবং অনুভাবমাত্রই বাহ্যভাব। ব্যভিচারিভাবের মধ্যে কতকগুলি আভ্যন্তর ও কতকগুলি বাহ্য। এইসব লৌকিক ভাবই সামাজিক চিত্তে অলৌকিক রসের কারণ হ'য়ে থাকে।

ভাবের সংখ্যা একোনপঞ্চাশৎ ব'লে মহর্ষি ভাবপ্রকরণে উপসংহার করেছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে – এই একোনপঞ্চাশৎ ভাবের মধ্যে আটটি স্থায়িভাব, তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব ও আটটি সাত্ত্বিক ভাব। এইগুলি চিত্তবৃত্তির বিশেষ রূপ ব'লে যথার্থতঃ ভাবপদবাচ্য। এই একোনপঞ্চাশৎ ভাবগুলিই যোগ্যতানুসারে স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাব ইত্যাদি আখ্যাপ্রাপ্ত হ'য়ে থাকে।[২২]

বিভাব

লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের উদ্বোধক তা কাব্যে ও নাটকে নিবেশিত হ'য়ে বিভাব নাম গ্রহণ করে।[২৩] বিভাবের দ্বারা বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় বিভাবিত হয়।[২৪] রত্যাদিভাবের রসত্বে বিভাবই হ'ল হেতু। রতি, হাস প্রভৃতি স্থায়িভাব মানুষ-মাত্রেরই থাকে। থাকে অন্তর্লোকে সূক্ষ্ম বাসনাকারে। নাড়া পেলেই এরা সাড়া দেয়; প্ররোচনা পেলেই এরা জেগে ওঠে। রসোদ্বোধের এই প্ররোচনা আসে 'বিভাব' থেকে।

এই বিভাব দ্বিবিধ। যথা –

১। আলম্বন

২। উদ্দীপন[২৫]

নায়ক-নায়িকা-প্রতিনায়ক প্রভৃতি যাদেরকে অবলম্বন বা আশ্রয় ক'রে সভ্যচিত্তে রস-সঞ্চার হয়, তাঁরাই হলেন আলম্বন বিভাব।[২৬] আর রসোদ্বোধে যা আলম্বন বিভাবের সহায়তা করে তা উদ্দীপন বিভাব।[২৭] আলম্বন বিভাবে যে রস অঙ্কুরিত হয়, উদ্দীপন বিভাবে তার পরিপুষ্টি ঘটে। আলম্বন নায়ক-নায়িকাদির কর-নয়নভঙ্গী প্রভৃতি চেষ্টা, তাদের রূপ ও অলংকার, বর্ষা-বসন্তাদি ঋতু, চন্দ্র-চন্দন-কোকিলের কুহুতান, ভ্রমরের ঝংকার প্রভৃতি বস্তু ও ব্যাপার রসের উদ্দীপক।[২৮] এরাই উদ্দীপন বিভাব। সুতরাং যে সকল অবস্থা বা বস্তু রসকে উদ্দীপিত করে অর্থাৎ রসসৃষ্টির আনুকূল্য করে, তারা উদ্দীপন বিভাব। নায়ক-নায়িকার রূপ-সৌন্দর্য, অথবা মাল্য, চন্দন, বিচিত্র বেশ ও ভূষা রতিভাবের উদ্দীপন বিভাব। এইরূপ পুষ্পিত কুঞ্জবন, কোকিল-কূজন অথবা জ্যোৎস্নারজনী, বসন্তকাল প্রভৃতিও উদ্দীপন বিভাব। এই উভয়বিধ বস্তুই শৃঙ্গার মনোবৃত্তি বা রতিকে উদ্দীপিত, উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করে। তাই আলম্বন ও উদ্দীপন – এই দুই প্রকার বিভাবই রসোৎপত্তির হেতু। শকুন্তলা নাটকে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা আলম্বন বিভাব এবং মালিনীতীর, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব।

সহৃদয় প্রেক্ষকচিত্তে রস-সৃষ্টির পূর্বে নায়ক-নায়িকা প্রভৃতিকে অবলম্বন ক'রে নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির মধ্যে রতি-হাস-ভয়-শোক প্রভৃতি ভাবোদয় ঘটে এবং এইসব ভাবও উদ্দীপিত হয় পরস্পরের বেশ-ভূষা-চেষ্টা, দেশ-কাল-প্রকৃতি প্রভৃতির প্রভাবে। এইসব লৌকিক নায়ক-নায়িকার রতি-শোক প্রভৃতি লৌকিক যে সুখ-দুঃখ, তা সুখ-দুঃখই, এরা রস নয়। লৌকিক জগতের এই লৌকিক সুখ-দুঃখই অলৌকিক কবি প্রতিভায় অলৌকিক হ'য়ে সামাজিক হৃদয়ে রস সৃষ্টি করে।

অনুভাব

আলম্বন ও উদ্দীপনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ স্থায়িভাব যার দ্বারা বাইরে প্রকাশিত হয় সেই কার্যরূপ ভাবই অনুভাব। যথা ভ্রূবিলাস, কটাক্ষ প্রভৃতি। অনুভাব দ্বারা স্থায়িভাব সহৃদয় দর্শকসমাজে অনুভাবিত হয়। বিভাব যেমন রত্যাদি স্থায়িভাবের উদ্বোধন ও উদ্দীপনের কারণ, অনুভাব তেমনই আলম্বন ও উদ্দীপন – এই দ্বিবিধ বিভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপিত রত্যাদি স্থায়িভাবের বহিঃপ্রকাশরূপ কার্য। বিভাব কারণ, অনুভাব কার্য। অবশ্য লৌকিক সুখ-দুঃখের অনুভূতি ব্যাপারেই এতদুভয়ের কার্যকারণ সম্বন্ধ। আলম্বন ও উদ্দীপনায় রত্যাদি উদ্বুদ্ধ হ'লে নায়ক-নায়িকাদির মধ্যে নয়ন-চাতুর্য, ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষপাত, অশ্রু, স্বেদ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি বহির্বিকার দৃষ্ট হয়। এইসব বহির্বিকার ব্যবহারিক জগতে স্থায়িভাবজন্য হ'লেও সামাজিক হৃদয়ে এরা স্থায়ি ভাবোদ্বোধের জনক। লৌকিকতঃ এরা 'কার্য' সত্য, কিন্তু অলৌকিক রসনিষ্পত্তির ব্যাপারে এরাও কারণ। এর কারণ হ'ল নায়ক-নায়িকাদির এইসব বাহ্য হাব-ভাব দেখে স্থায়িভাবেরই পরিপুষ্টি হ'য়ে থাকে। এইসব বাহ্য ব্যাপারের অলৌকিক সাধারণ নামই 'অনুভাব'।

মহর্ষি ভরত এর অনুভাব নামের কারণ হিসাবে মন্তব্য করলেন যে এর দ্বারা বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় অনুভাবিত হয়।[২৯] এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে যেহেতু বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারা বিষয় অনুভাবিত হয়, সেজন্য বাক্য, অঙ্গভঙ্গী ও উপাঙ্গ সংযুক্ত অনুভাব এই নামে অভিহিত।[৩০]

সাহিত্যদর্পণকারের এবিষয়ে অভিমত — লৌকিক জগতে যা নিজ নিজ কারণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং বহির্ভাবপ্রকাশক কার্য তাই কাব্য ও নাটকে অনুভাব।[৩১] তিনি আরও বললেন যে লৌকিক নিয়ম অনুসারে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব যথাক্রমে কারণ, কার্য ও সহকারী কারণ হ'লেও রসোদ্বোধে এরা প্রত্যেকে কারণরূপেই অঙ্গীকৃত হ'য়ে থাকে।[৩২] শকুন্তলা নাটকে নায়ক-নায়িকার দীর্ঘনিঃশ্বাস, কটাক্ষ প্রভৃতি অনুভাব।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে বিভাবাদির প্রত্যেকটিকে কারণ বলে স্বীকার করলে রসচর্বণায় ভিন্ন ভিন্ন কারণের ভিন্ন ভিন্ন কার্য-প্রতীতি না হ'য়ে অখণ্ড প্রতীতি হয় কিভাবে? এর উত্তরে বিশ্বনাথ বলেন - রসাস্বাদের পূর্বে প্রত্যেকটি কারণ পৃথক প্রতীয়মান হ'লেও রসাস্বাদ শুরু হ'লে 'প্রপাণক রসের' মতো একটি মাত্র অপূর্ব আস্বাদ ঘটে থাকে। ইক্ষুশর্করা অর্থাৎ গুড়, মরীচ, ছানা, কর্পূর প্রভৃতি দ্রব্যের সম্মেলনে 'প্রপাণকরস' প্রস্তুত হয়। কিন্তু এটি প্রস্তুত হ'য়ে গেলে এর উপাদানগুলির আর পৃথক স্বাদ থাকে না।

একটি অপূর্ব অখণ্ড স্বাদ অনুভূত হয়। 'রসাস্বাদে'র ক্ষেত্রেও এই ন্যায় অনুসৃত হ'য়ে থাকে।

'স্থায়িভাব' বা 'বিভাবের' মত অনুভাবের প্রকারবিষয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। 'সাত্ত্বিক' ভাবগুলিও বস্তুত 'অনুভাব'। এদের কিন্তু সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে এবং সংখ্যায় এরা আট। সাহিত্যদর্পণকার সেকারণেই মন্তব্য করলেন যে সাত্ত্বিক ভাবগুলি অনুভাবের অন্তর্গত ব'লেই রসনিষ্পত্তির সূত্রে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সঙ্গে সাত্ত্বিকভাব সম্বন্ধে পৃথকভাবে কিছু বলা হ'ল না।[৩৩]

এই সাত্ত্বিকভাব অনুভাবের অন্তর্গত হ'লেও এদের স্বাতন্ত্র্য আছে। এরা সমাহিতচিত্তের সত্ত্বগুণজাত বিকার। অতএব এরা শ্রেষ্ঠ অনুভাব। এই অনুভাবগুলি হৃদয়ের সাত্ত্বিকভাব ও অসাধারণ আবেগের প্রকৃষ্ট প্রকাশ।[৩৪]

সুতরাং বিভাব ও অনুভাবের মধ্যে পার্থক্য এইযে বিভাব দ্বারা ভাব বিভাবিত (অর্থাৎ বিশিষ্টরূপে বিজ্ঞাপিত) হয়, আর অনুভাব দ্বারা ভাব অনুভাবিত (অর্থাৎ পশ্চাৎ জ্ঞাপিত) হয়। এক কথায় বলা যায় যে বিভাব ভাবের প্রথম জ্ঞাপক, আর অনুভাব তারপরে ভাবকে জ্ঞাপিত করে। মাল্যাদি বিষয় থেকে রতি স্থায়িভাব প্রথম সূচিত হয়। সেকারণে ঐসকল বিষয় বিভাব পদবাচ্য। আর রতি স্থায়িভাবের উদ্রেক হলে কটাক্ষাদি দৃষ্ট হ'য়ে থাকে। এই কটাক্ষাদি দর্শনেও রতিস্থায়ীর অস্তিত্বের অনুমান করা হয়। এই অনুমানজ্ঞান রতিস্থায়ীর উৎপত্তির পশ্চাদ্ভাবী বিভাবের মত স্থায়ীর প্রাগ্ভাবী নয়। এজন্য এর নাম হ'য়েছে অনুভাব অর্থাৎ স্থায়িভাবের পশ্চাদ্ভাবী ভাবান্তর। সুতরাং ক্রম দাঁড়াচ্ছে এরকম – বিভাব – স্থায়িভাব – অনুভাব। তাই মোটামুটি বলা চলে – বিভাব স্থায়িভাবের কারণ, আর অনুভাব স্থায়িভাবের কার্য।

ব্যভিচারি ভাব

"ব্যভিচারী" শব্দের ব্যুৎপত্তি হ'ল — বি-অভি-চর্+ণিন্। মহর্ষি ভরত 'ব্যভিচারী' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে বি, অভি – এ দুটি উপসর্গ এবং চর্ ধাতু গমনার্থক। সুতরাং রসসমূহে যারা বিবিধপ্রকারে অভিমুখভাবে চরণ করে (অর্থাৎ গমন করে) তারাই ব্যভিচারী। বাচিক-আঙ্গিক-সাত্ত্বিক (অভিনয়) যুক্ত রসসমূহকে প্রয়োগে নিয়ে যায় ব'লেই এদের নাম ব্যভিচারী।[৩৫] যেমনভাবে সূর্য দিন বা নক্ষত্রকে নিয়ে যায়, ঠিক সেরূপ ব্যভিচারিভাবগুলি রসসমূহকে প্রয়োগে নিয়ে যায়। বস্তুতঃ সূর্য দুই হাতে কিংবা কাঁধে ক'রে দিন বা নক্ষত্রকে নিয়ে যায় না। তথাপি লোকপ্রসিদ্ধ যে সূর্য এই দিন বা নক্ষত্রকে নিয়ে যায়। দশরূপককারের মতে – ব্যভিচারি ভাবগুলি অস্থায়ী ভাব। স্থায়ী সমুদ্রের উত্থান-পতনশীল অস্থায়ী কল্লোলের মত এদের অবস্থা। বিশেষরূপে রসপুষ্টির প্রতি আনুকূল্য করে ব'লেই এদের ব্যভিচারিভাব বলা হয়।[৩৬]

ব্যভিচারিভাবের অপর এক নাম সঞ্চারী। ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে ব'লে ব্যভিচারিভাবকে সঞ্চারী ভাবও বলা হয়।[৩৭] ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবগুলি উদ্বোধক বস্তুর সান্নিধ্যে বাসনালোক থেকে চিত্তবৃত্তিরূপে উদ্বুদ্ধ হয়। এরা মানবচিত্তে সাধারণত স্বতন্ত্র বা প্রধান হ'য়ে থাকতে পারে না। সর্বদাই কোন-না-কোন স্থায়িভাবের অধীন হ'য়ে কাব্যে প্রকাশ পায় এবং রসের পোষকতা করে। সঞ্চারী শব্দ ভরত কোথাও প্রয়োগ করেন নি। তিনি কেবল ব্যভিচারী শব্দ উল্লেখ করেছেন।

ব্যভিচারী ভাবগুলি সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বলেন – বিভাব এবং অনুভাব থেকে বিশেষভাবে যা রসের পুষ্টি সাধন করে এবং স্থায়িভাবের মধ্যে যা জল – বুদ্‌বুদের মত এক একবার আবির্ভূত হয় এবং বিলীন হয় তাকে বলে ব্যভিচারিভাব।[৩৮] তিনি বৃত্তিতে বলেন – রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব স্থিরভাবে বর্তমান থাকলেও নির্বেদ প্রভৃতি ভাব একবার প্রাদুর্ভূত আবার তিরোভূত হ'য়ে তাদের আভিমুখ্যে চলে; তাই ব্যভিচারী বলে কথিত হয়।[৩৯]

বিষয়টি অনেকখানি স্পষ্ট করেছেন জগন্নাথ। তিনি বলেন সমগ্র প্রবন্ধে স্থির থাকে ব'লে ঐসব ভাবের স্থায়িত্ব। চিত্তবৃত্তিস্বরূপ এই সব ভাব আশু বিনাশ পায় ব'লে তাদের স্থিরত্ব দুর্লভ বলা উচিত নয়। বাসনারূপে যে স্থিরত্ব তা কিন্তু ব্যভিচারিভাবগুলিতেও বর্তমান, এটা বলা যায়। বাসনারূপ ঐ সকল ভাবের স্থিরপদার্থতা আছে ব'লেই মুহুর্মুহু অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে। ব্যভিচারিভাবগুলির বেলায় এরূপ

হয় না। তাদের অভিব্যক্তি বিদ্যুতের প্রকাশের মত ক্বচিৎ ঘটে থাকে।[৪০]

ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে শারদাতনয় ব্যভিচারিভাবগুলির কিছু বিশদ ব্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন – কল্লোলগুলি যে প্রকার সমুদ্রে একবার উত্থিত হয়, আবার বিলীন হয় এবং এইরূপে তারা উৎকর্ষ বিস্তার ক'রে তার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, ব্যভিচারী ভাবগুলিও সেই প্রকার স্থায়ীভাবে উন্মগ্ন নিমগ্ন হ'য়ে নিজ নিজ স্থায়ী ভাবকে পোষণ করে এবং রস-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।[৪১]

বাস্তবিকপক্ষে ব্যভিচারী ভাব পরিস্ফুট না হ'লে স্থায়ী ভাবের সম্যক উপলব্ধি হয় না। স্থায়িভাবের স্থিরত্ব, ব্যাপিত্ব, চমৎকারিত্ব ও আস্বাদনযোগ্যত্ব অনেক পরিমাণে নির্ভর করে ব্যভিচারিভাব সমূহের উপর। সেজন্যই স্তুতিবাদ-স্বরূপ কেউ কেউ ব্যভিচারী ভাবকে এবং রসকে এক ব'লে থাকেন।[৪২] চিন্তা, দৈন্য, উদ্বেগ, স্মৃতি, ব্রীড়া, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি ভাব, যা চিত্তে একবার উদিত হয় এবং আবার বিলীন হয়, কিন্তু সর্বদাই মূল ভাবের পোষকতা করে, তারা স্থায়িভাবের অভিমুখে বিচরণ বা সঞ্চরণ করে ব'লে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব।

ব্যভিচারিভাবের সংখ্যা ভরত গণনা ক'রেছেন তেত্রিশ।[৪৩] আচার্য বিশ্বনাথও ভরতকে অনুসরণ ক'রে বললেন যে ব্যভিচারিভাব তেত্রিশ প্রকার। যথা –

১। নির্বেদ (তত্ত্বজ্ঞান, আপদ, ঈর্ষা প্রভৃতি থেকে আগত স্বশক্তিতে অনাস্থাজনিত ঔদাসীন্য, আত্ম-তিরস্কার)
২। আবেগ (সম্ভ্রম-বিপদে শশব্যস্ততা, আনন্দে আত্মবিস্মৃতি, শোকে আকুলতা)
৩। দৈন্য (দারিদ্র্য, প্রভুর তর্জন-তিরস্কার প্রভৃতি জনিত মানসিক ক্লৈব্য অর্থাৎ মনোবলহানি)
৪। শ্রম (রত্যাদিজনিত অবসাদ)
৫। মদ (মদ্যপানজনিত হর্ষোৎকর্ষ)
৬। জড়তা (কর্তব্যমূঢ়তা)
৭। ঔগ্র্য (শত্রু শৌর্য, পরোপকার প্রভৃতি থেকে জাত ঔদ্ধত্য)
৮। মোহ (ভয়, দুঃখ, আবেগ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি থেকে জাত চিত্ত-বৈষম্য)
৯। বিবোধ (নিদ্রাপগমহেতু চৈতন্যাগম)
১০। স্বপ্ন (নিদ্রিত জনের বিষয়ানুভব)
১১। অপস্মার (দুষ্টগ্রহ-ভূত-প্রেতাদির আবেশ ও বায়ু-পিত্ত-কফের বৈষম্য প্রভৃতি থেকে জাত ভূপাত-কম্প-ঘর্ম-ফেন-লালাদির কারক চিত্ত-বিক্ষেপ)

১২। গর্ব (বিদ্যা, ঐশ্বর্য, আভিজাত্য প্রভৃতি থেকে জাত অহঙ্কার)

১৩। মরণ (শরপ্রহার প্রভৃতির ফলে ভূতলে পতন, রক্তপাত ইত্যাদির জন্য প্রাণহানি)

১৪। অলসতা (রাত্রি-জাগরণ পরিশ্রম প্রভৃতি জনিত কর্ম-বিমুখতা)

১৫। অমর্ষ (নিন্দাপমানকারীর নিগ্রহে আগ্রহ)

১৬। নিদ্রা (চিন্তালস্য, ক্লান্তি প্রভৃতি থেকে জাত নয়নমুদ্রণ, দীর্ঘশ্বাস, অঙ্গপ্রসারণ প্রভৃতির হেতু মনের নিশ্চলতা)

১৭। অবহিত্থা (ভয়, গৌরব বা লজ্জা প্রভৃতিতে হর্ষ রোমাঞ্চাদি বিক্রিয়া-গুপ্তি)

১৮। ঔৎসুক্য (অভিলষিত পদার্থের অপ্রাপ্তি হেতু কালক্ষেপাসহিষ্ণুতা)

১৯। উন্মাদ (কাম-শোক-ভয়াদিজনিত চিত্ত-বিভ্রম)

২০। শঙ্কা (পরহিংসা, আত্মদোষ প্রভৃতি-জন্য অনর্থাশঙ্কা)

২১। স্মৃতি (সদৃশবস্তুর দর্শনাদি থেকে জাত পূর্বানুভূত বিষয়জ্ঞান)

২২। মতি (নীতিশাস্ত্রানুসারে সতত অর্থনিশ্চয়)

২৩। ব্যাধি (সন্নিপাতাদি রোগ)

২৪। সন্ত্রাস (উল্কা-বিদ্যুৎ প্রভৃতি জন্য মনঃক্ষোভ)

২৫। লজ্জা (ব্রীড়া)

২৬। হর্ষ (আনন্দ)

২৭। অসূয়া (পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা)

২৮। বিষাদ (প্রারব্ধ কার্যে অসিদ্ধিহেতু সত্ত্বসংক্ষয় অর্থাৎ ভগ্নোৎসাহ)

২৯। ধৃতি (সন্তোষ)

৩০। চপলতা (মাৎসর্য, দ্বেষ, রাগ প্রভৃতি জন্য চিত্তের অস্থিরতা)

৩১। গ্লানি (রত্যাদি আয়াসজনিত নিষ্প্রাণতা)

৩২। চিন্তা (ঈপ্সিত বস্তুর অলাভে দুর্ভাবনা)

৩৩। বিতর্ক (সন্দেহজন্য বিচার)[৪৪]

তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাবের সবকটিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না। এগুলির মধ্যে থেকে চারটিকে আমরা আলোচনার জন্য বেছে নিচ্ছি।

নির্বেদ —

যথার্থ জ্ঞান, আপদ, ঈর্ষা প্রভৃতির ফলে যে আত্মাবমাননা তাকে নির্বেদ বলা হ'য়ে থাকে। এই নির্বেদ হ'লে দৈন্য, চিন্তা, অশ্রু, দীর্ঘনিঃশ্বাস, বিবর্ণতা, হতাশভাব এবং প্রব্রজ্যাদির উৎপত্তি হ'য়ে থাকে।[৪৫] যথার্থজ্ঞান প্রভৃতি পদার্থগুলি নির্বেদের হেতু এবং দৈন্য প্রভৃতি পদার্থগুলি নির্বেদের কার্য। প্রিয়জনবিরহ, দারিদ্র্য, রোগ অথবা দুঃখ থেকে বা অপরের উন্নতি দেখে নির্বেদ জন্মে। নির্বেদগ্রস্ত মানুষের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়, দীর্ঘশ্বাসে মুখ ও চোখ মলিন হয়। সে যোগীর ন্যায় ধ্যানপরায়ন অর্থাৎ চিন্তামগ্ন হয়।[৪৬]

যথার্থ জ্ঞান থেকে যে নির্বেদের উৎপত্তি হয় তার উদাহরণ প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন যে সাংসারিক বিষয় ভোগ করতে করতে যাঁর জীবন শেষ হ'য়ে আসছে সেরূপ কোন ব্যক্তি বলছেন হায়, আমি এ কি করলাম! অতি তুচ্ছ একটা মৃত্তিকানির্মিত কলসীর বালুকাপরিমিত ছিদ্র বন্ধ করতে গিয়ে এক মহামূল্য দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চূর্ণ ক'রে ফেললাম। অর্থাৎ অতি সাধারণ সাংসারিক অভাব দূর করতে গিয়ে মোক্ষসাধনের উপযুক্ত এই মহামূল্য দেহকে বিনষ্ট ক'রে ফেললাম।[৪৭]

গ্লানি —

সুরত, পরিশ্রম, মনস্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন যে দৈহিক দুর্বলতা তাই গ্লানি নামে কথিত। এই গ্লানি থেকে কম্প, কৃশতা, অনুৎসাহ প্রভৃতি জন্মায়।[৪৮] এ প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রকারের অভিমত -- বমন, বিরেচন ও রোগে এবং কৃচ্ছ্রসাধন ও জরাহেতু গ্লানি জন্মে। কৃশতা, মন্দগতি এবং গাত্র-কম্পদ্বারা এই গ্লানি অভিনেয়।[৪৯]

উত্তররামচরিতের তৃতীয় অঙ্কে সীতার প্রতি মুরলার উক্তিকে গ্লানির উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে মুরলা বলছে যে শারদ সূর্য যেমন কেতকীর কোমল গর্ভপত্রকে নিষ্প্রাণ ক'রে ফেলে সেরূপ বৃন্তচ্যুত কোমল কিশলয়ের মত হৃদয়রূপ পুষ্পের শোষণকারী এই নিদারুণ দীর্ঘকালব্যাপী শোক দুর্বল ও পাণ্ডুর সীতার শরীরকে ম্লান ক'রে ফেলেছে।[৫০] এই শ্লোকে মনস্তাপের ফলে সীতার দৈহিক দুর্বলতা প্রতিপাদিত হ'য়েছে ব'লে একে গ্লানির উদাহরণ বলা যায়।

শঙ্কা —

অপরের হিংসা, আত্মদোষ প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন যে অনর্থচিন্তা তা শঙ্কা নামে অভিহিত। শঙ্কিত

হ'লে মানুষের বিবর্ণতা, শরীরের কম্পন, স্বরবিকৃতি, পার্শ্বে অবলোকন, মুখের শুষ্কতা প্রভৃতি জন্মে থাকে।[৫১] নাট্যশাস্ত্রকারের মতে শংকা সন্দেহাত্মক। স্ত্রীলোক ও নীচাশয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে চৌর্যাদি দ্বারা অপরের দ্রব্যগ্রহণ, রাজার প্রতি অপরাধ, পাপকার্য প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়।[৫২] শংকাগ্রস্ত লোকের দেহ ঈষৎ কম্পমান হয়, সে উন্মুক্ত হ'য়ে আশেপাশে দৃষ্টিপাত করে, তার জিহ্বা হয় ভারী ও লম্বমান এবং মুখ কালো হয়।[৫৩]

অসূয়া —

অপরের গুণ ও সমৃদ্ধি দেখে ঔদ্ধত্যের কারণে যে অসহিষ্ণুতা তার নাম অসূয়া। এই অসূয়া থেকে অপরের দোষ কথন, বিদ্বেষ, ভ্রূকুটি, অবজ্ঞা, ক্রোধ প্রভৃতি উদ্ভূত হ'য়ে থাকে।[৫৪] আচার্য ভরতের মতে অপরের সৌভাগ্য, প্রভুত্ব, মেধা, ক্রীড়া ও উন্নতি দেখে অসূয়া উৎপন্ন হয়। যে অপরাধ করেছে তারও নির্দোষ ব্যক্তিকে দেখে অসূয়া হয়। ভ্রূকুটি-কুটিল ভীষণ মুখে ঈর্ষাযুক্ত ক্রোধহেতু মুখ-ঘোরানো প্রভৃতির দ্বারা, অন্যের গুণনাশ ও বিদ্বেষের দ্বারা অসূয়ার অভিনয় প্রযোজ্য।[৫৫]

রাজসূয়যজ্ঞসভাতে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অর্ঘ্যপ্রদানাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করলে চেদিপতি শিশুপাল তাতে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছিলেন। কারণ আত্মম্ভরী ব্যক্তির মন অন্যের সম্ভ্রমাদি দর্শনে স্বভাবতই বিদ্বেষী হ'য়ে ওঠে।[৫৬] 'শিশুপালবধে' শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের এই যে প্রতিক্রিয়া তাকে অসূয়ার উদাহরণ বলা যায়।

ধনঞ্জয়, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র, শিঙ্গভূপাল, দণ্ডী, মম্মট, বিশ্বনাথ এবং ভরতের অন্যান্য অনুগামিগণ ব্যভিচারিভাবের তেত্রিশ প্রকার ভেদের কথা স্বীকার করেছেন। কারণ এগুলি দীর্ঘস্থায়ী মুখ্য অনুভব বা আবেগের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল।

সাত্ত্বিকভাব

স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব ছাড়াও আর একটি ভাব আছে যার নাম 'সাত্ত্বিক' ভাব। সত্ত্বগুণজাত বিকারসমূহকে সাত্ত্বিকভাব বলা হয়।[৫৭] সত্ত্ব হ'চ্ছে নিজ আত্মার বিশ্রাম প্রকাশকারী কোন এক আন্তরধর্ম।[৫৮] মনের সমাহিত ভাব থেকে সত্ত্ব নিষ্পন্ন হয়। তাই এখানে সত্ত্ব শব্দের অর্থ মন থেকে জাত। এর স্বরূপ সমাহিত মন। মনের সমাধি অবস্থায় সত্ত্ব নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। এই সত্ত্বের যে বিভিন্ন স্বভাব-রোমাঞ্চ, অশ্রু, বিবর্ণভাব প্রভৃতি – সেগুলি বিভিন্ন ভাব ভেদে অভিব্যক্ত হয়। অন্যমনস্ক ব্যক্তির পক্ষে ঐসকল বিভিন্ন স্বভাব প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না।[৫৯]

সাত্ত্বিকভাব আটপ্রকার। যথা –

১। স্তম্ভ (দৈহিক জড়তা)

২। স্বেদ

৩। রোমাঞ্চ

৪। স্বরভঙ্গ

৫। বেপথু (কম্পন)

৬। বিবর্ণভাব

৭। অশ্রু

৮। প্রলয় (মূর্চ্ছা)[৬০]

এদের প্রত্যেকটি হৃদয়ের নির্মল ও প্রবল আবেগসম্ভূত দৈহিক ব্যাপার। কেবলমাত্র সত্ত্বগুণ থেকে উদ্ভূত হয় ব'লে এরা অনুভাব থেকেও পৃথক।[৬১] প্রকৃতিগত নয়, মাত্রাগত দিক থেকেই অন্য অনুভাবের সঙ্গে এদের পার্থক্য।

স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব ও সাত্ত্বিকভাব – এই ভাবপঞ্চকের আনুকূল্যেই রসনিষ্পত্তি হয়। রসনিষ্পত্তির ব্যাপারে এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন অপরিহার্য। এদের জন্য বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে কাব্যার্থ আস্বাদিত হয়।[৬২]

স্থায়িভাব

অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ কোন প্রকার সঞ্চারিভাবই যে ভাবের তিরোধান ঘটাতে পারে না, যা আস্বাদনরূপ অঙ্কুরের কন্দ বা মূলস্বরূপ, তাকেই বলা হয় স্থায়িভাব।[৬৩] স্থায়িভাব অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। তাই এর উৎপত্তি-বিনাশ আছে। কিন্তু স্বরূপতঃ বিনাশশীল হলেও এটি সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে চিরদিন অবস্থান করে। আর একারণেই প্রতীতিকালে এর অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়। তাই এর নাম স্থায়িভাব।

এই স্থায়িভাবসমূহ বাসনালোক থেকে প্রবুদ্ধ হ'য়ে দীর্ঘকাল চিত্তে অবস্থান করে, অনুবন্ধী বা অনুগত ব্যভিচারী ভাবসমূহ দ্বারা সম্বদ্ধ হয় এবং রসত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে।[৬৪] ভরতমুনি স্থায়িভাবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন – যে প্রকার পুরুষগণের লক্ষণ সমান হ'লেও, হাত-পা-উদর ও শরীর তুল্য হ'লেও এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান হ'লেও কুল, শীল, বিদ্যা, কর্ম ও শিল্পে বিচক্ষণতা হেতু কেউ কেউ রাজত্ব পান এবং অন্য সকলে অল্পবুদ্ধি ব'লে তাঁদেরই অনুচর হ'য়ে থাকে, সেইরূপ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব স্থায়ী ভাবসমূহকে আশ্রয় ক'রে থাকে।[৬৫]

স্থায়িভাবগুলি সমস্ত মানুষের সহজাত। এই ভাবগুলি মানুষের মনে স্থায়িভাবে অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করে ব'লেই এদেরকে স্থায়িভাব বলা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ কোন ভাবই মানুষের মধ্যে স্থায়ী নয়। তবে দৃশ্যকাব্যে কোন একটি ভাবকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করতে হয়। নচেৎ unity of action ও থাকে না। অতএব মুখ্যভাবই স্থায়িভাব। এটি permanent নয়, dominant emotion। অন্যভাবের চাপে যে ভাবটি মর্দিত হয় না, তাই স্থায়িভাব।[৬৬] নীরোগ সুস্থচিত্ত ব্যক্তি যেমন নানা ব্যঞ্জনমণ্ডিত অন্ন ভোজনকালে ষড়্‌বিধ রসের আস্বাদন ক'রে আনন্দিত হয়, সেরূপ সহৃদয় সামাজিক প্রেক্ষকমণ্ডলী বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক – নানা ভাবের অভিনয়ে উদ্বোধিত ও অভিব্যক্ত স্থায়িভাবসমূহ আস্বাদন ক'রে থাকে। এই স্থায়িভাব আটপ্রকার। যথা -

১। রতি

২। হাস

৩। শোক

৪। ক্রোধ

৫। উৎসাহ

৬। ভয়

৭। জুগুপ্সা

৮। বিস্ময়[৬৭]

চিত্তসুখকর বস্তুতে যে চিত্তের অনুরাগ তা রতি। বাগাদির বিকৃতির ফলে চিত্তের যে প্রসারণ তা হাস্য। অভীষ্টনাশাদির ফলে জাত চিত্তের যে বিহ্বল ভাব তা শোক। প্রতিকূল ব্যাপারে তীক্ষ্ণতার জাগরণ হ'ল ক্রোধ। কোন কর্ম শুরু করতে যে অচঞ্চল উদ্যম তা উৎসাহ। রৌদ্রশক্তিজাত চিত্তবিকলতা হ'ল ভয়। দোষদর্শনাদির জন্য যে বিস্ময়জাত নিন্দা তা জুগুপ্সা। বিবিধ অলৌকিক বস্তুতে যে চিত্তবিস্ফার তা বিস্ময়। আর নিশ্চেষ্ট নিরাসক্ত অবস্থায় পরমাত্মাতে চিত্তের বিশ্রাম থেকে উৎপন্ন যে আনন্দ তা শম ব'লে কথিত।[৬৮]

রস

নাট্যে বা কাব্যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব দ্বারা ব্যক্ত স্থায়িভাবই রস। রস শব্দের মুখ্য অর্থ আস্বাদ। রস আস্বাদিত হয় ব'লেই আলংকারিকগণ আস্বাদ্যকে বোধিত করতে 'রস' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ভরত বলেছেন যেমন বিবিধ ব্যঞ্জন, ওষধি ও দ্রব্যের সংযোগে লৌকিক রস নিষ্পন্ন হয়, ঠিক সেইভাবে নানা ভাবের সংযোগে স্থায়িভাব রসে পরিণত হয়। নাট্যাচার্য আরও বলেন যে যেমন বিবিধ ব্যঞ্জনে সংস্কৃত অন্ন ভোজনকারী জনগণ রসাস্বাদন ক'রে আনন্দলাভ করেন তেমনি বিভিন্ন ভাব এবং আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত রসপদবীপ্রাপ্ত স্থায়িভাবের আস্বাদ গ্রহণ ক'রে সহৃদয় দর্শক লোকোত্তর আনন্দ লাভ করেন।[৬৯]

স্থায়িভাবের পরিণতিই রস। এ সম্বন্ধে ভরত একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। পৃথিবীতে সব মানুষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত হ'লেও তাদের মধ্যে দু-একজন যেমন বিদ্যা, কুল ও শীলে প্রাধান্য অর্জন করার জন্য রাজত্ব লাভ করে, অন্য সকলে তাদের ছন্দ অনুবর্তন করে মাত্র। ঠিক সেইভাবে স্থায়িভাব বহু বিভাব থেকে উৎপন্ন হওয়ার জন্য প্রধান; আর বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব তার অনুচরতুল্য। রাজার সঙ্গে বহু অনুচর থাকলেও রাজাই 'নৃপতি' আখ্যা প্রাপ্ত হন। অন্য কোন পরিচারকের সেই আখ্যালাভে অধিকার থাকে না। ঠিক সেইভাবে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা যুক্ত হ'লেও স্থায়িভাবই 'রস' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অন্য কারও এই আখ্যালাভের অধিকার নেই।[৭০] মোদ্দা কথা হ'ল বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংস্পর্শে এসে স্থায়িভাব রসে পরিণত হয় এবং সেই রস সহৃদয় দর্শকই আস্বাদন ক'রে থাকে।

রসের সংখ্যা নিয়ে আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে মহর্ষি ভরতের মতে নাট্যে রস আটটি। যথা –

১। শৃঙ্গার

২। হাস্য

৩। করুণ

৪। রৌদ্র

৫। বীর

৬। ভয়ানক

৭। বীভৎস

৮। অদ্ভুত[৭১]

যাঁরা অষ্টরসবাদী তাঁদের মতে পূর্বোক্ত আটটি রসের 'স্থায়ী' ভাবও আটটি। যথা শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব রতি, হাস্যের হাস, করুণের শোক, রৌদ্রের ক্রোধ, বীরের উৎসাহ, ভয়ানকের ভয়, বীভৎসের জুগুপ্সা এবং অদ্ভুতের বিস্ময়। মহাকবি কালিদাসের সময়ও এরূপ একটি ধারণা কবিসমাজে প্রসিদ্ধ ছিল যে রস আটপ্রকার। অন্ততঃ কালিদাস স্বয়ং ভরতকে আটপ্রকার রসের প্রবর্তক ব'লে জানতেন। 'বিক্রমোর্বশী' -তে নাট্যকার এর উল্লেখও করেছেন।[৭২] কালিদাসের এই উল্লেখ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর সময় পর্যন্ত রস আটপ্রকার ব'লেই পরিগণিত হ'ত।

শান্তরস

আলংকারিকদের মধ্যে উদ্ভট সর্বপ্রথম শান্তরসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে নাট্যরস নয়টি। যথা –

১। শৃঙ্গার
২। হাস্য
৩। করুণ
৪। রৌদ্র
৫। বীর
৬। ভয়ানক
৭। বীভৎস
৮। অদ্ভুত
৯। শান্ত[৭৩]

যেখানে কোন দুঃখ নেই, সুখ নেই, চিন্তা নেই, দ্বেষরাগ নেই, কোন ইচ্ছা নেই, সর্বভাবেই সমজ্ঞান বিদ্যমান মুনিগণ তাকেই বলেন শান্তরস।[৭৪] শান্তের স্থায়িভাব শম বা নির্বেদ।

কিন্তু শান্তকে নাট্যরস ব'লে স্বীকার করতে অধিকাংশ আলংকারিকেরই আপত্তি। নাট্যশাস্ত্রের কোন কোন সংস্করণে 'শান্তরসের' উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সমালোচকের মতে সে উল্লেখ প্রক্ষিপ্ত। দশরূপকে স্থায়িভাব নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হ'য়েছে যে কেউ কেউ 'শম'কেও স্থায়িভাব ব'লে থাকেন, তবে নাট্যসাহিত্যে এই ভাবের পুষ্টি নেই।[৭৫]

দশরূপককার ধনঞ্জয় শান্তরসের স্বীকৃতির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করেছেন।

১। ভরত শান্তরসের বিভাবাদির বা বর্ণের বা অধিদেবতার উল্লেখ করেননি।

২। সর্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির উপশম সম্ভব নয় ব'লে শান্তরস বস্তুতঃ অসৎ। যে রাগ, দ্বেষের অভাবে 'শমাখ্য' স্থায়িভাবের উদ্বোধ হয়, সেই রাগ-দ্বেষ মন থেকে মুছে ফেলা অসম্ভব। সুতরাং শান্তরস থাকতেই পারে না।

৩। শান্তরস এবং বীর ও বীভৎস রসের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা নেই। তাই শান্তরস বীর-বীভৎসাদিরই

অন্তর্ভুক্ত।

৪। নাটক অভিনয়াত্মক, কিন্তু শান্তরসের অভিনয় হ'তে পারে না। নির্বিকার চিত্তই শান্তচিত্ত। এই চিত্তের অনুভাব বা বাহ্য বিক্রিয়া অসম্ভব। অতএব এটি অভিনেয় নয়। তবে শান্তরসের কাব্য-বিষয়ত্বে দশরূপককারের আপত্তি নেই।[৭৬]

শান্তরসটিকে প্রধান রসরূপে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন বৌদ্ধ ও জৈন কবিগণ। 'সৌন্দরানন্দ', 'শারীপুত্তপ্রকরণ', 'নাগানন্দ' প্রভৃতি কাব্য নাটকে এই রসেরই প্রাধান্য সূচনা করে। জৈনগ্রন্থ 'অনুযোগদ্বারসূত্রে' 'প্রশান্ত' রসকে নবম রস বলা হ'য়েছে। এরূপ আরও অনেক গ্রন্থেই এই রসের মর্যাদা দৃষ্ট হয়।

পরবর্তীকালে অভিনবগুপ্ত শান্ত রসকে স্বীকার করেছেন এবং একে শ্রেষ্ঠরস ব'লে ঘোষণা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। কালিদাস, উদ্ভট ও অভিনবগুপ্তের রচনা আলোচনা করলে বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে রস আটপ্রকার ব'লেই পরিগণিত হ'ত এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় সর্বপ্রথম শান্তরসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করে।

রসগঙ্গাধরকার জগন্নাথ শান্তরসের পৃথক অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের যুক্তির উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলিকে খন্ডন ক'রে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জগন্নাথ বলেন যে, নটের পক্ষে বিষয়জ্ঞানের সর্বাত্মক বিলুপ্তি ও চিত্তবৃত্তির প্রশমন সম্ভব নয় ব'লে নাট্যে শান্তরসের প্রদর্শন অসম্ভব ব'লে যাঁরা মনে করেন তাঁদের মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অভিনেতা রসের আস্বাদ গ্রহণ করেন না। রসাত্মক চিত্তবৃত্তি নায়কে বা অভিনেতায় উৎপন্ন হয় না, রসের একমাত্র আশ্রয় সহৃদয় সামাজিকের চিত্তভূমি। নটের মনে বিষয়-জ্ঞানের বিলুপ্তি উৎপন্ন হয় না ব'লে তার পক্ষে শান্তরসের বিভাব ও অনুভাব পরিবেশন করা সম্ভব হয় না – এযুক্তির অবতারণাও সঠিক নয়। কারণ ভয়ানক রসের স্থায়িভাব ভয় ও রৌদ্র-রসের স্থায়িভাব ক্রোধ ও নটের মনে উৎপন্ন হয় না। ভয় এবং ক্রোধ অভিনেতার মনে সঞ্চারিত না হ'লেও তিনি যখন অনায়াসে ভয়ানক ও রৌদ্ররসের কৃত্রিম বিভাবাদি পরিবেশন করতে পারেন, তখন শান্তরসের কৃত্রিম বিভাবাদিও তাঁর পক্ষে পরিবেশন করা অসম্ভব নয়। যাঁরা নাট্যে শান্তরসের স্বীকৃতি দান করতে কুণ্ঠিত হ'য়েছেন তাঁরাও মহাভারত প্রভৃতি প্রবন্ধের শান্তরস প্রাধান্যের কথা চিন্তা ক'রে কাব্যে একে মেনে নিয়েছেন। কাব্যপ্রকাশকার মম্মট নাট্যে অষ্টবিধ রসের উল্লেখ ক'রে তাঁর আলোচনা আরম্ভ করলেও উপসংহারে নির্বেদ-স্থায়িভাব শান্তরসকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।[৭৭]

কিন্তু এপ্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে নির্লিপ্ত অবস্থায় অনুভাব বা বাহ্যিক বিক্রিয়া সম্ভবপর হয় কিরূপে? চিত্ত যখন সর্বথা নির্বিকার, নির্বিকল্প; তখন সত্যই 'অনুভাব' বা 'ব্যভিচারিভাব' অসম্ভব। চিত্তে অহংভাব থাকলেই আলম্বনাদি আক্ষেপ হয়। সবরকম অহংকার থেকে চিত্ত মুক্ত না হ'লে 'শান্ত'রস জাগে না। এজন্যই 'দয়াবীর', 'ধর্মবীর', 'দানবীর' প্রভৃতি বীররসের সঙ্গে এর পার্থক্য।[৭৮] এজন্যই শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ' নাটক 'শান্ত'রসের উদাহরণ নয়, এটি দয়াবীরের দৃষ্টান্ত। 'শ্রব্য' কাব্যে নির্মম, নিরহংকার ব্যক্তির বর্ণনা সম্ভবপর এবং সে বর্ণনায় 'শান্ত'রসের আস্বাদও হ'তে পারে। কিন্তু 'দৃশ্য'কাব্যে তা সম্ভবপর নয়। কারণ 'অনুভাব' বা action-ই হ'ল 'দৃশ্য' কাব্যের সর্বস্ব।

শান্তরসের আস্বাদন পথে যে বিঘ্ন ও সমস্যা সৃষ্টি হয় তার সমাধান-কল্পে সাহিত্যদর্পণকার বলেন – 'যুক্ত' অর্থাৎ সংসার-বিরক্ত অথচ বিযুক্ত অর্থাৎ সংসারকর্মনিরত রাজর্ষি জনকাদি উত্তমোত্তম পাত্রের যে অবস্থা সেই অবস্থায় অবস্থিত 'শম' শান্তরসত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় অনুভাবাদি রস-পরিপন্থী নয়।[৭৯]

সম্পূর্ণ সমাধিস্থ ব্যক্তি 'শান্ত' রসের আলম্বন নয়, হ'তে পারে না, সংসারধর্ম ক'রেও যিনি যোগাভ্যাস করেন, যিনি বিষয়ের মধ্যে থেকেও বৈষয়িক সুখের অসারতা উপলব্ধি ক'রে 'ব্রহ্মানন্দের' সন্ধানে সক্রিয়, তিনি এই রসের 'আলম্বন'। বদরিকাদি পুণ্যাশ্রম, শ্রীক্ষেত্রাদি হরিক্ষেত্র, বারাণস্যাদি তীর্থ, নৈমিষারণ্যাদি রম্যবন, মহাপুরষের সংসর্গ প্রভৃতি এই রসের 'উদ্দীপন' বিভাব।[৮০] রোমাঞ্চ, প্রব্রজ্যাদি এর 'অনুভাব', স্মৃতি-মতি-হর্ষ-নির্বেদ প্রভৃতি এর 'ব্যভিচারিভাব'।

'শান্ত'রসে সব চরিত্রগুলিই অচল, অনড়, স্থানু, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার হবে এরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণাই যত অনর্থের মূল। এই ধারণার জন্যই দৃশ্যকাব্যে 'শান্ত'রসের অস্তিত্বে আপত্তি ওঠে। যুক্ত অথচ বিযুক্ত চরিত্রই হবে শান্তরসের অবলম্বন – একথা আগেই বলা হ'য়েছে। নিষ্ক্রিয় নিশ্চলতা শান্তরসের বিষয় নয়, অন্যরসের দৃশ্যকাব্যের মত এতেও গতি ও ক্রিয়া থাকে। তবে সে গতি ও ক্রিয়ার সামগ্রিক লক্ষ্য হ'ল দর্শকচিত্তে বৈরাগ্য সুখ জাগিয়ে তোলা। এই লক্ষ্যটি যেখানে চরিতার্থ হয়, সেখানেই শান্তরস এবং এই রস সম্ভব শুধু শ্রব্যকাব্যে নয়, দৃশ্যকাব্যেও।

শৃঙ্গারাদি আটটি যে প্রধান রস তা সকলেই স্বীকার করেন। 'শান্ত'রসের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। তবুও বহু বিশিষ্ট আলংকারিক একে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই নয়টি রস ব্যতীত আরও কয়েকটি রস আছে যেগুলিকে অধিকাংশ আলংকারিকই স্বীকৃতি দেননি। এইসব রসের মধ্যে প্রধান হ'ল চারটি। যথা –

১। প্রেয়স্ বা স্নেহ

২। বাৎসল্য

৩। প্রীতি

৪। ভক্তি

কোন কোন আলংকারিকের মতে এরা রস নয়, ভাব; আবার কারও মতে এরা গুণ বা অলংকার; আবার কেউ এদেরকে পৃথক রস মনে না ক'রে প্রধান রসগুলির কোন কোনটির অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই রসগুলির মূলে রয়েছে প্রেম বা রতি অর্থাৎ পারস্পরিক অনুরাগ বা আসক্তি। 'রতি' হল শৃঙ্গার রসের স্থায়িভাব। কিন্তু যাঁরা উক্ত চারটি রসকে রস ব'লে স্বীকার করেন, তাঁরা রতিকে দুভাগে ভাগ ক'রে থাকেন। যথা একটি যৌন বা শৃঙ্গাররতি, অন্যটি অযৌন রতি। অযৌন রতি বা non-sexual love ই এই রস চারটির স্থায়িভাব। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর অনুরাগে 'প্রেয়', বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠের অনুরাগে 'বাৎসল্য', নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি অনুগতের অনুরাগে 'প্রীতি' এবং পূজ্যের প্রতি যে অনুরাগ অথবা ভগবদ্বিষয়ক যে রতি তাই 'ভক্তি'। রতিমাত্রই 'শৃঙ্গার' রসের স্থায়িভাব। শৃঙ্গারের এরূপ ব্যাপক অর্থ ক'রে বাৎসল্যাদিকে কেউ কেউ শৃঙ্গার রসই বলে থাকেন। তাঁরা মনে করেন যে এইসব রস শৃঙ্গারের ভেদমাত্র। অভিনবগুপ্তও এগুলিকে পৃথক রস মনে করেন না। তাঁর মতে এদের স্থায়িভাব রতি, উৎসাহ, ভয় প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এরা বীর-শৃঙ্গারাদিরসের ভেদমাত্র।

রসনিষ্পত্তি

অনুকার্য (রামাদি) চরিত্র, অনুকারক নট-নটী এবং নাট্যপ্রেক্ষক – এই তিন নিয়েই দৃশ্যকাব্য। এই তিনের মধ্যে কোথায় কিভাবে রসাস্বাদ হয়, সে বিষয়ে বহু মত ও বহু বিতর্ক আছে। মহর্ষি ভরতের মতে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়।[৮১] এই বাক্যে 'সংযোগ' এবং 'নিষ্পত্তি' এই দুটি শব্দকে নিয়েই যত গোলমাল। এই দুই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার ফলেই ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে চারটি মতবাদের উদ্ভব হ'য়েছে।

সংযোগ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। কারও মতে এটি 'জন্য-জনক সম্বন্ধ', কারও মতে এই সম্বন্ধ 'গম্য-গমক',কেউ একে 'ভোজ্য-ভোজক' সম্বন্ধ এবং কেউ কেউ 'ব্যংগ-ব্যঞ্জক' সম্বন্ধ ব'লে ব্যাখ্যা করেন। সেইরূপ 'নিষ্পত্তি' শব্দের চারমতে চারপ্রকার অর্থ করা হয়। যথা – ১) উৎপত্তি ২) অনুমিতি ৩) ভুক্তি এবং ৪) অভিব্যক্তি। প্রথম ব্যাখ্যাটি মীমাংসকদের, দ্বিতীয়টি নৈয়ায়িকের, তৃতীয়টি সাংখ্যমত এবং চতুর্থটি বৈদান্তিক, বৈয়াকরণ ও আলংকারিকসম্মত।

এইভাবে রসনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ – এই চারপ্রকার মতবাদের উদ্ভব হ'য়েছে। এই চারপ্রকার মতবাদের প্রবক্তা হ'লেন যথাক্রমে ১) ভট্টলোল্লট (খৃঃ ৮ম শতাব্দী), ২) শ্রীশংকুক (খৃঃ ৯ম শতাব্দী), ৩) ভট্টনায়ক (খৃঃ ১০ম শতাব্দী) এবং ৪) অভিনবগুপ্ত (খৃঃ ১০ম-১১শ শতাব্দী)।

উৎপত্তিবাদ

এই মতে বিভাবকে আশ্রয় ক'রে রস উৎপন্ন হয়। সুতরাং বিভাব রসের উৎপাদক। রসের সঙ্গে বিভাবের সম্বন্ধ জন্য-জনক ব'লে মতবাদের নাম 'উৎপত্তিবাদ'। ভরতের রস-সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভট্ট লোল্লট মনে করেন যে বিভাবের দ্বারা উদ্বোধিত রত্যাদি স্থায়িভাব অনুভাবের দ্বারা অভিব্যক্ত ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা পুষ্ট ও ত্বরান্বিত হ'য়ে রসে পর্যবসিত হয়।

কিন্তু এই রস কোথায় উৎপন্ন হয়? এই রসের আস্বাদন করে কে? ভট্ট লোল্লটের মতে এই রস নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ। বিভাবাদির সাহায্যে নায়ক-নায়িকাতে এই রস উৎপন্ন হয়। কিন্তু অভিনয় যদি নিখুঁত হয়, অনুকারক নট-নটীগণ যদি অভিনয় দক্ষতায় ভাষা-বেশভূষা-হাবভাব প্রভৃতিতে অনুকার্য চরিত্রগুলির তুল্যরূপ হ'য়ে উঠতে পারে, তবে তাদের সেই অভিনয় দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে রঙ্গপ্রেক্ষক অতিশয় মুগ্ধ ও তন্ময় হ'য়ে পড়ে। এই তন্ময় অবস্থায় অনুকারককে অনুকার্য থেকে অভিন্ন ব'লে মনে হয় এবং রঙ্গপ্রেক্ষকের এরূপ জ্ঞান হয় যে নট-নটীই রস আস্বাদন করছে। তন্ময় অবস্থায় প্রেক্ষকের এই যে জ্ঞান তা প্রত্যক্ষজ্ঞান। প্রেক্ষক তার অজ্ঞাতসারে নট-নটীতে আরোপিত নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রস প্রত্যক্ষ করে এবং এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফলেই তার মধ্যে এক অলৌকিক অনির্বচনীয় চমৎকারিতার উদ্ভব হয়।

অবশ্য এই প্রত্যক্ষ লৌকিক নয়, অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়বেদ্যপদার্থ নিত্য ইন্দ্রিয়ের সমীপে থাকে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সরাসরি সংযোগ হয়। অলৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সরাসরি সংযোগ হয় না। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে থাকে জ্ঞান। জ্ঞানই এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ। জ্ঞানের একটি কোটি ইন্দ্রিয়, আর একটি কোটি হয় বিষয়। যদি কেউ একটি চন্দন কাঠ দেখে তাকে আঘ্রান না ক'রে 'চন্দন-সুরভি' এরূপ মন্তব্য করে তবে সেখানে চন্দনের যে প্রতীতি তা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়। কারণ চন্দন চক্ষুর গোচরীভূত। কিন্তু চন্দন যতক্ষণ আঘ্রাত না হয়, ততক্ষণ তার সৌরভ ইন্দ্রিয়বেদ্য নয়। অতএব তা লৌকিক প্রত্যক্ষেরও বিষয় নয়। অলৌকিক সন্নিকর্ষ, জ্ঞান সন্নিকর্ষ ব্যতীত অনাঘ্রাত চন্দনের সৌরভ প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু এই সন্নিকর্ষ তখনই সম্ভব যখন বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা থাকে। যে ব্যক্তি চন্দনের সৌরভ পূর্বে অনুভব করেছে, সে চন্দনের আঘ্রান না নিয়েও 'চন্দন সুরভি' এরূপ মন্তব্য করতে পারে। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষকে নৈয়ায়িকগণ 'জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি' ব'লে থাকেন। এই সন্নিকর্ষ জনিত যে প্রত্যক্ষ তা ইন্দ্রিয়কৃত নয়, জ্ঞানকৃত। নট-নটীতে আরোপিত নায়ক-নায়িকার যে রত্যাদিভাব তাও এই পূর্বলব্ধ জ্ঞানসন্নিকর্ষেই প্রত্যক্ষ হয়।

পূর্বানুভব ছাড়া কোন রস বা ভাব প্রত্যক্ষ হয় না। রত্যাদিভাবের বাহ্য লক্ষণগুলির সম্বন্ধে যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে, যে ব্যক্তি এইসব লক্ষণ অন্যের ও নিজের মধ্যে বহুবার লক্ষ্য ক'রে রত্যাদিভাব অনুভব করেছে, সেই শুধু অভিনয়কালে নট-নটীর মধ্যে অনুরূপ লক্ষণগুলি দেখলে নট-নটীতে নায়কাদিনিষ্ঠ ভাব বা রসকে অনায়াসে অনুভব করতে পারে। পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের জন্যই এই অনায়াস অনুভূতি হয়। তাই চন্দনের সৌরভের মতই এই রত্যাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষপ্রমাণবেদ্য।

কিন্তু যে রস নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ, সেই রস নট-নটী আস্বাদন করছে এরূপ যে অনুভূতি তা তো অলীক অনুভূতি। যে অনুভূতি মিথ্যা তা কিরূপে অনীর্বচনীয় আনন্দের হেতু হ'তে পারে? ভট্ট লোল্লট এই সংশয়েরও উত্তর দিয়েছেন। ভট্ট লোল্লটের মতে মিথ্যা অনুভূতি থেকেও কখনও কখনও সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়। এর সমর্থনে তিনি 'রজ্জুতে সর্পভ্রমের' দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান তা মিথ্যা, কিন্তু এই মিথ্যাজ্ঞান সত্ত্বেও প্রকৃত সর্পদর্শনে যে ভয় কম্পনাদির উদ্ভব হয় সর্পায়মান রজ্জুদর্শনেও ঠিক তাই হ'য়ে থাকে। অতএব নট-নটীতে নায়ক-নায়িকাভ্রম হ'তেও প্রেক্ষকের আনন্দানুভূতি অসম্ভব নয়। সংক্ষেপে উৎপত্তিবাদের সারসিদ্ধান্ত হ'ল –

১। রস মুখ্যত নায়ক-নায়িকাতেই উৎপন্ন হয়।

২। অভিনয়কালে এই রস নট-নটীতে আরোপিত হয় এবং আরোপিত এই রসের প্রত্যক্ষ প্রতীতিই সহৃদয় সামাজিককে অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি দেয়। আনন্দময় এই অনুভূতিই রস।

৩। অনুকার্য ও অনুকারকের মধ্যে যে অভিন্নতাবোধ তা ভ্রান্তিপ্রসূত। 'রজ্জুতে সর্পভ্রমের' মত এটাও একটা ভ্রম।

কিন্তু উপরিউক্ত সিদ্ধান্তগুলি সঠিক যুক্তিসম্মত নয়। কারণ –

প্রথমত – যে রস নায়ক-নায়িকায় উৎপন্ন ও নট-নটীতে আরোপিত, পরাশ্রিত সেই রস কেমন ক'রে দর্শককে আনন্দ দিতে পারে? স্বগত-প্রতীতির দ্বারাই চিত্তের তন্ময়তা ও চমৎকারিতা সম্ভব, পরগত--প্রতীতি দ্বারা নয়।

দ্বিতীয়ত – রঙ্গপ্রেক্ষক তন্ময় না হ'লে নট-নটীকে প্রকৃত পাত্র-পাত্রী ব'লে ভ্রম করতে পারে না। কিন্তু প্রেক্ষকের এই বাহ্যজ্ঞান বিরহিত তন্ময়তা দু-একটি বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সম্ভবপর হ'লেও এটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যতক্ষণ অভিনয় চলে ততক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে এই তন্ময়তা কোথাও দেখা যায় না। অথচ দেখা যায় যে তন্ময়তা নিরবচ্ছিন্ন না হ'লেও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

তৃতীয়ত – নাট্যচরিত্রের সঙ্গে নট-নটীর অভেদবোধ যদি একটি ভ্রান্ত প্রতীতি হয়, তবে সে মিথ্যাপ্রতীতি সকলক্ষেত্রেই আনন্দের হেতু হয় না। রজ্জুতে সর্পভ্রম আনন্দের নয়, ভয়েরই হেতু। প্রণয় নাটকের অভিনয়ে নট-নটীকেই প্রকৃত পাত্র-পাত্রীরূপে ধারণা করলে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়লীলা ব্যবহারিক জগতে যেমন ভিন্ন-ভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মনে কোথাও লজ্জা, কোথাও ক্ষোভ, কোথাও ঘৃণা কোথাও বা আবার আনন্দ সঞ্চার করে; অভিনয়কালে সে লীলার অনুকরণের মধ্যে দিয়েও ঠিক তাই হ'ত, সর্বত্র আনন্দের উদ্রেক হ'ত না। এইসব দোষের জন্যই এই মতবাদটি যুক্তিগ্রাহ্য না হ'য়ে সুধিসমাজে পরিত্যক্ত হ'য়েছে।

অনুমিতিবাদ

ভট্টলোল্লটের পরবর্তীযুগে নূতন রসবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন শঙ্কুক। শঙ্কুকের মতে রস প্রধানতঃ নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ। অভিনয় দর্শনকালে রঙ্গপ্রেক্ষক অনুকারক নটকে নায়ক-নায়িকা থেকে অভিন্ন ব'লে মনে করেন। দার্শনিকগণ সম্যক, মিথ্যা, সংশয় ও সাদৃশ্য-প্রতীতি ভেদে চারপ্রকার জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। শঙ্কুক বলেছেন – নট-নটীতে পাত্র-পাত্রীর এই অভিনবত্ববোধ চারপ্রকার প্রসিদ্ধ প্রতীতি থেকে স্বতন্ত্র। এই জ্ঞানকে শঙ্কুক 'চিত্রতুরগন্যায়ানুসারিণী' প্রতীতি ব'লে বর্ণনা করেছেন।

চিত্রার্পিত অশ্বে প্রকৃত অশ্বের জ্ঞান সম্যক্ প্রতীতি নয়। কারণ অশ্বের প্রতিকৃতিকে কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি – 'এই প্রতিকৃতিস্থ্ অশ্ব' ব'লে গ্রহণ করতে পারেন না। আলোচ্যমান ক্ষেত্রে চিত্রার্পিত অশ্বে প্রকৃত অশ্বের জ্ঞানকে মিথ্যা-প্রতীতি বলা চলে না। কারণ চিত্র পরিপূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত হ'লেও প্রতিকৃতিস্থ্ অশ্বকে কেউই প্রকৃত অশ্ব ব'লে গ্রহণ করতে পারেন না। উক্ত বুদ্ধি সংশয়-প্রতীতিও নয়। কারণ 'এইটি অশ্বের চিত্রমাত্র, না প্রকৃত অশ্ব' – এইরূপ পক্ষদ্বয়ে সমান প্রাবল্যযুক্ত সন্দেহ কোন ব্যক্তির চিত্তেই জাগ্রত হয় না। তাই সংশয়ের বাধক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকার জন্য চিত্রিত তুরগে তুরগ বুদ্ধিকে সংশয়-প্রতীতি বলা চলে না। আবার উক্ত জ্ঞান সাদৃশ্য-প্রতীতিও নয়। কারণ সাদৃশ্যের জীবনাধায়ক পদার্থদ্বয়ের স্বরূপগত ভেদের অস্তিত্ব এতে নেই। অশ্বের আলেখ্য প্রকৃত অশ্ব থেকে ভিন্ন নয়, তা তার অনুকৃতিমাত্র। এইভাবে শঙ্কুক প্রতিপন্ন করেছেন যে, চিত্রিত তুরগদর্শনে দর্শকের মনে উদীয়মান তুরগবুদ্ধি উক্ত চারপ্রকার প্রসিদ্ধ প্রতীতি থেকে স্বতন্ত্র।

শঙ্কুক বলেছেন – নাট্যাভিনয় দর্শনের সময় দর্শকের মনে অনুকারক নটব্যক্তিতে যে অনুকার্য নায়কবুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাও চতুর্বিধ প্রসিদ্ধ জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র চিত্রতুরগন্যায়েই সংঘটিত হয়। 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দর্শনের সময় সহৃদয় রঙ্গপ্রেক্ষকের চিত্তে 'এই নটই দুষ্যন্ত, দুষ্যন্তই এই নট' – এই প্রতীতি উৎপন্ন হয় না। 'এই নট দুষ্যন্ত নয়' – উত্তরকালোদ্ভব এই বাধক জ্ঞানের দ্বারা অনুগত 'এই নট দুষ্যন্ত' – এরূপ প্রতীতিও উৎপন্ন হয় না। 'এই নট দুষ্যন্ত হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে' – এরূপ সন্দেহও উদিত হয় না। 'এই নট দুষ্যন্ত সদৃশ' – এই সাদৃশ্যবোধও জাগ্রত হয় না। তথাপি রঙ্গপ্রেক্ষক নটকে দুষ্যন্ত থেকে অভিন্ন ব'লে মনে করেন।

অনুকারক নট তাঁর অনুকরণসামর্থ্যের দ্বারা অতি নিপুণভাবে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব

সমূহকে প্রকাশিত করেন এবং অনুকারক নটে পাত্রের অভিন্নত্ববোধ পূর্বে উদিত হওয়ায় নট কর্তৃক প্রকাশিত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব তাঁর কাছে প্রকৃত ও অকৃত্রিম ব'লে মনে হয়। ফলে নাট্যাভিনয় দর্শনের সময় প্রেক্ষকের যে অনুমানাত্মক জ্ঞান জন্মায় তা থেকে তার লোকাতীত আনন্দ অনুভূত হয়। শঙ্কুক বলেছেন – এরূপ অনুভবই রস।

'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ের সময় সহৃদয় দর্শক অনুকারক নটকে অনুকার্য দুষ্যন্ত থেকে অভিন্ন ব'লে মনে করেন। নটও এমন নিপুণভাবে অভিনয় করেন যে, শকুন্তলা প্রভৃতি বিভাবসমূহ; মৃগয়াত্যাগ, নিদ্রাভাব প্রভৃতি অনুভাবসমূহ এবং তনুতা, কৃশতা, চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবসমূহ তাঁর নিজস্ব ব'লে প্রতিভাত হয়। এই সমস্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব থেকে দুষ্যন্ত হ'তে অভিন্ন ব'লে গৃহীত নটে রতি অনুমিত হয়।

শঙ্কুকের মতে প্রসিদ্ধ "বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ" সূত্রের অর্থ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব থেকে অনুমানের দ্বারা নটে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের জ্ঞান উৎপন্ন হয়।[৮২] এই মতে বিভাবাদির সঙ্গে রত্যাদি ভাব ও রসের গম্য-গমক সম্বন্ধ। 'বিভাবাদি' গমক ও 'রস' গম্য। 'অনুমান'-লব্ধ রত্যাদি জ্ঞানই সামাজিক চিত্তকে রসবান করে। রসবোধের ক্ষেত্রে এই যে 'অনুমান' তা ব্যবহারিক জগতের লৌকিক শুষ্ক অনুমান থেকে স্বতন্ত্র। শ্রীশঙ্কুকের মতে এটা অলৌকিক অনুমান যেহেতু সামাজিক চিত্তে এটা অলৌকিক আনন্দের হেতু।

ভট্টলোল্লট ও শঙ্কুক উভয়ের মতেই রস মুখ্যভাবে নায়কাদিনিষ্ঠ। অনুকারক নটে অনুকার্য নায়কবুদ্ধির কথা উভয়েই স্বীকার করেছেন। তবে ভট্টলোল্লটের মতে নটের নায়কাভিন্নত্ববোধ ভ্রম থেকে উৎপন্ন, অতএব মিথ্যাপ্রতীতি। কিন্তু শঙ্কুকের মতে এই অভেদজ্ঞান চার প্রকার প্রসিদ্ধ প্রতীতি থেকে স্বতন্ত্র চিত্রতুরগাদিন্যায়ানুকারিণী প্রতীতি। ভট্টলোল্লট প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের অনুভব স্বীকার করেছেন। অপরপক্ষে শঙ্কুক বলেছেন এদের জ্ঞান হয় অনুমানের দ্বারা। এজন্যই শ্রী শঙ্কুকের মতবাদকে বলা হয় 'অনুমিতিবাদ'।

শঙ্কুকের রসবিষয়ক মতবাদ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। শঙ্কুকের মতে নাট্যাভিনয়ের সময় রঙ্গপ্রেক্ষক অনুকারক নটকে নায়ক ব'লে স্বীকার করেন এবং তাঁর

প্রতীতি চিত্রতুরগন্যায়ে সংঘটিত হ'য়ে থাকে।

২। অনুকারক নটে অনুমীয়মান রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব কৃত্রিম। তারা প্রকৃতপক্ষে নায়কনিষ্ঠ রত্যাদির সদৃশ।

৩। নট-নিষ্ঠ রত্যাদির অনুমান লৌকিক অনুমান থেকে স্বতন্ত্র। তাই এটি অলৌকিক আনন্দের জনক।

৪। ভট্টলোল্লটের মত শঙ্কুকও আনন্দকেই সবরকম কাব্যের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু আলংকারিক সমাজে শ্রীশঙ্কুকের মত উপেক্ষিত হ'য়েছে। কারণ শ্রীশঙ্কুকের অভিমত হ'ল- সুনিপুণ নটের বিশ্বস্ত অনুকরণ ও অভিনয়নৈপুণ্যের ফলে রঙ্গমঞ্চের কৃত্রিম বিভাবাদিকেও নাটকের অকৃত্রিম বিভাবাদি ব'লে মনে হয়; নট-নটী নাটকের প্রকৃত পাত্র-পাত্রী থেকে যে স্বতন্ত্র তা মনে হয় না। কিন্তু নাটকীয় চরিত্র থেকে নট-নটীর যে অভিন্নতা প্রতীতি তা দু-এক মুহূর্তেই সম্ভবপর, সবসময় নয়। অতএব নট-নটীর পাত্রাদ্যভিন্নতা ও অলৌকিক অনুমানের দ্বারা নট-নটীতে রত্যাদিভাব ও রসের জ্ঞান - এ দুয়ের কোনটিই যখন অনুভবসিদ্ধ অথবা যুক্তিযুক্ত নয়, তখন শ্রীশঙ্কুকের 'অনুমিতিবাদ' কোনক্রমেই গ্রহণীয় হ'তে পারে না।

আচার্য অভিনবগুপ্ত এই রসতত্ত্বের বিরূদ্ধে আর একটি অভিযোগ এনেছেন। শঙ্কুক নটাশ্রিত রত্যাদিকে কৃত্রিম ও অসত্য ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং আরো বলেছেন যে এদের অনুমান চিত্তে অলৌকিক আনন্দের সঞ্চার করে। কিন্তু অভিনবগুপ্ত মনে করেন যে কৃত্রিম ও মিথ্যা চিত্তবৃত্তির অনুমান যদি আনন্দ উৎপন্ন করে তাহলে যথার্থ এবং অকৃত্রিম মানসিক ভাবের অনুমিতি থেকেও আনন্দ-লাভ আশা করা যেতে পারে। অধিকন্তু অবিদ্যমান রত্যাদির অনুমানই যখন আনন্দ সঞ্চারিত করে, তখন তাত্ত্বিক রত্যাদির অনুমিতি থেকে অধিক আনন্দ লাভ করা স্বাভাবিক।[৮৩]

ভুক্তিবাদ

আলংকারিক ভট্টনায়কই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, যে রস অন্যে আস্বাদন করছে তার প্রতীতি কিছুটা আনন্দ দিলেও সম্যক্ আনন্দ দিতে পারে না, অতি সহৃদয় জনও অন্যসুখে তন্ময় হয় না। যে রস আত্মনিষ্ঠ, তারই প্রতীতি চিত্তকে চমৎকৃত ও তন্ময় করে, অলৌকিক চমৎকারিকতার হেতু হয়। তাঁর এই আত্মনিষ্ঠ নূতন রসবাদই হ'ল 'ভুক্তিবাদ'।

আলংকারিকগণ রসোদ্বোধের চারটি উপকরণ ব'লে থাকেন। এই উপকরণ চারটি হ'ল স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাব। এই চারটি উপকরণ যখন বিশেষ বা প্রাতিস্বিক রূপ পরিত্যাগ ক'রে নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক হ'য়ে ওঠে অর্থাৎ বিশেষ হ'য়ে ওঠে সাধারণ তখনই সেই সাধারণীকৃতির (generalised representation) ফলে আত্মনিষ্ঠ রসের প্রতীতি হয়। রঙ্গমঞ্চের সমগ্র পরিবেশটি যখন দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ সর্বসাধারণের পরিবেশ হ'য়ে ওঠে তখন নায়কের রত্যাদি স্থায়িভাব ও বিভাবাদির সঙ্গে দর্শকের সুনিবিড় সংযোগ সাধিত হয়। ফলে দর্শক সমগ্র নাটকীয় ব্যাপারের সঙ্গে পরম আত্মীয়তা অনুভব করে। দর্শক তখন উদাসীনের মত অন্যের রসাস্বাদ প্রত্যক্ষ বা অনুমান ক'রে আনন্দ অনুভব করে না। নায়ক-নায়িকার রত্যাদি তার সত্ত্বময় চিত্তের উদার-আলোকে প্রতিভাত হ'য়ে তাকে আত্মগত অপরিমিত আনন্দের আস্বাদ দেয়। এই স্বগত আনন্দানুভূতিই ভট্টনায়কের মতে রস। এটি উদাসীন জনের বাইরে থেকে দেখার বা অনুমান করার আনন্দ নয়, এটি বাহ্যিককে সহজ অনুভূতির মধ্যে দিয়ে অন্তরঙ্গ ক'রে পাওয়ার আনন্দ। বাইরের ভাব বা অবস্থা যখন সর্বজনীন হ'য়ে সহৃদয় জনের চিত্তকে সংকীর্ণতামুক্ত সত্ত্বময় ক'রে তোলে, তখনই এই অনুভূতি, এই আনন্দ সম্ভবপর হয়।

এই রসানুভূতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভট্টনায়ক কাব্য ও নাটকের তিনটি বিশিষ্ট ব্যাপারের কল্পনা করেছেন। এই তিনটি ব্যাপার হ'ল – অভিধা, ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব। এই তিন ব্যাপারের প্রথমটি অর্থাৎ অভিধা হ'ল শব্দের। আর বাকি দুটি অর্থাৎ ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব হ'ল কাব্য বা নাটকের শক্তি। এই তিন শক্তির দ্বারাই পাঠক অথবা দর্শকের মধ্যে রস উদ্বোধিত ও আস্বাদিত হয়। অভিধার দ্বারা লক্ষণার ও গ্রহণ হ'য়ে থাকে। নাট্যদর্শনকালে বাচিক অভিনয়ে শ্রুত শব্দসমূহের অভিধাশক্তি অর্থাৎ বাচ্য ও লক্ষ্যার্থের দ্বারা দর্শকের বিভাবাদির স্বরূপ বোধ হয়। অতঃপর নৃত্যগীত-বাদ্য-মাধুর্যে ও দক্ষ নট-নটীদের চার প্রকার অভিনয়চাতুর্যে সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চে এমন একটি অলৌকিক আনন্দলোক সৃষ্টি হয় যাতে সব কিছুই উদার ও মহৎ হ'য়ে ওঠে। সহৃদয় সামাজিক চিত্তের ক্ষুদ্র আমিত্বটি ক্ষুদ্রতা বর্জন

ক'রে বৃহত্তর সত্তায় উন্নীত হয়। বৃহতের এই উদার আবির্ভাবে বিভাবাদি নিজ নিজ রূপ ও বৈশিষ্ট্যে নয়, সাধারণভাবে সর্বজনীন হ'য়ে দর্শকের নিকট প্রতিভাত হয়। এটিই নাটকের 'সাধারণীকরণ', এটি নাটকের 'ভাবকত্ব' শক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়। বস্তুতঃ অভিনয় দেখতে দেখতে দর্শক তন্ময় হ'য়ে পড়ে এবং এই তন্ময়তার জন্যই নাটকীয় চরিত্রগুলি দেশ-কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে সর্বজনীন শাশ্বত এক একটি আদর্শ অথবা প্রতীকরূপে দর্শকের নিকট প্রতিভাত হয়। যেমন 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে অভিনয়নৈপুণ্যে দর্শক এমনি মুগ্ধ ও অভিভূত হ'য়ে পড়ে যে, তার ভাবময় দৃষ্টিতে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার বিশেষ পরিচয়টি বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। পৌরব দুষ্যন্ত তার কাছে সাধারণভাবে ধীরোদাত্ত নায়ক এবং কণ্বকন্যা শকুন্তলা আদর্শ এক নায়িকার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হন। দুষ্যন্তনিষ্ঠ শকুন্তলাবিষয়ক যে রতি তা হ'য়ে ওঠে সামান্য রতি। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেম দেশ-কাল নিরপেক্ষ দুই কান্ত-কান্তার প্রেমে পরিণত হয়। সর্বজনীন বৃহত্তর সত্তার এই উন্মেষের ফলে নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে দর্শক একাত্মতা অনুভব করে।

অতএব শব্দের অভিধা শক্তিদ্বারা নাটকের বিভাবাদি জ্ঞাত এবং নাটকের 'ভাবকত্ব' শক্তিতে বিভাবাদির সর্বজনীনত্ব সম্পাদিত হয়। এই দ্বিতীয় ব্যাপারটির অব্যবহিত পরেই ঠিক রসোপলব্ধি হয় না। এটি প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকার চিত্তকে সর্বজনীনতার স্পর্শে সর্ব-সংকীর্ণতামুক্ত ক'রে রসোপলব্ধির ক্ষেত্র রচনা করে। তারপর উদার উন্মুক্ত উন্নত চিত্তে রজোগুণে যে বিক্ষেপ ও তমোগুণে যে কাঠিন্য তা গুণীভূত ও দ্রবীভূত হ'য়ে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়। এই সত্ত্বোদ্রেকই হ'ল তৃতীয় অর্থাৎ ভোজকত্ব ব্যাপারের কাজ। সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হ'লে চিত্ত স্বচ্ছ, শুদ্ধ, কোমল, স্থির এবং স্থিতধী হয়। সত্ত্বময় এই চিত্তে তখন স্বরূপানন্দ চৈতন্যের আনন্দ স্ফুরিত হ'তে থাকে। এই অনন্ত-স্ফুরিত আনন্দে রত্যাদি স্থায়িভাব সাক্ষাৎকৃত হ'লে অলৌকিক এক আস্বাদ উৎপন্ন হয়। এই আস্বাদই রস।

ভট্টনায়কের মতে ভরতের রসসূত্রের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ –

'অভিধা' শক্তিতে নিবেদিত এবং নাটকের 'ভাবকত্ব' শক্তিতে সাধারণীকৃত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সাহায্যে, নাটকের 'ভোজকত্ব' শক্তিতে সত্ত্বোদ্রেকহেতু সত্ত্বপ্রধান চিত্তে স্ফুরিত আনন্দ-চৈতন্যে সাক্ষাৎকৃত নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রত্যাদি স্থায়িভাব উপভুক্ত হয়। এই উপভুক্তির অলৌকিক আস্বাদই রস। সাধারণীকৃত বিভাবাদির জন্যই স্থায়িভাব উপভোগযোগ্য ও রস আস্বাদিত হয়। অতএব বিভাবাদির সঙ্গে রসের ভোজ্য-ভোজক সম্বন্ধ। রস ভোজ্য; বিভাবাদি ভোজক। সংক্ষেপে এটাই হ'ল রসতত্ত্বে 'ভুক্তি তত্ত্ব'।

কিন্তু পরবর্তীকালের আলংকারিকেরা এই মত গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে করেননি। এঁদের মতে সহৃদয় সামাজিকের মনে বাসনার আকারে সূক্ষ্মভাবে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব না থাকলে তার পক্ষে রসাস্বাদন সম্ভব হয় না। রতি-বাসনাহীন ব্যক্তির কাছে প্রণয় মাধুর্যহীন ব'লে সে শৃঙ্গাররসের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। যাদের মনে স্থায়িভাবের বাস্তব সংস্কার নেই, তারা কাব্য-নাট্য-রসাস্বাদন বিষয়ে রঙ্গালয়ের কাষ্ঠ ও প্রস্তরতুল্য জড়। তাই পরবর্তীকালে আলংকারিকপ্রবর আচার্য অভিনবগুপ্ত এই ত্রুটি সংশোধন ক'রে নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মতবাদ 'রসাভিব্যক্তিবাদ' বা 'অভিব্যক্তিবাদ' নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

অভিব্যক্তিবাদ

ভট্টনায়কের পরে রসবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন দশম শতকের আলংকারিক অভিনবগুপ্ত। তাঁর মত 'অভিব্যক্তিবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর মতে সূত্রস্থ 'সংযোগ' শব্দের অর্থ 'অভিব্যঞ্জন' বা ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-ভাব এবং 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ হ'ল 'অভিব্যক্তি' বা প্রকাশ। অর্থাৎ তাঁর মতে সূত্রের অর্থ হ'ল — বিভাব-অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সঙ্গে (স্থায়িভাবের) সংযোগ বা ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-সম্বন্ধবশতঃ রসাভিব্যক্তি ঘটে। বিভাবাদি এর ব্যঞ্জক। অভিব্যক্তিবাদে বিভাবাদির সঙ্গে রসের যে সম্বন্ধ তা ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-সম্বন্ধ।

কাব্যপাঠ বা নাট্যাভিনয়ের সময় সহৃদয় প্রথমে বিভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। বিভাব-প্রভৃতিকে সহৃদয় কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ অথবা অসম্বন্ধরূপে মনে করে না। এজন্য বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব এবং চরিত্রনিষ্ঠ-স্থায়িভাব সহৃদয়ের কাছে দেশ, কাল ও পরিবেশের পরিচ্ছিন্নতা বিহীনভাবে বা সাধারণরূপে প্রতিভাত হয়। সাধারণরূপে প্রতীয়মান এই সমস্ত বিভাবাদির মাধ্যমে সহৃদয়ের স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হয়। এই স্থায়িভাবগুলিও প্রতীত হয় সাধারণরূপে অর্থাৎ সহৃদয় পাঠক বা দর্শক এগুলিকে আত্মনিষ্ঠরূপে গ্রহণ করে না। সহৃদয়ের চিত্তে উদ্বুদ্ধ স্থায়িভাবগুলি চরিত্রগত অভিব্যঞ্জিত মানসিক ভাবের অনুরূপ। বিভাবাদির দ্বারা যদি নায়কনিষ্ঠ রতি অভিব্যক্ত হয়, তাহলে সহৃদয়ের চিত্তে রত্যাখ্য-ভাব উদ্বুদ্ধ হয়। এই উদ্বুদ্ধ স্থায়িভাবগুলিকে সহৃদয় 'পানকরস' বা সরবতের মত চর্বন বা আস্বাদন করতে থাকেন। আস্বাদ্যমান এই বস্তু বা জ্ঞানটির নাম 'রস' বা রসানুভূতি।

আস্বাদ্যমানতাই রসের প্রাণ। আস্বাদনেই রসের চরম অস্তিত্ব। যতক্ষণ বিভাব প্রভৃতি থাকে, ততক্ষণ রস-প্রক্রিয়া চলতে থাকে। রস অলৌকিক আনন্দের উৎস। ব্রহ্ম-আস্বাদে যেমন তৃপ্তি, রসাস্বাদেও তেমনি। রসের প্রবেশ অন্তরের অন্তঃস্থলে। রসের ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্বে। নিজের স্থান ক'রে নেওয়ার সময় রস সব কিছুকে দূরে সরিয়ে দেয়। রসের বৈশিষ্ট্য অলৌকিক।

অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের 'ভাবকত্ব' ও 'ভোজকত্ব' নামক ব্যাপার দুটির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও এই ব্যাপার দুটির কাজ ও প্রভাবকে অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে এই কাজ ব্যঞ্জনা-বৃত্তির দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। তার জন্য দুটি স্বতন্ত্র ব্যাপার কল্পনা করার কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ ব্যঞ্জনা বৃত্তির অসীম শক্তি।

অভিনবগুপ্তের মতে নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রত্যাদিভাবের সাধারণীকৃত রূপ দেখে প্রেক্ষকচিত্তে সূক্ষ্ম বাসনাকারে বিদ্যমান রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। উদ্বুদ্ধ এই স্থায়িভাব তন্ময়চিত্তের সাত্ত্বিক আনন্দে আস্বাদিত হয়। এই অনির্বচনীয় আনন্দ-আস্বাদনই 'রস'। বিভাব-অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব দ্বারা সহৃদয় সামাজিক চিত্তে স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হ'লে রস অভিব্যক্ত হয়। 'অভিব্যক্তিবাদ' অনুসারে ভরতের অভিব্যক্ত রসসূত্রের এটাই মর্মানুবাদ।

রসবিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ সংস্কার ব্যতীত রসবোধ হয় না। প্রেক্ষকচিত্তে বিদ্যমান স্থায়িভাবের সূক্ষ্ম সংস্কার উদ্বুদ্ধ হ'লে রসতাপ্রাপ্ত হয়। স্থায়িভাবের এই বাসনা বা সংস্কার ভট্টনায়ক স্বীকার করেন না, অভিনবগুপ্ত স্বীকার করেন। এই স্বীকরণই অভিব্যক্তিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য শুধু যুক্তিসম্মত নয়, মনোবিজ্ঞানসম্মত। কারণ রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে আত্মনিষ্ঠতা স্বীকার করলে আন্তর বাসনাকে স্বীকার করতেই হয়। আত্মনিষ্ঠ স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ না হ'লে অন্যনিষ্ঠ স্থায়িভাবের আস্বাদন অসম্ভব।

রসবাদের ক্ষেত্রে 'অভিব্যক্তিবাদ' যে একটি যুগান্তকারী অবদান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মতবাদটিও নিশ্ছিদ্র নয়। বিভাবাদির সাধারণীকরণ ও কাব্যার্থে সামাজিকচিত্তের সম্পূর্ণ তন্ময়ীকরণ – এই দুটি ব্যাপার বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কিন্তু সামাজিকের মধ্যে আত্মনিষ্ঠ স্থায়িভাবের উদ্বোধ না হ'লে যে রসবোধ হয় না, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

রসসম্বন্ধে যে চারটি প্রধান মতবাদ আছে সেগুলির মধ্যে আচার্য অভিনবগুপ্তের 'অভিব্যক্তিবাদ' যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই মতবাদটি অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ ও মনোবিজ্ঞানসম্মত। সে কারণেই আজও এই মতবাদটি সুধিসমাজে বিশেষ আদরণীয়। বিভাবাদি সাধারণীকৃত হ'য়ে সামাজিকের স্থায়ীভাবকে উদ্বুদ্ধ ও অভিব্যক্ত করে এবং এই উদ্বুদ্ধ স্থায়িভাবই নাটকের মধুর, মনোহর ব্যঞ্জনায় বিগলিত বেদ্যান্তর আনন্দঘন চিত্তে রসতা প্রাপ্ত হয়। সংক্ষেপে অভিনবগুপ্তের এটাই রসতত্ত্ব। অভিনবগুপ্তের পর দীর্ঘদিন কোন নূতন রসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাঁর মতকেই প্রামাণিকরূপে প্রসিদ্ধ আলংকারিক মম্মট, বিশ্বনাথ এবং আরও অনেকে গ্রহণ করেছেন।

প্রেক্ষক যা থেকে রস গ্রহণ করতে পারে না, সে দৃশ্যকাব্য নিষ্ফল। কিন্তু প্রেক্ষকের মনোরঞ্জনের অর্থ তার খেয়ালরঞ্জন নয়। প্রেক্ষকের প্রতীতিযোগ্য বিষয় নিয়ে প্রেক্ষকের শুভবুদ্ধিকেই উদ্দীপ্ত ক'রে

তুলতে হবে। তা না করতে পারলে কাব্যত্বই ব্যাহত হয়। বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ ক'রে পাঠক অথবা প্রেক্ষকের খেয়াল-খুশী-চরিতার্থ ক'রে যে রচনা, তার আর যে নাম দেওয়া হোক না কেন, তাকে কাব্য বলা যাবে না। সেজন্য সংস্কৃত আলংকারিকগণ কাব্যরসকে 'ব্রহ্মানন্দসহোদর' ব'লে থাকেন।

উপসংহারে 'নাট্যরস' সম্বন্ধে আর দু-একটি কথা না বললে রসের আলোচনা ঠিক সম্পূর্ণ হয় না। এই রস কোথায় আস্বাদিত হয় এবং কে এর আস্বাদক – এই প্রশ্নটি সকলের মনেই জাগে এবং জাগাই স্বাভাবিক। আলংকারিকদের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ভট্টলোল্লট ও শ্রীশংকুকের মতে রস নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃত নায়ক-নায়িকাকে যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি না, তখন এদের মতে যা নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ, তা বস্তুতঃ নট-নটীনিষ্ঠ। ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্তের মতে সহৃদয় সামাজিকই রসাস্বাদন করে, নট-নটী নয়।

এ বিষয়ে আরও একটি অভিমত আছে, যে মতে সামাজিক যেমন নাট্যদর্শনের সময় রস আস্বাদন করে, নাট্যকারেরও তেমনি নাট্যরচনার সময় রসোপলব্ধি হয়। তা না হ'লে কাব্যে রসসৃষ্টি হ'তে পারে না।

কিন্তু এই মতের সমর্থন যাঁরা করেন না, তাঁরা বলেন যে – নাট্যকারের মধ্যে সুখ-দুঃখের প্রবল অনুভূতি হয় সত্য, কিন্তু সে অনুভূতি রস নয়। নাট্যকারের প্রতিভাস্পর্শে বাস্তব যখন বিভাবাদিতে পরিণত হয়, তখনই তা রসোদ্বোধের হেতু হ'য়ে থাকে। বাস্তব ঘটনায় নাট্যকার যখন বিচলিত হন, তখন রসাস্বাদ হয় না — একথা সত্য। কিন্তু তিনি যখন সেইসব ঘটনা হৃদয়-রসে জারিত ক'রে তাঁর রচনায় প্রকাশ করেন তখন তিনি রসাস্বাদ করেন না – একথা বলা বোধহয় সংগত নয়। কারণ সত্ত্বোদ্রেক, রসোদ্রেক না হ'লে রসসৃষ্টি হয় না। তবে রসাস্বাদকালে সামাজিকের যেরূপ তন্ময়তা ঘটে, নাট্যকারের তেমন হয় না। কারণ তাঁকে সৃষ্টি - সচেতন থাকতে হয়। কিন্তু রচনার বিষয় ছাড়া অন্যবেদ্যবিহীন প্রসারিত চিত্তের যে আনন্দময় অবস্থা, যাকে রস ছাড়া অন্য কোন নাম দেওয়া যায় না, সে অবস্থা রচয়িতার হয়। অতএব রসাস্বাদও হয়।

ভরতবাক্য

'ভরতবাক্য' সংস্কৃত নাটকের শেষ আঙ্গিক। নির্বহণ বা সংহার সন্ধির শেষ অঙ্গের নাম 'প্রশস্তি'। 'প্রশস্তি' শব্দের অর্থ প্রশংসাসূচক উক্তি। নৃপ অর্থাৎ রাজার এবং দেশের শান্তি অর্থাৎ মঙ্গলসূচক কামনাকে বলে প্রশস্তি।[৮৪] এটি নাটকের 'শান্তিবাক্য'।[৮৫] ধনঞ্জয় যে কোন শুভশংসন অর্থাৎ মঙ্গলকামনাকেই প্রশস্তি বলেছেন।[৮৬]

নির্বহণ সন্ধির শেষ অঙ্গ হ'ল প্রশস্তি। প্রশস্তিতেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। সেজন্য প্রশস্তি-শ্লোককে নাটকের অন্তিম শ্লোক বলা হয়। এই প্রশস্তিকে সাধারণতঃ বলা হয় – 'ভরতবাক্য' 'প্রশস্তি' ও 'ভরতবাক্যে' কোন পার্থক্য নেই। শান্তিবাক্য নাটকীয় পাত্র কর্তৃক পঠিত হ'লে তা প্রশস্তি। আর সূত্রধার-জাতীয় জনৈক প্রধান নট প্রবেশ ক'রে যখন তা পাঠ করেন, তখন তার নাম ভরতবাক্য। এখানে 'ভরত' শব্দ নট অর্থে প্রযুক্ত।

পাদটীকা

১। ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে। — নাট্যশাস্ত্র - ৬/৩১ (বৃত্তি)

২। এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে.....।। — সাহিত্যদর্পণ ৬/১০

৩। স্বাদঃ কাব্যার্থসংভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ। — দশরূপক - ৪/৪৩ (ক)

৪। অত্র চ তস্যোদ্রেকঃ রজস্তমসী অভিভূয়াবির্ভাবঃ।
হেতুস্তথাবিধালৌকিককাব্যার্থপরিশীলনম্। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/২ (বৃত্তি)

৫। স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/২

৬। তা এব চ পরিত্যক্তবিশেষা রসহেতবঃ। — দশরূপক — ৪/৪১ (ক)

৭। স যৎ স্বভাবঃ কবিস্তদনুরূপং কাব্যম্। — কাব্যমীমাংসা, ১০ম অধ্যায় - রাজশেখর

৮। শৃংগারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব বীতরাগশ্চেন্ নীরসং সর্বমেব তৎ।। — অগ্নিপুরাণ - ৩৪৫/১১

৯। লোকস্বভাবং সংপ্রেক্ষ্য নরাণাং চ বলাবলম্।
সংভোগং চৈব যুক্তিং চ ততঃ কার্যং তু নাটকম্।। — নাট্যশাস্ত্র — ২১/১২৪

১০। তদেবং লোকভাবানাং প্রসমীক্ষ্য বলাবলম্।
মৃদুশব্দং সুখার্থং চ কবিঃ কুর্যাত্তু নাটকম্।।
চেক্রীড়িতাদৈঃ শব্দৈস্তু কাব্যবন্ধা ভবন্তি যে।
বেশ্যা ইব ন শোভন্তে কমণ্ডলুধরৈর্দ্বিজৈঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ২১/১২৭-১২৮

১১। যস্তুষ্টৌ তুষ্টিমায়াতি শোকে শোকমুপৈতি চ।
দৈন্যে দীনত্বমভ্যেতি স নাট্যে প্রেক্ষকঃ স্মৃতঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ২৭/৫৫

১২। শব্দসমর্প্যমাণ - হৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাব -
-সমুদিতপ্রাঙ্নিবিষ্টরত্যাদি-বাসনানুরাগসুকুমার -
-স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপাররসনীয়রূপো রসঃ। — অভিনবগুপ্ত কৃত লোচনটীকা,
ধ্বন্যালোক-১/৪

১৩। রস্যতে ইতি রসঃ। — সাহিত্যদর্পণ - ১/৩ (বৃত্তি)

১৪। অত্রাহ, রস ইতি কঃ পদার্থ? উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ। — নাট্যশাস্ত্র - ৬/৩১ (বৃত্তি)

১৫। রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ। — রসগঙ্গাধর - ১/৬, বৃত্তি

১৬। রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। — তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী - ২/৭

১৭। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
আনীয়মানঃ স্বাদ্যত্বং স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।। — দশরূপক - ৪/১

১৮। অত্রাহ-ভাবা ইতি কস্মাৎ, কিং ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ? — নাট্যশাস্ত্র - ৭ম অধ্যায়, ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "ভরত নাট্যশাস্ত্র" — ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ১৫৩

১৯। বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ। — নাট্যশাস্ত্র - সপ্তম অধ্যায়।

২০। রসানুকূলো বিকারো ভাব ইতি হি তল্লক্ষণম্। — রসতরঙ্গিনী — ভানুদত্ত, পৃষ্ঠা—৬৯

২১। বিভাবৈরাহৃতো যোঽর্থস্ত্বনুভাবেন হ্যনুভাবৈস্তু গম্যতে।
বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়ৈঃ স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৭/১

২২। বয়স্ক ক্রমঃ - ভাবশব্দেন তাবচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষা এব বিবক্ষিতাঃ।
তথা চ একোনপঞ্চাশতা ভাবৈরিত্যাদৌ তানেবোপসংহরিষ্যামি।
তেষান্তু যোগ্যতাবশাদ্ যথাযোগং স্থায়িসঞ্চারি (বি?) ভাবানুরূপতা সম্ভবতি।
— অভিনবভারতী — পৃঃ ৩৪৩

২৩। রত্যাদ্যুদ্‌বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/৩৩

২৪। বিভাব্যন্তেঽনেন বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়া ইতি বিভাবাঃ। — নাট্যশাস্ত্র - সপ্তম অধ্যায়- ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "ভরত নাট্যশাস্ত্র" প্রথম খণ্ড, পৃঃ—১৫৪

২৫। জ্ঞায়মানতয়া তত্র বিভাবো ভাবপোষকৃৎ।
আলম্বনোদ্দীপনত্বপ্রভেদেন স চ দ্বিধা।। — দশরূপক — ৪/২

২৬। আলম্বনং নায়কাদিস্তমালম্ব্য রসোদ্‌গমাৎ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/৩৫

২৭। উদ্দীপনবিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১৩৪

২৮। আলম্বনস্য চেষ্টাদ্যা দেশকালাদয়স্তথা।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১৩৫

২৯। অনুভাব্যতেঽনেন বাগঙ্গসত্ত্বৈঃ কৃতোঽভিনয় ইতি। — নাট্যশাস্ত্র - সপ্তম অধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "ভরত নাট্যশাস্ত্র" — প্রথম খণ্ড — পৃঃ-১৫৪

৩০। বাগঙ্গাভিনয়েনেহ যতস্ত্বর্থোঽনুভাব্যতে।
বাগঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তস্ত্বনুভাবস্ততঃ স্মৃতঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৭/৫

৩১। উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ সোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১৩৬

৩২। কারণকার্যসঞ্চারিরূপা অপি হি লোকতঃ।
রসোদ্বোধে বিভাবাদ্যাঃ কারণান্যেব তে মতাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/১৫

৩৩। সাত্ত্বিকশ্চানুভাবরূপত্বাৎ ন পৃথগুক্তাঃ। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১-বৃত্তি

৩৪। পৃথগ্‌ভাবা ভবন্ত্যন্যেঽনুভাবত্বেঽপি সাত্ত্বিকাঃ।।
সত্ত্বাদেব সমুৎপত্তেস্তচ্চ তদ্ভাবভাবনম্। — দশরূপক - ৪/৪(খ) - ৫(ক)

৩৫। বি অভি ইত্যেতাবুপসর্গৌ। চর্ গতৌ ধাতুঃ।
বিবিধ(ম)-ভিমুখেন রসেষু চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ।
চরন্তি নয়ন্তীত্যর্থঃ। — নাট্যশাস্ত্র - সপ্তম অধ্যায় - ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "ভরত নাট্যশাস্ত্র - প্রথম খণ্ড - পৃঃ—১৬৩

৩৬। বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িন্যুন্মগ্ননিমগ্নাঃ কল্লোলা ইব বারিধৌ।। — দশরূপক - ৪/৭

৩৭। সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে। — ভক্তিরসামৃতসিন্ধু - ২/৩/১
— রসার্ণবসুধাকর - ২/২

৩৮। বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরণাদ্ ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্মগ্না — — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১৪১

৩৯। স্থিরতয়া বর্তমানে হি রত্যাদৌ নির্বেদাদয়ঃ
প্রাদুর্ভাবতিরোভাবাভ্যামাভিমুখ্যেন চরণাদ্
ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১৪৬, বৃত্তি

৪০। তত্র আপ্রবন্ধং স্থিরত্বাদমীষাং ভাবানাং স্থায়িত্বম্।
ন চ চিত্তবৃত্তিরূপাণামেষামাশুবিনাশিত্বেন
স্থিরত্বং দুর্লভম্, বাসনারূপতয়া স্থিরত্বং তু
ব্যভিচারিষ্বতিপ্রসক্তমিতি বাচ্যম্।
বাসনারূপাণামমীষাং মুহুর্মুহুরভিব্যক্তেরেব স্থিরপদার্থত্বাৎ।
ব্যভিচারিণাং তু নৈব, তদভিব্যক্তেবিদ্যুদুদ্দ্যোতপ্রায়ত্বাৎ। — রসগঙ্গাধর
–RASAGANGĀDHARA OF

PANDITARĀJA JAGANNĀTHA

[First Ānna] By Dr. Sandhya Bhāduri

page-36-37

৪১। উন্মজ্জন্তো নিমজ্জন্তঃ কল্লোলাশ্চ যথার্ণবে।
তস্যোৎকর্ষং বিতন্বন্তি যান্তি তদ্রূপতামপি।।
স্থায়িন্যুন্মগ্ননিমগ্নাস্তথৈব ব্যভিচারিণঃ।
পুষ্ণন্তি স্থায়িনং স্বাংশ্চ তত্র যান্তি রসাত্মতাম্।। — ভাবপ্রকাশন - প্রথম অধিকার

৪২। তাদাত্ম্যং ভাব-রসয়োর্ভারবিঃ স্পষ্ট মুচিবান্। — ভাবপ্রকাশন - ১০ম অধিকার

৪৩। ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ব্যভিচারিণঃ — নাট্যশাস্ত্র - ৭/৬ বৃত্তি

৪৪। নির্বেদাবেগদৈন্যশ্রমমদজড়তা ঔগ্র্যমোহৌ বিবোধঃ
স্বপ্নাপস্মারগর্বা মরণমলসতামর্ষনিদ্রাবহিত্থাঃ।
ঔৎসুক্যোন্মাদশংকা স্মৃতিমতিসহিতা ব্যাধিসন্ত্রাসলজ্জা
হর্ষাসূয়াবিষাদাঃ সধৃতিচপলতা গ্লানিচিন্তাবিতর্কাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/১৪২

৪৫। তত্ত্বজ্ঞানাপদীর্ষ্যাদের্নির্বেদঃ স্বাবমাননম্।
দৈন্যচিন্তাশ্রুনিঃশ্বাসবৈবর্ণ্যোৎশ্বসিতাদিকৃৎ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/১৪৩

৪৬। ইষ্টজনবিপ্রয়োগাদ্ দারিদ্র্যাদ্ ব্যাধিতস্তথা দুঃখাৎ।
পরবৃদ্ধিং বা দৃষ্ট্বা নির্বেদো নাম সংভবতি।।
বাষ্পপরিপ্লুতনয়নঃ পুনশ্চ নিঃশ্বাসদীনমুখনেত্রঃ।
যোগীব ধ্যানপরো ভবতি হি নির্বেদবান্ পুরুষঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৭/২৯-৩০

৪৭। মৃৎকুম্ভবালুকারন্ধ্রপিধানরচনার্থিনা।
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খোঽয়ং হন্ত! চূর্ণীকৃতো ময়া।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১৪৩

৪৮। রত্যায়াসমনস্তাপক্ষুৎপিপাসাদিসম্ভবা।
গ্লানির্নিষ্প্রাণতাকম্পকার্শ্যানুৎসাহতাদিকৃৎ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/১৭৩

৪৯। বান্তবিরিক্তব্যাধিষু তপসা জরসা চ জায়তে গ্লানিঃ।
কার্শ্যেন সাভিনেয়া মন্দক্রমণানুকম্পেন।। — নাট্যশাস্ত্র – ৭/৩১

৫০। কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্ বিপ্রলূনং
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণো দীর্ঘশোকঃ।
গ্লপয়তি পরিপাণ্ডুক্ষামমস্যাঃ শরীরং

শরদিজ ইব ঘর্মঃ কেতকী-গর্ভ-পত্রম্।। — উত্তরচরিত - ৩/৫

৫১। পরক্রৌর্যাত্মদোষাদ্যৈঃ শঙ্কানর্থস্য তর্কণম্।
বৈবর্ণ্যকম্পবৈস্বর্য্যপার্শ্বালোকাস্যশোষকৃৎ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১৬২

৫২। শঙ্কা নাম সন্দেহাত্মিকা স্ত্রীনীচানাং চৌর্যাদ্য -
-ভিগ্রহণনৃপাপরাধপাপকর্মকরণাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। — নাট্যশাস্ত্র -সপ্তম অধ্যায়
(ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
"ভরত নাট্যশাস্ত্র" প্রথম খণ্ড - পৃ-১৬৫)

৫৩। কিঞ্চিৎ প্রবেপিতাঙ্গো তথোন্মুখো বীক্ষতে চ পার্শ্বানি।
গুরুসজ্জমানজিহ্বঃ শ্যাবাস্যঃ শঙ্কিতঃ পুরুষঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৭/৩৫

৫৪। অসূয়ান্যগুণর্দ্ধীনামৌদ্ধত্যাদসহিষ্ণুতা।
দোষোদ্‌ঘোষভ্রূবিভেদাবজ্ঞাক্রোধেঙ্গিতাদিকৃৎ। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১৬৯

৫৫। পরসৌভাগ্যেশ্বরতামেধালীলাসমুচ্ছ্রয়ং দৃষ্ট্বা।
উৎপদ্যতে হ্যসূয়া কৃতাপরাধো ভবেদ্যশ্চ।।
ভ্রূকুটিকুটিলোৎকটমুখৈঃ সের্ষ্যাক্রোধপরিবৃত্তবক্ত্রাদ্যৈঃ।
গুণনাশনবিদ্বেষৈরস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৭/৩৬-৩৭

৫৬। অথ তত্র পাণ্ডুতনয়েন সদসি বিহিতং মধুদ্বিষঃ।
মানমসহত ন চেদিপতিঃ পরবৃদ্ধিমৎসরি মনো হি মানিনাম্।। — শিশুপালপধ — ১৫/১

৫৭। বিকারাঃ সত্ত্বসংভূতাঃ সাত্ত্বিকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/১৩৮

৫৮। সত্ত্বং নাম স্বাত্মবিশ্রামপ্রকাশকারী কশ্চনান্তরো ধর্ম্মঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/১৩৮

৫৯। তস্য চ যোঽসৌ স্বভাবো রোমাঞ্চাস্রবৈবর্ণ্যাদিকো
ন শক্যতেঽন্যমনসা কর্তুমিতি। — নাট্যশাস্ত্র - সপ্তম অধ্যায় পৃঃ-১৮৮
(ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
"ভরত নাট্যশাস্ত্র" প্রথম খণ্ড)

৬০। স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরসাদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৭/৯৪

৬১। সত্ত্বমাত্রোদ্ভবত্বাত্তে ভিন্না অপ্যনুভাবতঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/১৩৮

৬২। বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ। — নাট্যশাস্ত্র - সপ্তম অধ্যায় পৃঃ-১৫৩
(ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

৬৩। অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/১৭৮

৬৪। চিরং চিত্তেঽবতিষ্ঠন্তে সংবধ্যন্তেঽনুবন্ধিভিঃ।
রসত্বং প্রতিপদ্যন্তে প্রবুদ্ধাঃ স্থায়িনোঽত্র তে।। — ভোজরাজকৃত - সরস্বতী কন্ঠাভরণ- ৫/১৯

৬৫। যথা হি সমানলক্ষণাস্তুল্যপাণিপাদোদরশরীরাঃ সমানপ্রত্যয়া অপি পুরুষাঃ কুলশীলবিদ্যাকর্ম - শিল্পবিচক্ষণত্বাদ্ রাজত্বমাপ্নুবন্তি তত্রৈব চাদ্যেঽল্পবুদ্ধয়স্তেষামেবানুচরা ভবন্তি, তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাবানুপাশ্রিতা ভবন্তি। — নাট্যশাস্ত্র - ৭/৭ (বৃত্তি)

৬৬। ভাবান্তরেণ অনুপমর্দনীয়ো ভাবঃ স্থায়িভাবঃ। — নাট্যশাস্ত্র

৬৭। রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৬/১৭

৬৮। রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্।
বাগাদিবৈকৃতৈশ্চেতোবিকাশো হাস ইষ্যতে।।
ইষ্টনাশাদিভিশ্চেতো বৈক্লব্যং শোকশব্দভাক্।
প্রতিকূলেষু তৈক্ষ্ণ্যস্যাববোধঃ ক্রোধ ইষ্যতে।।
কার্যারম্ভেষু সংরম্ভঃ স্থেয়ানুৎসাহ উচ্যতে।
রৌদ্রশক্ত্যা তু জনিতং চিত্তবৈক্লব্যদং ভয়ম্।।
দোষেক্ষণাদিভির্গর্হা জুগুপ্সা বিস্ময়োদ্ভবা।
বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমাতিবর্তিষু।।
বিস্ফারশ্চেতসো যস্তু স বিস্ময় উদাহৃতঃ।
শমো নিরীহাবস্থায়াং স্বাত্মবিশ্রামজং সুখম্।। — সাহিত্যদর্পণ - ৩/১৮০

৬৯। যথা নানাব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্যসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ, তথা নানাভাবোপগমাদ্রসনিষ্পত্তিঃ। যথা হি গুড়াদিভির্দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৈরোষধীভিশ্চ ষড্ রসা নির্বর্তন্তে, এবং নানাভাবোপহিতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি। ..... যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ পুরুষাঃ হর্ষাদীংশ্চাপ্যধিগচ্ছন্তি, তথা নানাভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি। — নাট্যশাস্ত্র — ৬/৩১ বৃত্তি

৭০। যথা হি সমানলক্ষণাস্তুল্যপাণিপাদোদরশরীরাঃ

সমানাঙ্গপ্রত্যঙ্গা অপি পুরুষাঃ কুলশীলবিদ্যাকর্মশিল্পবিচক্ষণত্বাদ্ রাজত্বমাপ্নুবন্তি তত্রৈব চান্যেঽল্প বুদ্ধয়স্তেষামেবানুচরা ভবন্তি, তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাবানুপাশ্রিতা ভবন্তি। বহ্বাশ্রয়ত্বাৎ স্বামিভূতাশ্চ স্থায়িনো ভাবাঃ। তদ্বৎ স্থায়িনি বপুষি গুণীভূতা অন্যে ভাবাঃ তান্ গুণবত্তয়া আশ্রয়ন্তে পরিজনভূতা ব্যভিচারিণো ভাবাঃ। কো দৃষ্টান্ত ইতি? যথা নরেন্দ্রো বহুজনপরিবারোঽপি সন্ স এব নাম লভ্যতে, নান্যঃ সুমহানপি পুরুষঃ তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃতঃ স্থায়িভাবো রসনাম লভতে। — নাট্যশাস্ত্র — ৭/৭-বৃত্তি

৭১। শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।। — নাট্যশাস্ত্র - ৬/১৫

৭২। মুনিনা ভরতেন যঃ প্রয়োগো ভবতীষ্বষ্টরসাশ্রয়ো নিবদ্ধঃ। — বিক্রমোর্বশীয়ম্ — ২/১৭

৭৩। শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতা।। — অলংকারসংগ্রহ - ৪/৫

৭৪। ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা, ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা।
রসঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু সমপ্রমাণঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/২১২

৭৫। শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য। — দশরূপক — ৪/৩৫

৭৬। ননু শান্তরসস্যানভিনেয়ত্বাদ্ যদ্যপি নাট্যেঽনুপ্রবেশো নাস্তি তথাপি সূক্ষ্মাতীতাদিবস্তূনাং সর্বেষামপি শব্দপ্রতিপাদ্যতায়া বিদ্যমানত্বাৎ কাব্যবিষয়ত্বং ন নির্বার্যতে। অতস্তদুচ্যতে 'শমপ্রকর্ষো নির্বাচ্যো মুদিতাদেস্তদাত্মতা'। — দশরূপক, ৪র্থ, অবলোক টীকা, পৃঃ-৯৮

৭৭। যৈরপি নাট্যে শান্তো রসো নাস্তীত্যভ্যুপগম্যতে, তৈরপি বাধকাভাবান্মহাভারতাদিপ্রবন্ধানাং শান্তরস -প্রধানতায়া অখিললোকানুভবসিদ্ধত্বাচ্চ কাব্যেসোঽবশ্যং স্বীকার্যঃ। অতএব 'অষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।' ইতুপক্রম্য 'শান্তোঽপি নবমো রসঃ' ইতি মম্মটভট্টা অপ্যুপসমাহার্ষুঃ।

–RASAGANGĀDHARA OF
PANDITARĀJA JAGANNĀTHA
[First Ānna] By Dr. Sandhya Bhāduri
page-36.

৭৮। নিরহঙ্কাররূপত্বাদ্ দয়াবীরাদিরেষ নো।। — সাহিত্যদর্পণ — ৩/২১১

৭৯। যুক্তবিযুক্তদশায়ামবস্থিতো য শমঃ স এব যতঃ।
রসতামেতি তদস্মিন্ সঞ্চার্যাদেঃ স্থিতিশ্চ ন বিরুদ্ধাঃ।। — সাহিত্যদর্পণ — ২১২

৮০। পুণ্যাশ্রমহরিক্ষেত্রতীর্থরম্যবনাদয়ঃ।

মহাপুরুষসঙ্গাদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ।। — সাহিত্যদর্পণ – ৩/২১০

৮১। ন হি রসাদৃতে কশ্চিদপ্যর্থঃ প্রবর্ততে।
তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।— নাট্যশাস্ত্র - ৬/৩১ (বৃত্তি)

৮২। বিভাবাদিভিঃ কৃত্রিমৈরপ্যকৃত্রিমতয়া গৃহীতৈঃ সংযোগাদনুমানাদ্রসস্য রত্যাদের্নিষ্পত্তিরনুমিতিঃ নটাদৌ পক্ষ ইতি শেষঃ। — রসগঙ্গাধর – পৃষ্ঠা - ৩৪

৮৩। ননু যথা শঙ্কুকাদিভিরভিধীয়তে, 'স্থায়ী এব বিভাবাদিপ্রত্যায্যো রসমানত্বাৎ রস উচ্যতে ইতি। এবং হি লৌকিকেঽপি কিং ন রসঃ, অসতঃ অপি হি যত্র রসনীয়তা স্যাৎ তত্র বস্তুসতঃ কথং ন ভবিষ্যতি? — অভিনবভারতী – পৃষ্ঠা - ২৭৫

৮৪। নৃপদেশাদিশান্তিস্তু প্রশস্তিরভিধীয়তে। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১১৪

৮৫। নৃপদেশপ্রশান্তিশ্চ প্রশস্তিরভিধীয়তে।। — নাট্যশাস্ত্র – ২১/১০৩

৮৬। প্রশস্তিঃ শুভশংসনম্। — দশরূপক – ১/৫৪ (ক)

উপসংহার
বা
সার্বিক মূল্যায়ন

আধুনিক নাটক (Drama) সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য বা রূপক বা নাট্য অভিধায় পরিচিত। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য-বিভাগের ন্যায় নাট্যকলার ইতিহাসও ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের তাত্ত্বিক মতাদর্শের দ্বারা ব্যাখ্যাত। নাট্যতত্ত্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনিও বলেছেন – নাট্যবেদের স্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্মা।[১]

সংস্কৃত নাট্যোৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদান, প্রাচীনদের সিদ্ধান্ত এবং আধুনিক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্বজ্জনের বহুমুখী মতামত আলোচনা ক'রে আমাদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তকেই এককভাবে নাট্যসৃষ্টির মূল কারণ ব'লে দাবী করা সঙ্গত নয়। ভরত ও তাঁর অনুগামী প্রাচীন আলংকারিকগণ লোকপরম্পরায় প্রচলিত কাল্পনিক কাহিনীকে অকপটভাবে স্বীকার করলেও বিরোধী মতবাদিগণ মনে করেন যে নৃত্য, গীত, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি মিলেমিশে নাটকের মূল কাঠামোটি গ'ড়ে উঠেছে। নাট্যোৎপত্তির ইতিহাসে প্রাচীন সমাজের ধর্মভিত্তিক অনুষ্ঠানের যোগসূত্রকে অনেক আলোচক বিশেষ গুরুত্ব দিলেও কৃষিজীবী পশুপালক আর্যজাতির যাগযজ্ঞসর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অদ্যাবধি প্রমাণিত হয়নি। বৈদিক সংবাদসূক্তগুলিকে নাট্যরচনার মৌল প্রেরণা বা বীজ বলা যায়। কিন্তু মঞ্চে অভিনয়ের জন্য রচিত যথার্থ নাটক বলতে বিপত্তি আছে। পুতুলনাচ, ছায়াচিত্র কিংবা ইন্দ্রধ্বজ উৎসব, কৃষ্ণোপাসনা, রাম উপাসনা প্রভৃতির সঙ্গে নাট্যোৎপত্তির মৌল সম্পর্ক অদ্যাবধি সফলভাবে প্রমাণিত হয়নি। তাই কোনও বিশিষ্ট এক বা একাধিক মতকে প্রাধান্য দিয়েও বলা যায় নাট্যোৎপত্তির যথার্থ কারণ আমাদের নিকট অজ্ঞাত। যতদিন না নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়, ততদিন বিদ্বজ্জনের সমীক্ষার উপরই আমরা নির্ভরশীল।

বহুযুগ ধ'রে যে নাট্যসাহিত্যের বিকাশ হ'য়েছিল, যাকে কেন্দ্র ক'রে কত নাট্য-শাস্ত্রের উদ্ভব হ'য়েছে, তার বিস্তৃত আলোচনা এই সামান্য গ্রন্থে সম্ভবপর নয়। এই বিরাট বিষয়টির আজও বহু সম্পদ অনাবিষ্কৃত। যাও আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তারও বহু তথ্য আমার ঠিক জানা নেই। তথাপি আমাদের শোধপত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা সংস্কৃত নাটকের গঠন প্রসঙ্গে বিভিন্ন নিয়ম নীতির আলোচনা যথাসাধ্য ক'রেছি।

নাট্যশাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলির বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সম্যক্ বিচার ক'রে আলোচনান্তে একথাই মনে হয় যে নাট্যরচনা ও নাট্যবিচারে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী কোনদিনই সংকীর্ণ ছিল না। সব বিধি-নিষেধ একযুগে সৃষ্টি হয় না। যুগে যুগে জীবন-ধারা ও জীবন-দর্শনের পরিবর্তনে বিধি-নিষেধের পরিবর্তন ও পরিবর্জন ঘটে। ভারতীয় রূপকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

রূপক রচনায় মোটামুটি বিধি নিষেধের একটি বহিরঙ্গ নির্ধারিত হলেও ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে রসানুসারে প্রয়োগ বা রূপায়ণেরই বিধান বলবৎ। রসানুকূল্যে প্রয়োজন হ'লে রসপুষ্টির সহায়তায় দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে নব নব বিধি-নিষেধ রচনার অধিকার ও স্বাধীনতা দিতেও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রকারগণ দ্বিধাবোধ করেন নি। সংস্কৃত ব্যাকরণের মত সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রও নাটকীয় বিধি-বিধানের শেষ কথা নয়।

ভারতীয় নাট্যকারগণ কোনদিনই যুগ ও জীবনকে অস্বীকার ক'রে নাট্যরচনা করেন নি। এটা তাঁদের উদ্দেশ্য বা আদর্শও ছিল না। তাঁদের নাটক তাঁদের ব্যক্তি-মানসের ভাব-মৈথুনলীলা নয়। যদি তাই হ'ত তাহলে নাট্যাভিনয়ের প্রথম রজনীতে দেবতা ও দানবের মধ্যে যে বিরোধ বেধেছিল, সে বিরোধ মীমাংসার জন্য দেবতাদের ইচ্ছা অথবা প্রজাপতির চেষ্টা কোন কিছুরই প্রয়োজন হ'ত না। ভারতীয় নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়ের আদিম অবস্থায় এই যে আপোষ-মীমাংসার সুর, এই যে সাম-নীতি এটাই ভারতীয় সাহিত্যের সুর, ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের আদর্শ। এই সুর, এই-আদর্শের জন্যই 'ট্যাজেডি' রচনার বিশেষ বাধা না থাকলেও ভারতীয় নাটক 'ট্যাজেডি' হ'য়ে উঠতে পারে নি। ভারতীয় রূপক যদি বিচার করতে হয়, যদি বিচার করতে হয় এর গতি ও দ্বন্দ্ব, এর প্রারম্ভ ওপরিণতি,তবে তা বিচার করতে হবে এই ভারতীয় সুর, এই ভারতীয় নীতি-বৈশিষ্ট্যে। জাতির কর্মময় জীবন, জীবন-সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি হ'ল 'নাটক'। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংগ্রাম-পদ্ধতি ভিন্ন, সংগ্রামের আদর্শ ভিন্ন। অতএব এই ভিন্ন জীবন-ধারা, ভিন্ন চরিত্রাদর্শের বাণী-চিত্র নাটক-নাটকাদির সমালোচনার ধারা ও সামগ্রীও হবে বিভিন্ন।

শুধু ভিন্ন দেশে কেন, একই দেশের একই জাতির 'যুগামানস' ভিন্ন যুগে ভিন্নরূপে প্রতিফলিত হয় এর নাট্যসাহিত্যে। যেমন যুগ তেমনি হবে রূপক। মহাকবি ভাসের যুগ (খৃঃ পূঃ ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দী) রাজনৈতিক সংগ্রাম-সংঘর্ষের যুগ। প্রয়োজন হ'লে এই যুগে ক্ষুদ্র বা অসহায় রাজশক্তি রাজ্যরক্ষা ও রাজ্য উদ্ধারের জন্য বৃহত্তর রাজশক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করত। নিছক রাজনৈতিক কারণেই এই সম্বন্ধ ঘটত। প্রয়োজন হ'লে নর-নারীর সুখময় দাম্পত্য-জীবন উপেক্ষা ক'রেই এটি ঘটত। এই জাতীয় ঘটনা বা মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করে ভাসের "স্বপ্ন-বাসবদত্তা"। যেমন ক'রে হোক্ রাজ্য চাই, রাজশক্তি চাই

- এই ছিল এ-যুগের জীবন-বাণী।

গুপ্তযুগের নাট্যকার মহাকবি কালিদাস। যে যুগ ছিল সকল দিক দিয়েই পরিপূর্ণতার যুগ, সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ের যুগ। কোন অভাব, কোন অশান্তি ছিল না সেযুগে। অশান্তি ছিল শুধু রাজ-অন্তঃপুরে। ছিল বহুদার নৃপতির বহু দেবী ও মহিষীর দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতায়। কালিদাসের নাটকগুলির গতি এবং প্রগতি এজন্যই এপথে। রাজ-অন্তঃপুরের প্রণয়কথা ও প্রণয়ব্যথা নিয়েই তাঁর নাটক। শৃংগারোজ্জ্বল, বিরহ-বিমলিন, অনুশোচনা-মধুর প্রেম- প্রতিচ্ছবিই হ'ল তাঁর নাটক। ব্যর্থ প্রেমের অপূর্ণতার মধ্যে আদর্শ প্রেমের পূর্ণতার সন্ধানে যে গতিবেগ, সেই গতিবেগই কালিদাসীয় নাটকের দ্বন্দ্ব। প্রণয়-দ্বন্দ্বই সেযুগের প্রধান দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বেরই শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যুগের 'নবরত্নের' অন্যতম প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নাট্য-সৃজনে।

আবার যুগ-সৃষ্টির প্রয়োজনে, যুগের চাহিদায় ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে ভারতীয় প্রতিভার অন্য রূপও যে দেখতে পাই না, তা নয়। সুকুমার প্রণয়-দ্বন্দ্বই ভারতীয় রূপকের একমাত্র দ্বন্দ্ব বা action নয়। কূটনৈতিক, কঠোর, কুশাগ্র-বুদ্ধির উগ্র গতিবেগ ও রাজনৈতিক শক্তি-সংহতির সুনিপুণ চিত্র রচনাতেও ভারতীয় নাট্য প্রতিভাহীন নয়। এর প্রকৃষ্ট পরিচয় বিশাখদত্তের রাজনৈতিক নাটক "মুদ্রারাক্ষস"। এটি এক অভিনব রাজনৈতিক চেতনার অপরূপ প্রকাশ।

আবার শূদ্রক প্রণীত "মৃচ্ছকটিক" প্রকরণে দেখি ভিন্ন জাতীয় বস্তু বা ঘটনার ভিন্নরূপ গতি। এই গতি সমাজবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লবের গতি। এই বিপ্লবের গতিবেগ, গতি-বৈচিত্র্যে দেখি কত ভাঙা-গড়া,উত্থান-পতন। দেখি ব্রাহ্মণ-সমাজ নামছে, হিন্দুরাষ্ট্র ভাঙছে, ব্রাহ্মণ চুরি করছে, বারবণিতা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কুলবনিতা হ'চ্ছে। দেখি ধর্মে বিশৃংখলা, রাজ্যে বিশৃংখলা, আর সেই ঘোরতর বিশৃংখলার মধ্যে দিয়ে নব-ধর্ম ও নব-রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হ'চ্ছে। এই সর্বতোমুখী গতি-বৈচিত্র্যেরই অপরূপ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য হ'য়েছে 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণে।

বহুদিন যাবৎ আমাদের ধারণা ছিল যে কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' থেকেই সংস্কৃত রূপক বা প্রতীক নাটকের শুরু। কিন্তু Luders কর্তৃক "শরিপুত্রপ্রকরণ" ও অন্য দুটি নাটকের খণ্ডিত অংশ অবিষ্কারের পর সেই ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। খণ্ডিত নাটক দুটির একটি বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য অবলম্বনে রচিত এবং প্রতীক নাটকের তুল্য। একাদশ শতকের পর থেকে এরূপ কতিপয় রূপক নাটক রচিত হ'য়েছিল। কিন্তু এজাতীয় নাটকগুলি সাহিত্যরূপে বিদগ্ধ পাঠকের মনে কিঞ্চিৎ কৌতূহল সৃষ্টি

করলেও মঞ্চ প্রয়োগে কোন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেনি। বলা বাহুল্য সাধারণ নাটকের মত এই প্রতীক নাটকের প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক আবেদন থাকলেও নাটকীয় উপাদানের দ্বারা নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্বকে প্রতিস্থাপিত করলে তার সামগ্রিক নাটকীয় চেতনা সর্বস্তরের দর্শক ও পাঠকের মনোগ্রাহী হওয়ার পক্ষে অনেক বাধা।

যখন কোন দেশে জাতির জীবন অথবা ভাবধারায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে তখন দৃশ্যকাব্যেও তার প্রভাব পড়ে। ভগবান শ্রীচৈতন্যের মহিমায় ভারতে নব-ধর্মের প্লাবন এল, এল নবযুগের নব-জাগরণ।বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এই প্রতিষ্ঠা প্রেরণা দিল বহু নাট্যকারকে। বৈষ্ণব দর্শনের রসমাধুর্যে রচিত হ'ল শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব'; পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি ভক্তি রসাত্মক নাটক।

আবার স্বাদেশিকতা ও নবজাতীয়তার সুর এই যুগের সংস্কৃত নাট্যকারগণকেও স্পর্শ না ক'রে পারেনি। এই সুর-স্পর্শের প্রেরণাপুলকেই রচিত হ'য়েছে পঞ্চানন তর্করত্নের 'অমরমঙ্গল' ও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের 'বঙ্গীয়-প্রতাপ'। সংস্কৃত ভাষা 'রাজভাষা', রাষ্ট্রভাষা হ'লে বর্তমান ভারতের আরও বহু চিত্রই বহুরূপে প্রকাশ পেতে পারত সংস্কৃত সাহিত্য ও রূপকে। যে অর্থনৈতিক বৈষম্যে মনুষ্যত্ব প্রতিপদে আজও পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত, তারও নাট্যরূপ নিশ্চয়ই অসম্ভব হ'ত না।

মানুষের গতি-প্রকৃতি, অবস্থা ও ব্যবস্থার নব-নবতার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের রীতি ও ধারা বদলেছে। শুধু নাট্যসাহিত্যের নয়, নাট্যকলারও পরিবর্তন হ'য়েছে। এযুগের মতই সে-যুগেও নাটকের বিশিষ্ট কোন একটি ছাঁচ ছিল না। আলংকারিকগণের দেওয়া কেবলমাত্র কাঠামো ছিল একটি। কিন্তু যুগে যুগে সেই কাঠামোরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতীয় নাট্যকারগণ কোনদিন 'বস্তু' বা 'রস' অপেক্ষা নাট্যকলা বা নাটকীয় আঙ্গিককে বড়ো ক'রে দেখেননি।

দৃশ্যকাব্য যখন অভিনেয় কাব্য তখন শুধু নাট্যকলা নয়, অভিনয়কলাও সার্থক হওয়া চাই। নট-নটী অযোগ্য হ'লে উত্তম নাটকও অধম হ'য়ে পড়ে। অতএব অভিনয়ের কথা ভেবেই নাট্যকারকে নাটক রচনা করতে হয়। কিন্তু নট-নটী, নাট্যকার সকলেরই লক্ষ্য হ'ল প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকার চিত্তরঞ্জন। অতএব রঙ্গপ্রেক্ষক যা বোঝে না, যার সঙ্গে তার প্রাত্যহিক জীবন, সামাজিক জীবনের কোন সংস্রব নেই তাকে দৃশ্যকাব্যের বিষয় করলে দৃশ্যকাব্য দৃশ্য না হ'য়ে অদৃশ্য হবে।

সাহিত্যদর্পণকার খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর আলংকারিক। তিনি ভিন্নযুগের ভিন্ন ঘটনাস্রোতে ভিন্নধর্মী নাটক-নাটিকার উত্থান ও পতন পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর উদার বিধান হ'ল – "রসস্যৈব হি মুখ্যতা।" রস-প্রকাশের অপেক্ষা রেখেই মুখ, প্রতিমুখ প্রভৃতি পঞ্চসন্ধির সন্নিবেশ হবে, নাট্যশাস্ত্রের উক্তি রক্ষার জন্য নয়। নাট্যবিচারে এই তাঁর উক্তি, এই তাঁর উপসংহৃতি। কিন্তু এই যে রস, যা না হ'লে কাব্যার্থের স্ফুরণ হয় না; কাব্যার্থ অচল, দীপ্তিহীন ও তৃপ্তিহীন, তা মানুষ ও মানুষের জগৎ নিরক্ষেপ নয়, হ'তে পারে না। তাই আচার্য ভরতের মন্তব্য – "ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।"

এই রসের পরিপুষ্টির জন্য যদি এক সন্ধির অঙ্গ অন্য সন্ধিতে প্রয়োগ করতে হয় তাও কর্তব্য।২ এই রসস্ফুর্তির নির্বিঘ্নতা রক্ষার জন্যই "বেণীসংহারের" তৃতীয় অঙ্ক 'গর্ভ'-সন্ধির অন্তর্ভূত হ'লেও ঐ অঙ্কে দুর্যোধন ও কর্ণের কর্তব্য বিষয়ে 'যুক্তাখ্য' মুখসন্ধির অঙ্গ সন্নিবেশিত হ'য়েছে। এটা নাটকের দোষ নয়, গুণ। কিন্তু 'ইতর' পাত্রের আশ্রয়ে এইসব সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োগ অবাঞ্ছিত। এরা প্রধান পাত্র প্রযোজ্য।৩

এই রসপ্রতীতি নির্ভর করে নাট্যশাস্ত্র গঠনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর। যদি রসপ্রতীতি নাট্য বা কাব্যশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে রস প্রতীতিকে সঠিকভাবে প্রতিপন্ন করার জন্য নাটক-গঠনের বিভিন্ন উপাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া অধিক প্রয়োজন। এই উপাদানগুলি যদি যথাযথভাবে নিজ নিজ অবস্থানে প্রযুক্ত না হয়, তাহলে নাটক গঠনেও দোষ দেখা যায়। ফলে দোষযুক্ত নাটকের রসপ্রতীতিও সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।

নাটককে ভারতবর্ষ চিরদিনই শুভশক্তি হিসাবে দেখেছে, বিচার করেছে, উপলব্ধি করেছে। এটাই ভারতীয় নাট্যকলার তত্ত্বকথা, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের জীবনধর্মের ইতিবৃত্ত। রাজা, মহারাজের জীবন অবলম্বন ক'রে নাটক রচিত হ'লেও সে নাটক জনতার দাবীকে উপেক্ষা করেনি। রাজাকে রাজর্ষি, বীরকে ধীর, উদ্ধতকে উদাত্ত, প্রণয়ীকে প্রেমিক ক'রে সমগ্র মানব সমাজেরই কল্যাণ সাধন করেছে।

আজ রাজা নেই, রাজ্য-সাম্রাজ্য নেই। রাজতন্ত্রের স্থান অধিকার ক'রেছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। উদ্ধত রাজদণ্ডের নির্দয় অপব্যবহারে রাজশক্তির আজ চরম পতন, ধনতন্ত্র আজ পতনোম্মুখ। এই পরিবর্তিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কৃত-নাটকের রাজশক্তি, রাজচরিত্র অসম, বিরস, বেমানান মনে হ'তে পারে। কিন্তু অতীতের মত বর্তমানেও যদি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও প্রচলন থাকত, তবে অধুনাতন যে বাস্তব, সেই বাস্তব অনুসারে নিশ্চয়ই নাটকের বস্তু বা নায়ক নির্বাচন হ'ত এবং নাট্যশাস্ত্রের

বিধান সে পথে কোন বাধা হ'ত না। কারণ নাট্যশাস্ত্রকার এমন একটি উদার বিধান বিধিবদ্ধ ক'রে গেছেন যা চিরন্তন, চির আধুনিক, চিরকালই যুগোপযোগী। নাট্য প্রয়োগে 'লোকই' প্রমাণ। নাট্যপ্রয়োগ লোকসম্মত হ'লে নাট্যরচনাও লোকসম্মত হওয়া চাই। অর্থাৎ নাট্যরচনা ও নাট্যপ্রয়োগ উভয় ব্যাপারই লোকানুসারী।

মানুষের চলার পথ 'বকুল-বিছানো' পথ নয়। এই পথে নিত্য দুঃখ, নিত্য আঘাত। মানুষ চলতে চলতে কত কি চায়। কিন্তু কত দিক থেকেই না কত বাধা। বাসনা বাধা পেলেই দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব বাঞ্ছিতে-অবাঞ্ছিতে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে-সমাজে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, সংস্কৃতিতে-সংস্কৃতিতে, মানুষে-অমানুষে, মানুষে-দেবতায়, দৈবে-পুরুষাকারে। ভারতীয় নাট্যকারগণ মানুষের এই জীবন-দ্বন্দ্ব, এই অনিত্যতা, অস্থিরতার প্রতি সচেতন। সচেতন ব'লেই নাট্যারম্ভে তাঁর 'নান্দী', তাঁর বিঘ্ন বিনাশের প্রার্থনা। সচেতন ব'লেই নাট্যান্তে তাঁর 'ভরতবাক্য' অর্থাৎ সকলের জন্য সর্বাঙ্গীন কল্যাণ-কামনা। অশাশ্বত জীবনের অপূর্ণতার মর্মজ্ঞতাই ব্যক্ত হয় এই - 'নান্দী', এই 'ভরতবাক্যে'। যুগ ও আদর্শভেদে মানুষের অভাব ও অভাববোধও ভিন্ন। একারণে ভিন্ন নাটকের 'প্রশস্তিবাক্যে'র প্রার্থনাও ভিন্ন।

কিন্তু শুধু ভারতীয় নাট্যকলা, ভারতীয় নাটকের বহিরঙ্গ রূপটি অবগত হ'লেই ভারতীয় নাটককে ঠিক বোঝা যায় না। ভারতীয় জীবন দর্শনকেও জানা চাই। জীবনদর্শনকে বাদ দিয়ে আর যাই হোক সাহিত্য বিচার হয় না। কারণ জাতির জীবন-বেদ হ'ল সাহিত্য। শুধু ভারতবর্ষ কেন, সকল দেশ ও সকল জাতির সাহিত্য অথবা নাটক বিচারের এটাই যথার্থ পদ্ধতি। এজন্যই বলা হয় – "A nation is known by its theatre." একারণেই বলা হয় জাতীয় চরিত্রের অনুকরণই হ'ল নাটক।[৪]

দেশ, কাল ও পরিবেশের প্রভাব সাহিত্যে অনিবার্য, বিশেষতঃ নাটকে। বিশ্বপ্রেম, বিশ্বজনীনতার উদার স্পর্শে যে নাটক যুগোত্তীর্ণ, তাও যুগ ও সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। ভারতীয় নাট্যকারগণ এই সত্যটির প্রতি অসচেতন ছিলেন না ব'লেই ভারতীয় আলংকারিকগণের মতে নাট্যবেদ হ'ল লোকবেদ। সেইজন্যই নাট্যশাস্ত্রকার বললেন – লোকসিদ্ধং ভবেৎ সিদ্ধং।/নাট্যং লোকাত্মকং তথা।।

নাট্যকার সামাজিক জীব। সামাজিক বিধিনিষেধ, আকৃতি ও আদর্শ অনুসারেই তাঁর মানসিকতা, মানসপ্রবণতা গ'ড়ে ওঠে। এই প্রবণতাকে ঠেলে ফেলা যায় না। ঠেলে ফেললে নাটক জনপ্রিয় হয় না। কারণ নাটকত্বে স্বাভাবিকতার পরিবর্তে কৃত্রিমতা ফুটে ওঠে। তবে বাস্তবের ও বাস্তব পরিবেশের অন্ধ

অনুকরণও যে অবাঞ্ছিত, সে বিষয়েও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন ভারতীয় নাট্যকারগণ। তাই তাঁদের রচনায় বাস্তবের প্রকাশ সংযত। যে বাস্তব উচ্ছৃংখল, অসুন্দর, নিছক শিল্পের খাতিরে তাঁরা তাকে গ্রহণ করেন নি। বাস্তবকে তাঁরা শুভ প্রেরণার সঞ্জীবনীস্পর্শে শুদ্ধ, সুন্দর ও কল্যাণকর ক'রে তোলবার জন্যই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা যে বাস্তবের ছবি এঁকেছেন তা বৃহত্তর জীবনবোধ ও কল্যাণবোধে বিধৃত ব'লে চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা অর্জন করেছে। Real ও Ideal এর দ্বন্দ্বে কোনটিকেই তাঁরা উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা করেন নি। মুক্তবুদ্ধির মহৎ প্রয়াসে real কে তাঁরা ideal ক'রে তুলেছেন। তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভার এটাই চরম বৈশিষ্ট্য।

দর্শকের নিছক মনোরঞ্জনের জন্য ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হয়নি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান ক'রে সেই ঐক্যে মনুষ্যত্বকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। ক্ষণিকের উত্তেজনা, স্বল্পসুখ জাগিয়ে এটি বিরত হয় না। মনের মধ্যে এটি এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে, যে ক্ষুদ্র আলোড়ন মহৎ হ'য়ে ওঠে, ব্যক্তিমানব হ'য়ে ওঠে বিশ্বমানব। অন্ধ বাস্তববাদিতা অথবা ঘোরতর বাস্তব বিমুখতা - এই দুয়ের কোনটিই ভারতের নাট্যধর্ম নয়। ভারতীয় দার্শনিকের মত ভারতীয় শিল্পী 'জগন্মিথ্যা' ব'লে জগৎকে যেমন হেসে উড়িয়ে দেন না, তেমনি তিনি ইহসর্বস্ব দৃষ্টিতে ইহজগৎকেই চরম সত্য ব'লে মনে করতে পারেন না। ইহজগতের মাধ্যমেই ইহজগৎ ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় অতীন্দ্রিয় জগতে এবং এই ঊর্দ্ধতন জগতের উদাত্ত আলোকে তিনি নিম্নকে প্রত্যক্ষ ক'রে নিম্নমানসকে নীচতামুক্ত, উন্মুক্ত, উন্নত, ঊর্ধ্বমুখী ও উদার ক'রে তোলেন। এই তাঁর শিল্পকর্ম ও শিল্পভাবনার অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভারতীয় শিল্পের আদর ও কদর আজও জগতে অক্ষুন্ন। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে এই শিল্পবোধ, এই শিল্পকর্মেরই চিরস্মরণীয় নিদর্শন প্রকাশিত হ'য়েছে এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নাটকের গঠনশৈলী সম্বন্ধে প্রাচীন নাট্যতত্ত্ববেত্তাদের মতামত আলোচিত হয়েছে আমাদের এই শোধপত্রে।

ঃঃ পাদটীকা ঃঃ

১। বেদোপবেদৈঃ সংবদ্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।
এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা সর্ববেদিনা।। — নাট্যশাস্ত্র – ১/১৮

২। কুর্য্যাদনিয়তে তস্য সন্ধাবপি নিবেশনম্। — সাহিত্যদর্পণ – ৬/১১৫ (ক)

৩। সম্পাদয়েতাং সন্ধ্যঙ্গং নায়কপ্রতিনায়কৌ।।
তদভাবে পতাকাদ্যাস্তদভাবে তথেতরৎ।। — সাহিত্যদর্পণ - ৬/১১৮ (খ)-১১৯

৪। লোকানুবৃত্তানুকরণং নাট্যম্। — নাট্যশাস্ত্র – ১/১১১